অপরাজিত

অপরাজিতা

(উপন্যাস)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা

১৩২৭

মূল্য দুই টাকা।

প্রকাশক :
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

& SONS

প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।
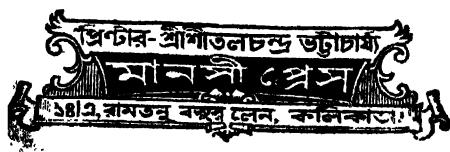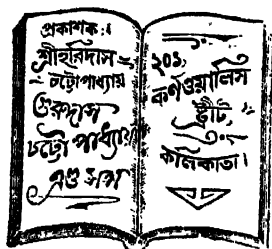
আত্মকথা

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে, গত ১৩২৬ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত, এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

"অপরাজিতা"র অষ্টম পরিচ্ছেদে মিথ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠ করিয়া, কোন-কোনও পাঠক ঐ বিষয়ক আরও কথা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মিথ্যাতত্ত্বটি মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা; উপন্যাসে উহার স্থান নাই। পাঠকবর্গের বিশেষ আগ্রহ দেখিলে, পৃথক পুস্তকাকারে মিথ্যা-তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা করিব। ইতি—

আশ্রম, হুগলি।
২৭শে আশ্বিন, ১৩২৭ } শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অপরাজিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার বিবাহ ও বিদ্যা অ-শিক্ষা।

আমার মাতাঠাকুরাণীর গুরুদেব সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাসীন থাকিয়া, দেবতা মরীচিমালীর প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া এক প্রহর কাল ভগবান হিরণ্যগর্ভের ধ্যান করিতে পারিতেন। রেচক ও কুম্ভক প্রক্রিয়ার দ্বারা নিশ্বাসবায়ুকে সংযত করিয়া তিনি প্রাণায়াম-যোগের অনুষ্ঠান করিতেন। মন্ত্রপূত জলগণ্ডূষ নিক্ষেপ করিয়া তিনি বিষধর সর্পকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া দিতে পারিতেন। বালক এবং কামিনীগণের করাঙ্ক পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য তাহাদিগকে বলিয়া দিতে পারিতেন। মন্ত্রপূত ক্ষুদ্র বংশখণ্ডের সাহায্যে হৃতধন-ব্যক্তির অপহৃত ধনের সন্ধান দিতে পারিতেন।

ধন্য তিনি! আমি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভক্তি করিতাম। তাঁহার চন্দনতিলকাঙ্কিত কুঞ্চিত ললাটের প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, আহার ও পাঠাভ্যাস ভুলিয়া, যোগধর্ম্মের সাধন সম্বন্ধে

আমি তাঁহার অপূর্ব্ব উপদেশ সকল শ্রবণ করিতাম। তাঁহার মুখশ্রী-বিনির্গত প্রত্যেক বাক্যটি দেববাক্যের ন্যায় গ্রহণ করিতাম। গুরুদেব তাঁহার সেই স্বাভাবিক গুরুগম্ভীর স্বরে আমাকে এই উপদেশে দীক্ষিত করিয়াছিলেন যে, কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিতে না পারিলে, যোগধর্ম্মে কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। আমার বয়স তখন বার বৎসর।

কামিনী ত্যাগ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিবাহটা বন্ধ করিতে হয়। অতএব ভবিষ্যৎ জীবনে, যাহাতে আমার কোনও কালে, কোনও প্রকারে বিবাহটা না ঘটে, তদ্বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীকে সতর্ক করিবার অভিলাষে, আমি সেই বার বৎসর বয়সেই মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম—"মা, আমি কখনই বিয়ে করব না। এর পর, বিয়ে করবার জন্যে তুমি যেন আমাকে অনুরোধ ক'রো না; আমি সে সব শুনব না।"

গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ইংরাজী ভাষাটা অর্থকরা ভাষা; অর্থের উপার্জ্জন-জন্য ঐ ভাষাটা শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু 'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।'—যাহার যোগধর্ম্মের জন্য কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার অর্থের প্রয়োজন কি? অতএব আমি দ্বাদশবর্ষীয় যোগী মনস্থ করিলাম, ইংরাজী বিদ্যালয়ে যাইয়া এই অর্থকরী বিদ্যালাভ করিব না। তৎপরিবর্ত্তে দেবভাষা শিক্ষা করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিব।

মা'র আমি নীবেধন নীলমণি। বিবাহ সম্বন্ধে বংশের তিলকের এই নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া মা আমার অত্যন্ত কাতর

হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গুরুদেবের পা-ধরিয়া, মিনতি করিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমার সুশীলের যেন বিয়েতে মতি হয়।"

গুরুদেব অনুস্বর বিসর্গযুক্ত বিলক্ষণ একটা আশীর্ব্বাদ করিলেন। কামিনী-কাঞ্চন-বিদ্বেষী গুরুদেবের সেই সংস্কৃত আশীর্ব্বাদের অমোঘ বলে, বৎসর মধ্যেই কাঞ্চনালঙ্কার-বিজড়িতা এক পঞ্চম বর্ষীয়া 'কামিনী'র সহিত আমার শুভ বিবাহ ঢাকঢোল নিনাদে সম্পন্ন হইয়া গেল। এইরূপে, অহং দ্বাদশবর্ষীয় যোগী, এক কামিনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলাম। তা' হউক,—আমি বুদ্ধদেবের ন্যায়, চৈতন্যদেবের ন্যায়, জগতের কল্যাণের জন্য কৌপীন ধারণ করিয়া, কামিনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, এ আমার স্থির-প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞাটা ঘনীভূত করিবার জন্য, আমি বীরাঙ্গনা কাব্য খুলিয়া, টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া, গ্রীবা বক্র করিয়া, গৃহছাদ প্রকম্পিত করিয়া হাঁকিলাম,—

"শুন কহি ক্ষত্ররথী যত;
তুমি হে বসুধা শুন; তুমি জলনিধি;
তুমি স্বর্গ শুন, তুমি পাতাল পাতালে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা; জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে—

আমি নিশ্চিত কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ক'রে যোগধর্ম্ম গ্রহণ করব।"

হায় হায়! স্ত্রী সম্বন্ধে আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম বটে; কিন্তু অর্থকরী ইংরাজী ভাষাশিক্ষা হইতে আপনাকে বিমুখ করিতে সমর্থ হইলাম না। এই ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য প্রতিনিয়ত স্কুলে যাইতে বাধ্য হইলাম। কি এ ব্যাপারটা বিবাহের ন্যায় আশীর্ব্বাদের জোরে ঘটে নাই। ইহা ঘটিয়াছিল আমার পূজনীয় পিতৃদেবের চপেটাঘাতের জোরে—তাহা গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা অল্প অমোঘ নহে। পিতার তাড়নায় স্কুলে যাইতাম বটে, কিন্তু লেখাপড়ায় আমার একটুও মনোযোগ ছিল না। মনে করিতাম, যদি যোগাভ্যাসে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে যোগবলে একদিনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার হইয়া যাইব—যোগবলে কি না হয়?

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও বুদ্ধদেব, অসার সংসারের সার শ্বশুরমন্দিরে গমন করিতেন কি না, সে কথা আমাদের ইতিহাসের অকিঞ্চিৎকর পাঠ্য-পুস্তকে লিখিত ছিল না। এবং এবিষয়ে আমাদের নিদ্রালু শিক্ষক মহাশয়ও সদুত্তর প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে কখনও শ্বশুরালয়ে যাইব না।

এখানে শ্বশুরালয় অর্থে শ্বশুরের শ্বশুরালয় বুঝিতে হইবে;—আমার শ্বশুরের নিজালয় ছিল না। তিনি থাকিতেন কাবুলওয়ালার দেশে,—মিরাটে। সেখানে সামরিক বিভাগে ক্ষুদ্র এক মসীজীবীর কার্য্য করিতেন। বেতন পাইতেন, পঞ্চচত্বারিংশ মুদ্রা।

আমার পঞ্চম বর্ষীয়া কামিনী, মাতা এবং মাতামহীর নিকট কালীঘাটে মাতামহালয়ে বাস করিত। মাতামহ জীবিত ছিলেন না। কন্যা, মাতা এবং মাতামহী—এই 'তিন পুরুষ' কামিনী একাকিনী সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মাতামহী বুড়ীর হাতে বেশ দু'পয়সা ছিল। তিনি তাহারই সুদে সংসার খরচ চালাইতেন। তাঁহারই অর্থে তাঁহার নাতিনী আমার ন্যায় যোগী-বরকে স্বামিরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিল। আমার চপেটাঘাত-কুশল পিতা, তাঁহার বার বৎসরের পুত্রকে পূরা বাজার দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা বিধবা একটি নাতিনী-জামতা লইয়া, মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুদিন আমোদ আহ্লাদ করিবার অভিলাষে, আমার পিতাকে এক একটি করিয়া টাকা গণিয়া দিয়া, অল্প বয়সে নাতি-নীর বিবাহ দিয়াছিলেন। হায়! হতভাগিনী তখন জানিতে পারেন নাই, কি জানোয়ারের হাতে তিনি তাঁহার আদ-রের নাতিনীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন,—কি হনুমানের হাতে তাঁহার হৃদয়সাগরের মহারত্ন স্থাপন করিয়াছিলেন। আমার মত নীরস নাতিনীজামতা লাভ করিয়া বৃদ্ধা কোনও আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন নাই। অবশিষ্ট জীবনের কয়েকদিনের মধ্যে তিনি একদিনও আমার সন্দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত সাদর আহ্বান আমার নিকট হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইত।

আমার শ্বশুর মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কিছুদিন ছুটী লইয়া রাটী আসিয়া কন্যাটিকে আপনি সম্প্রদান করেন। কিন্তু

তিনি তাঁহার এই কামনাটিকে ফলবতী করিতে সমর্থ হন নাই। বহু চেষ্টাতেও কন্যার বিবাহের সময় তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। কন্যার বিবাহোপলক্ষে পিতার উপস্থিতির আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, আফিসের গোরা মনিব একদিনের জন্যও তাঁহার বিদায় মঞ্জুর করেন নাই।

আমার স্ত্রীর নাম মেনকা, আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে 'মেনি' বলিয়া ডাকিতেন, আর আমার বুড়ী দিদিশাশুড়ী বলিতেন "মেনকারাণী।" এ নামতত্ত্ব আমি বিবাহ রাত্রে বাসরঘরেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

বিবাহের পর, মেনকারাণীকে আমি একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। বিবাহের বৎসরখানেক পরে, কয়েকটি সুবোধ সহপাঠীর সহিত, একদিন স্কুল হইতে পলাইয়া আমরা কালীঘাটে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাটী ফিরিবার পথে দেখিলাম, আমার ধর্ম্মপথের মহা বিঘ্ন তাহাদের বাটীর সম্মুখে পথে ধূলির মধ্যে আপনার রাজ্য-বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া তাহার বিকশিতদন্তা সঙ্গিনীগণ করতালি দিয়া কহিল—"ঐ ঐ মেনকার বর আস্‌ছে রে!" শুনিয়া, সে ত্রস্তে তাহার ধূলি-ধূসরিত হস্তের দ্বারা আপন কটি-বিজড়িত বসনাঞ্চল নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার বেণী-বিলম্বিত মস্তক আবৃত করিয়াছিল। কিন্তু অবগুণ্ঠন রচনার পূর্ব্বেই আমি তাহার মুখখানি দেখিয়া লইয়াছিলাম।

সে মুখ সুন্দর। আমার বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়া আসিয়া, আমার পিতাঠাকুর মহাশয় আমার মাতাকে বলিয়াছিলেন, "বধূর চাঁদপানা মুখ।" সত্যই মেনকারাণীর চাঁদপানা মুখ।

অপর লোক যদি হইত, তবে সে চাঁদপানা মুখ দেখিয়া মজিত। কিন্তু আমি যোগবলে মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলাম;—আমি অটল রহিলাম।

আমার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন এক দিন আমাদের শ্যামবাজারের বাটীতে বসিয়া, এক নবাগত লোকমুখে শ্রবণ করিলাম যে আমার দিদিশ্বাশুড়ী সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন, এবং আমার শ্বশুর মহাশয় অসহায়া পত্নী এবং তনয়াকে মিরাটে লইয়া যাইবার জন্য স্বদেশে সমাগত হইয়াছেন, এবং পরদিন আমাকে দেখিবার জন্য ও বেহাই মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য শ্যামবাজারে আমাদের মোকামে শুভাগমন করিবেন। শুনিয়া, আমি সতর্ক হইলাম; এবং স্থির করিলাম যে আমি কোন ক্রমেই শ্বশুর মহাশয়কে দেখা দিব না।—পত্নী এক বন্ধন; পত্নীর পিতা বন্ধনের উপর বন্ধন;—এ বন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত থাকিতে হইবে।

পরদিন প্রভাত হইতেই বাবার মেজাজ গরম হইয়া উঠিল। আমিই যে তাঁহার একমাত্র পুত্র, এবং 'বেটা' সম্বোধনের একমাত্র অধিকারী, এটা ভুলিয়া গিয়া, প্রভাত হইতে অন্ততঃ দুইশত বার, আমাদের উড়ে চাকর রামাকে তিনি 'বেটা' বলিয়া সম্বোধন

করিলেন। আমার পিতার বংশধর ব্যতীত অন্য কোনও মানব যে ছুঁচো হইতে পারে ইহা আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। সেই সকালে জানিলাম যে প্রভু জগন্নাথের দেশ হইতেও মানুষ-ছুঁচোর আমদানি হইয়া থাকে। ফলতঃ বাবার 'ছুঁচো বেটা' আমাদের বৈঠকখানা ঘরটাকে যেন আমার শ্বশুর মহাশয়ের বিবাহের আসর করিয়া, ফেলিল। মসীচিত্রিত শতরঞ্চটা আমার লিখনানুরাগের অপূর্ব্ব চিত্রসকল বক্ষে ধারণ করিয়া চির নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে আজ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহা একটা শুভ্র জাজিমের দ্বারা আবৃত করিল। তাকিয়াগুলা, স্থূলোদরা বিধবা ঠান্‌দিদির মত শুভ্র বসনে সজ্জিত হইল।

অপরাহ্ণকালে বাটীর ভিতর মহাধূম পড়িয়া গেল। মা জলখাবার প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বাবা বারবার রন্ধনশালায় আসিয়া মাকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। ফোড়নের গন্ধে, লুচির সৌরভে বাটী আমোদিত হইয়া উঠিল। সন্দেশের রূপে, রসগোল্লার কান্তিতে বাড়ী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, সেই মহাধূমে, আমার ন্যায় ভাবী মহাযোগীরও জঠরাগ্নি প্রধূমিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি তাহা সংবরণ করিয়া, অন্যের অসাক্ষাতে কেবলমাত্র একটি রসগোল্লা গলাধঃকরণ করিয়া, আমার শ্বশুর মহাশয়ের শুভাগমনের বহুপূর্ব্বে আপনাকে সম্যক্‌রূপে লুক্কায়িত করিয়া ফেলিলাম।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম, শ্বশুর মহাশয় জলযোগ

করিয়া, মহাতৃপ্তিলাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার সাক্ষাৎ পাইয়া বাবা বলিলেন—"তুই কোথায় ছিলি; বেয়াই তোকে দেখবার জন্যে কত খুঁজলেন।"

আমি অম্লানবদনে উত্তর করিলাম—"আমি ত বাড়ীতেই ছিলাম।"

পরদিন আমার কামিনী ও নিজ কামিনীকে লইয়া শ্বশুর মহাশয় মিরাট রওনা হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহত্যাগ।

উপরিউক্ত ঘটনার চারি বৎসর পরে, আমার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে, আমি ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষায় ফেল হইলাম। সে বৎসর পরীক্ষা অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছিল;—যত ভাল ভাল ছেলে, সব ফেল হইয়াছিল।

বাবার তাড়নায় পরবৎসরের প্রথমে আবার বিদ্যালয়ে যাইয়া কালামুখ দেখাইলাম। বৎসরের শেষে আবার পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার ফল বাহির হইল; কিন্তু এবারও তাহাতে আমার সুচারু 'সুশীল' নাম প্রকাশিত হইল না। আমি স্থির করিলাম, হতভাগ্য সংবাদপত্র প্রকাশকগণ মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে বড়ই ভুল করিয়া থাকে।

আমার পিতৃদেবের কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়; তিনি অম্লান বদনে আদেশ করিলেন, 'আবার পড়।' কিন্তু তোমরা পাঁচজনে বিবেচনা করিয়া বল দেখি, কুড়ি বৎসর বয়সে, শ্মশ্রু-শোভিত মুখভঙ্গিমা লইয়া, কোনও ছাত্রের কখনও কি পাঠে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে? অতএব আমি প্রবৃত্তি-মার্গ ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিলাম। স্কুল যাইতেছি বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া, কুমার নবকুমার দত্তের বৈঠকখানায় 'ছ তিন নয়, কচে বার' ইত্যাদি মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম।

আমার নিবৃত্তি-মার্গের অবশ্যম্ভাবী ফলও ফলিল। আবার

আমি ফেল হইলাম। আবার সংবাদপত্র প্রকাশকগণ তাহাদের অসার সংবাদপত্রে আমার মধুর নাম মুদ্রিত করিতে ভুলিয়া গেল। বাবা যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার বুড়া খোকাকে আবার স্কুলে পাঠাইতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে, আমাকে পরীক্ষায় তৃতীয়বার অকৃতকার্য্য দেখিবার পূর্ব্বেই, স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি আমার দিকে যে সজল স্নেহপূর্ণ চাহনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে, এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। হায়! এই সুখের দিনে আমার জীবনকাহিনী তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে বসিয়াছি, এখন তিনি কোথায়? পাপিষ্ঠ নারকী আমি, তাঁহার জীবিত কালে, তাঁহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারি নাই।

তৃতীয়বার ফেল হইয়া আমি বিবেচনা করিলাম যে, আমার স্থায় নারীপরিহারী যোগীর ফেল হওয়াটা উপযুক্তই হইয়াছে। যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কজ্জলপূরিত-লোচনা, মুক্তাহার শোভিতা কামিনী, তাঁহার সেবার জয়পত্র মাথায় বাঁধিলে আমার যোগধর্ম্মের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লাগিত।

মাতাঠাকুরাণী বুঝিয়া সুঝিয়া কহিলেন—"বাবা সুশীল, তুমি আর স্কুলে যেও না; তোমার স্কুলের মাইনে দেবার সঙ্গতি আমার নেই। এখন তুমি তোমার বাবার আফিসে গিয়ে বড় সাহেবকে তোমার অবস্থার কথা জানাও। তুমি পাশ না ক'রলেও, তিনি দয়া করে' তোমাকে একটি চাকরী দিতে পারেন।"

দেখিলাম, মাতাঠাকুরাণীর কথাটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কারণ যদিও মাতাঠাকুরাণীর গুরুদেব কহিয়াছিলেন, সরীসৃপগণ আপনাদের তালুতে জিহ্বা সংলগ্ন করিয়া, কুম্ভক অবলম্বনের দ্বারা ছয়মাসকাল অনশনে অতিবাহিত করিতে পারে, তথাপি আমি দেখিয়াছিলাম যে, জঠর জ্বালা উপস্থিত হইলে, আমার ন্যায় যোগীবরের জিহ্বাও তালুতে সংলিপ্ত থাকিতে চাহে না—লালাপ্লাবিত হইয়া মুখবিবরের বাহিরে অযথারূপে বাহির হইয়া পড়ে। এই জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য খাদ্য আবশ্যক, খাদ্যের জন্য অর্থ আবশ্যক, অর্থের জন্য চাকুরী আবশ্যক; এবং চাকুরীর জন্য বড় সাহেবের সিংহদ্বারে দ্বারস্থ হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু বড় সাহেব ইংরাজ লোক; ইংরাজিতে কথা কহিবেন, আমি ত ইংরাজিতে কথা বলিতে জানি না, আমি কিরূপে তাঁহার সহিত কথা কহিব? অতএব সহসা বড় সাহেবের নিকট উপস্থিত হইতে আমার সাহস হইল না। মাতাকে আমি আমার ভয়ের কথা বলিলাম। শুনিয়া, মা পাল্কী চড়িয়া উমেশ বাবুর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। বাবার মৃত্যুর পর উমেশ বাবু এক্ষণে আফিসের বড়বাবু হইয়াছিলেন। পরদিন উমেশ বাবুর সহিত, মাতাঠাকুরাণী আমাকে বড় সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

আমাকে দেখিয়া বড় সাহেব বলিলেন, "দুঃখের বিষয়, তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর নি। এখন আফিসের কোন পদ শূন্য নেই। তবু, তোমার বাবা বহুকাল আমাদের কায অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেছিলেন; তাঁর পুত্রের জন্য

আমাদের কিছু করা উচিত। আমি তোমাকে মাসিক পনের টাকা হিসাবে পকেট খরচ দেব; তুমি রোজ ঠিক সময়ে আফিসে এসে কায শিখবে। তিন চার মাসের মধ্যে কোন না কোন পদ শূন্য হবার সম্ভাবনা, তখন আমি তোমাকে নিযুক্ত করব। আর তুমি যদি তোমার বাপের মত কাযে পারদর্শিতা দেখাতে পার, ভবিষ্যতে তোমার উন্নতির দিকেও আমার দৃষ্টি থাকবে।”

সাহেব যে কথাগুলি বলিলেন, অন্য লোক হইলে সে তাহাতে কত আপ্যায়িত হইত। কিন্তু আমি মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম যে যোগবলে একদিনের মধ্যে একটা পয়গম্বর হইয়া যাইব; যোগবলে একদিন আলাদীনের প্রদীপটা হস্তগত করিতে পারিব; —আমার পনের টাকা বেতনের চাকুরী পছন্দ হইবে কেন? আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাটী আসিয়া, মাতাকে কহিলাম— “আমি জীবন থাকতে পনের টাকা মাইনের চাকরী করব না। তুমি আমাকে তত সামান্য লোক মনে করো না। যখন যোগবলে সমস্ত পৃথিবীকে চমকে দেব, তখন বুঝবে!” দেখিলাম, পনের টাকা বেতনের চাকুরী অস্বীকার করাতে মা আমার তত কাতর হইলেন না।

আমার স্কুলে যাইতে হইল না, আফিসে যাইতে হইল না;— বড় মজা! মাতার আদরমাখা ভাতগুলি খাইয়া, বৃষোৎসর্গে ত্রিশূলাঙ্কিত মুক্ত বলীবর্দ্দের ন্যায় যদৃচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলাম। কোন দিন বেলগাছিয়া, কোনও দিন দক্ষিণেশ্বর এবং কোনও দিন বা কালীঘাটে ভ্রমণ করিতে যাইতাম। রাত্রি এক প্রহরের সময়

বাটী ফিরিয়া, ভোজন সমাধা করিয়া, পরম নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিতাম।

এই সময়, একদিন কালীঘাটের এক যাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, খুঁড়োর এক বাগান-বাড়ীতে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার অদ্ভুত শক্তি। তাঁহার রেশমী ঝুলিতে হাতীর দাঁতের এক কৌটা আছে, সেই কৌটার মধ্যে এক প্রকার ভস্ম আছে; তিনি প্রার্থনাকারীকে সেই ভস্ম হইতে সর্ষপ-পরিমাণ আহার করিতে দিয়া, সকল প্রকার দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। বল্লভপুরের রাজা নাকি তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরীক্ষা করিবার জন্য, সাত হাত গভীর এক কূপ খনন করাইয়া, তাহার মধ্যে সন্ন্যাসীকে স্থাপন করিয়া, তাহা মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, তাহার উপর বিলাতি মাটীতে গাঁথা পাকা বেদী প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন; এবং কেল্লা হইতে পঁচিশজন লালমুখো গোরা আনাইয়া ঐ বেদীর উপর রাত্রদিন পাহারা খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। এক পক্ষ পরে, বেদী ভাঙ্গিয়া মাটী তুলিয়া দেখা গেল যে, যোগী তাহার মধ্যে পূর্ব্বমত হাস্যমুখে বসিয়া হরি-ধ্বনি করিতেছেন; দেখিয়া জজ, ম্যাজিষ্টর, উকীল, হাকিম প্রভৃতি যত লোক সেখানে জড় হইয়াছিল, অবাক্ হইয়া গেল।

যাত্রীর মুখে সন্ন্যাসীর বিবরণ শুনিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষ আমার মনের মধ্যে দাবানলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। আহারাদির পর বৈশাখী মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ময়ূখজ্বালা হেলায় মস্তকে ধারণ করিয়া, আমি পদব্রজে খুঁড়োর সন্ন্যাসী-

নিবসিত বাগানবাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য! আমি তৎকালে তাঁহার শুভদর্শনলাভে বঞ্চিত রহিলাম। শুনিলাম, তিনি আহারাদির পর, দ্বিতলে কতকগুলি ধর্ম্মপিপাসু পুরনারী কর্ত্তৃক পরিবৃত ও সেবিত হইয়া দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন; তৎকালে তিনি আমা-হেন নরলোকের দর্শনীয় নহেন।

আমি বাগানের একটা বেদীর উপর বসিয়া রহিলাম,— দেখিবই তাঁহাকে।

আমার ক্লান্ত দেহের উপর, বাগানের এক বৃহৎ বৃক্ষ স্নিগ্ধ ছায়া ঢালিয়া দিল, ঘনপল্লবের মধ্য দিয়া শীতল বায়ু আসিয়া আমার ললাট স্পর্শ করিল; ঝাউ গাছগুলি আমার কাণের কাছে ঘুম-পাড়ান গান গাহিল; আমার নয়ন পল্লবে, যেন নিদ্রাদেবী আসিয়া হাত বুলাইয়া দিলেন; আমি বেদীর উপর ঘুমাইয়া পড়িলাম।

দিবা তৃতীয় প্রহরকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, আমি তাঁহার দর্শন পাইলাম। বকম্ কাষ্ঠের রক্তবর্ণ খড়ম পায়ে দিয়া, গৈরিক রেশমে প্রস্তুত, আগুল্ফ-বিলম্বিত আল্‌খাল্লা পরিয়া, দীর্ঘকেশরাশি স্কন্ধে বিলম্বিত করিয়া, হস্তে রজতনির্ম্মিত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া, সন্ন্যাসী-প্রবর মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিলেন। আমি উঠিয়া, শ্রীচরণে প্রণত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। তিনি আমাকে 'শুভমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কিন্তু সেদিন তাঁহার সহিত আমার কোন কথাবার্ত্তা হইল না। বাগানের নূতন মালিক জনৈক মাড়োয়ারী বাবুর বৃহৎ অশ্বযান

বাগানের ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল ; সন্ন্যাসী প্রবর তাহাতে আরোহণ করিয়া কোথায় প্রস্থান করিলেন। আমি বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, সন্ন্যাসী সন্দর্শন প্রত্যাশায় আবার আমি স্তুঁড়োয় গেলাম। দেখিলাম, তিনি ধ্যান-নিরত হইয়া, একাকী বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া, এবং আমার অভিলাষ অবগত হইয়া, তিনি আমাকে যোগসাধন সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিলেন এবং কহিলেন—"বাড়ীতে নানারূপ বিঘ্ন ; সেখানে যোগসাধনা হবে না। তোমাকে হরি-দ্বারে যেতে হবে। সেখানে আমার এক শিষ্য আছেন ; তাঁর নাম বিঠুর বাবাজী, তিনি তোমাকে আপন আশ্রমে স্থান দিয়ে দীক্ষিত করবেন।"

আমি হরিদ্বার যাইতে স্থির-সংকল্প হইয়া বাটী ফিরিলাম। বাটী ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছিল। মা, রান্নাঘরে তাঁহার ও আমার ভাত বাড়িয়া রাখিয়া, দ্বারের কাছে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া কহিলেন—"তুমি আর কখনও এত দেরী করো না। বেলা পড়ে গেছে, আমি তোমার জন্যে ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।"

সেই দিন রাত্রে, পাষণ্ড আমি, এই বিধবা অসহায়া স্নেহময়ী মাতাকে জনশূন্য গৃহে একাকিনী ফেলিয়া, হরিদ্বার অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। যাইবার সময় মাতার নিকট বিদায়গ্রহণও করি নাই ; বলি নাই, "মা, আসি।"

গাড়ীতে বসিয়া, মার কথা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। প্রভাতে উঠিয়া, আমাকে গৃহে না দেখিলে, তিনি কি মনে করিবেন—ভাবিতে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পুত্রহারা অভাগিনী কোথায় যাইবেন? কি করিবেন? পুত্রের অনুসন্ধান না পাইয়া হয়ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, মরিয়া যাইবেন। তাঁহার হৃদয়ব্যথা মনে করিয়া আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। বলিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে না, চক্ষুজলে আমার গণ্ড প্লাবিত হইয়া যাইতে লাগিল। বারবার মনে হইতে লাগিল, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িব। কিন্তু হৃদয়হীন আমি, আর সেই স্বর্গাধিকশ্রেয়ঃ সর্ব্বশান্তিময় মাতৃক্রোড়ে ফিরিলাম না।

একটা কথা আমি তোমাদিগকে বলি নাই। কথাটা তোমাদের শ্রবণযোগ্য নহে; কিন্তু আমি তাহা বলিব। না বলিলে বুঝি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমি চুরি করিয়াছিলাম। মার চাবি কোথায় থাকে তাহা আমি জানিতাম;—আমি তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র, তিনি চাবিটা আমার নয়ন পথের অন্তরালে রাখিতেন না। মার চাবি লইয়া, আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে কেবল মাত্র এগারখানি দশটাকার নোট, চারিটি টাকা, একটি আধুলি ও ছয়টি পয়সা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার কয়েকখানি অলঙ্কারও ছিল। বোধ হয় আমাদের সেই সম্বল; তিন শত টাকা বেতনের চাকুরী করিয়া, কলিকাতার বাসাখরচ চালাইয়া, বাবা কিছুই সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। সন্ধ্যাকালে মা যখন আমার রাত্রের আহার-জন্য

রুটী ও বেগুন ভাজা প্রস্তুত করিতেছিলেন, আমি তাঁহার সুবোধ পুত্র, তখন তাঁহার শেষ সম্বল সেই এগারখানি নোট ও চারিটি টাকা, আমার কামিজের পকেটের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভাবি নাই, পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সহায়হীনা বিধবা আপনার সামান্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় জন্য অর্থ কোথায় পাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিঠুর বাবাজী।

হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আমি বিঠুর বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বাবাজীকে হরিদ্বারের সকল লোকই জানিত, কাযেই তাঁহার আশ্রম খুঁজিয়া লইতে আমার কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই।

আমি যখন বাবাজীর নিকটস্থ হইলাম, দেখিলাম, তখন তিনি একখানা দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা পুস্তক পাঠ করিতেছেন। এত মনোযোগের সহিত তিনি পাঠ করিতেছিলেন যে, আমার সামীপ্য তিনি সহসা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পরে, মস্তকো-ত্তোলন করিয়া আমাকে দেখিয়া—কি আশ্চর্য্যের কথা—তত বড় যোগী, আমার ন্যায় তৃণাদপি তৃণকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। আমি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া, তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলাম, পদধূলি ত গ্রহণ করিই নাই।

আমি তাঁহাকে আপন মনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, তিনি হাস্যমুখে কহিলেন—"সে সব কথা পরে হবে। আপনি গঙ্গাস্নান করে আসুন, অন্ন প্রস্তুত আছে।"

অন্ন! তিন দিন চট-বিনিন্দিত পুরী ও বালুকণা মিশ্রিত হালুয়া আহারের পর, অন্নের নামে আমার মনটা কিরূপ প্রসন্ন হইয়াছিল, তাহা আমার তাৎকালিক মুখ-ভঙ্গিমা না দেখিয়া তোমরা কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। বাবাজী পরিষ্কার বাঙ্গালাতে কথা

কহিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত আমি স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করিলাম।

তথায় কামিজ ও উত্তরীয় উন্মোচন পূর্ব্বক একটি বৃহৎ বৃক্ষতলে রক্ষা করিলাম। কামিজের পকেট বাহির হইতে অনুভব করিয়া বুঝিলাম যে, সেই অপহৃত নোটগুলি এখনও পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান আছে। তৎপরে গঙ্গাস্রোতে অবগাহন করিলাম ;—কি শীতল নির্ম্মল জল! শরীরের সমস্ত গ্লানি যেন ধৌত হইয়া গেল। শান্তি-হীন মস্তিষ্কে সান্ত্বনা অনুভব করিলাম।

গঙ্গাস্নান করিয়া বিঠুর বাবাজীর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম। বাবাজী কহিলেন—"আমার শুক্‌নো কাপড় আছে, তা আপনি পরুন। আমার ব্রাহ্মণ সহাধ্যায়ীর পাক করা অন্ন আহার করতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না।"—কাহার সাধ্য আপত্তি করে? আমি শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া, এবং ভিজা কাপ-ড়টি বাহিরে শুষ্ক করিতে দিয়া, আহার করিতে বসিলাম।

আহার করিতে করিতে—সর্ব্বনাশ!—আমার সহসা মনে পড়িল যে, স্নান করিবার পূর্ব্বে বৃক্ষতলে যে কামিজ ও উত্তরীয় স্থাপন করিয়াছিলাম, গঙ্গাবগাহনান্তে তাহা লইয়া আসা হয় নাই। কাঞ্চনত্যাগী যোগধর্ম্মপরায়ণ আমার মনটা সেই পকেট মধ্যস্থ নোট কয়েক খানার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িল যে, অন্নাহারে আর আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি রহিল না। কিন্তু আমি সহসা আহার ত্যাগ করিয়া উঠিতেও পারিলাম না। আমার ভয় হইল, পাছে বিঠুর বাবাজী ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণ (এই সহাধ্যায়িগণ

প্রকৃত পক্ষে বিঠুর বাবাজীর শিষ্য) আমাকে নোটপূর্ণ পকেটের পশ্চাতে ধাবিত দেখিয়া, নিতান্ত অপদার্থ এবং তজ্জন্য আমাকে যোগধর্ম্ম শিক্ষার একান্ত অনুপযুক্ত মনে করেন। অতএব আমি—না, না, আমি নহি, আমার দেহটা—অতি কষ্টে আহার গলাধঃ-করণ করিতে লাগিল ; আমার মনটা সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিল। আহারের পর ধীরপদক্ষেপে আমি পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের দিকে গমন করিলাম।

দেখিলাম—না, না, কিছুই দেখিলাম না। পকেট নাই, কামিজ নাই, উত্তরীয় নাই। নোট সহ পকেট, পকেট সহ কামিজ, কামিজ সহ উত্তরীয়, যাদুকরের গোলকের ন্যায়, অন্তর্হিত হইয়াছে। বুঝিলাম, আমার মত চোর তীর্থক্ষেত্রেও দুষ্প্রাপ্য নহে। আমার পিতা শরীরপাত করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার শেষাংশ এইরূপে নিঃশেষিত হইয়া গেল। এইরূপে যে অর্থকে আমি একদিন—অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং বলিয়া সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম, আজ সেই অর্থ, আমাকে এক অপরিচিত বিদেশে, নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া, আপনিই আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল। আজ হইতে জীবনধারণ জন্য ভিক্ষা ব্যতীত আমার আর অন্য উপায় রহিল না। তবে কি আমি আবার মাতৃক্রোড়ে ফিরিয়া যাইব ?

কিন্তু বাটী ফিরিতে হইলে যে সামান্য অর্থের আবশ্যক, তাহাও আর আমার ছিল না। এবং বাটীতেও ত কোনও অর্থ রাখিয়া আসি নাই ;—সেখানেই বা জীবণ ধারণ করিব কিরূপে ? আরও

একটা কথা আছে। তর্কস্থলে যদিও আমি বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন সহকারে বলিতে পারিতাম যে, তোমরা যেটাকে চুরি বলিতেছ, প্রকৃতপক্ষে সেটা চুরি নহে; কারণ, টাকাটা আমার পিতার উপার্জ্জিত হওয়ায়, তাঁহার অবর্ত্তমানে আমিই তাহার সম্পূর্ণরূপে উত্তরাধিকারী; তথাপি নিজেরই সেই অর্থ, নিজেরই সেই বাক্স খুলিয়া লইয়া আসায়, এমন একটা অন্যায় লজ্জা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, অর্থহীন না হইলেও ঐ কারণে তখন গৃহে ফিরিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

অতএব অর্থহীন অবস্থায় আমি প্রবাসে বাস করিলাম; স্বদেশে মাতার শান্ত স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্রমে।

বিঠুর বাবাজী আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম কি?"

আমি চিন্তা করিলাম, সত্য নাম বলিব, না মিথ্যা নাম বলিব? ভাবিয়া স্থির করিলাম, সত্য বলা হইবে না। যিনি আমার কর্ণে যোগধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রদান করিবেন, আমার নামটা তাঁহার কর্ণ-গোচর করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না! নিজ প্রকৃত নাম গোপন করিয়া, অক্লেশে, অম্লান বদনে কহিলাম—"আমার নাম কার্ত্তিকচন্দ্র রায়।"

আমার নাম শুনিয়া, স্বামীজি একটু দুর্ব্বোধ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কি জাতি?"

"ব্রাহ্মণ।"

"বাড়ী কোথায়?"

আমি মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে কহিলাম—"আমাদের বাড়ী? এই—আমাদের বাড়ী? এই আমাদের বাড়ী নদীয়া জেলায়।"

"কোন গ্রামে?"

"কোন গ্রামে?—এ—এই—হরিপুর।"

"কোন হরিপুর? শান্তিপুরের কাছে, গঙ্গাতীরে হরিপুর

নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; আপনার নিবাস কি সেই হরিপুর?"

কথাটা শীঘ্র সমাধা করিয়া লইবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বাড়ী সেই হরিপুরেই বটে।"

কিন্তু বিঠুর বাবাজী 'নাছোড়বন্দা'। কে জানে, বাবাজী পূর্ব্বে কখনও কৌন্সিলির কার্য্য করিয়াছিলেন কি না—এরূপ 'জেরা' কৌন্সিলি ছাড়া অন্য কেহ করিতে পারে না। তিনি পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ গ্রামের কাশী-নাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?—আমি একবার তাঁর বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্যে অতিথি হয়েছিলাম। উত্তম লোক। তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?"

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়কে যমালয়ে প্রেরণ এবং তাঁহার বংশকে নির্ব্বংশ করা ব্যতীত আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধারের অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাই বলিলাম—"কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মশায়ের মৃত্যু হয়েছে।"

"আহা আহা! তাঁর ছেলেটি এখন কি করছেন?"

"তিনিও মারা পড়েছেন।"

"কি দুঃখের বিষয়!"

"দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই; সে বংশের আর একটি লোকও বেঁচে নেই।"

একটা বংশকে ধ্বংস করিয়া, অহং যোগিশ্রেষ্ঠ মনে করিলাম যে এই উকিল বাবাজীর জেরা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি।

কিন্তু না, তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন—"ঈশ্বর কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় মশায় কবে মৃত হয়েছেন ?"

আমি বলিলাম—"সে অনেক দিনের কথা ; প্রায় দশ বৎসর হবে।"

বাবাজী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; এবং মৃদু হাস্যসহকারে আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কহিলেন—"আপনি বলেন কি ? দশবৎসর আগে তাঁর কি করে' মৃত্যু ঘটবে ? আমি ত গত বৎসর তাঁর সঙ্গে একত্রে বাস করেছি।"

বাবা ! আমি যে কি মহাবিপদে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা কি তোমাদিগের নিকট বর্ণনা করিতে হইবে ? 'সে অনেক দিনের কথা'—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, আমি নির্ব্বোধ যদি আমার বাক্যধারাকে সংযত করিতে পারিতাম, যদি—'প্রায় দশ বৎসর হবে'—এই উপসংহারটুকু মুখ হইতে মূর্খের ন্যায় বাহির করিয়া না ফেলিতাম, তাহা হইলে ত আমাকে এই বিষম বিপদে পড়িতে হইত না !

কিন্তু এই বিপদে বাবাজী স্বয়ং আমার উদ্ধারকর্ত্তা হইলেন। তিনি আবার একটি দুর্ব্বোধ হাস্যে তাঁহার মধুর অধর তরঙ্গিত করিয়া কহিলেন—"আপনি ভুল করছেন। দশবৎসর পূর্ব্বে অথবা বার তের বৎসর পূর্ব্বে, কাশীনাথ বাবুর ভাই সীতানাথ বাবুর মৃত্যু হয়েছিল।"

আমি ঢোক গিলিয়া, ধাক্কা সামলাইয়া কহিলাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ,

আমি সব ভুল করে ফেলছি। কাশীনাথ বাবু ন'ন, সীতানাথ বাবুই মৃত হয়েছেন।

"সীতানাথ বাবুর এক ছেলে ছিল জানেন ?"

এ কথার কি উত্তর দিব ? আমি বাবাজীর মুখের দিকে বোধ হয় নিতান্ত নির্ব্বোধের মত তাকাইয়া রহিলাম। বাবাজী আবার হাসিলেন। কি ভয়ানক হাসি ! সে হাসিতে আমি নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িলাম। একবার মনে হইল, মিথ্যা কথার জন্য তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু তাহা পারিলাম না ; যে জটিল পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাহা হইতে প্রত্যাগমনের উপায় ছিল না ; প্রত্যাগমন-পথ অবরোধ করিয়া জটিলা লজ্জা দণ্ডায়মানা ছিল। আমাকে নীরব দেখিয়া, কি জানি কি ভাবিয়া বাবাজী কাশীনাথ-কোম্পানির কথা পরিত্যাগ করিয়া নূতন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন।

বাবাজী। আপনি কি উদ্দেশ্যে হরিদ্বারে আগমন করেছেন ?

আমি। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করব।

বাবাজী। আপনার পিতার নাম কি ? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন ?

আমার পিতার আসল নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাহা গোপন করিয়া কহিলাম—"আমার পিতার নাম উমেশচন্দ্র রায়। তাঁর পরলোক হয়েছে।" তোমরা দেখিবে, কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকুলীন রায়ে পরিবর্ত্তিত করিয়া, আমি ভবিষ্যতে কি মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম।

বাবাজী। আপনার মাতাঠাকুরাণী বর্ত্তমান আছেন ?

আমি অকম্পিত স্বরে কহিলাম, "না"—কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ডটা দুরদুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিঠুর বাবাজীর মুখের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখিলাম, তখনও তাঁহার অধর হাসিতে ভরিয়া রহিয়াছে। সহসা আমার মনে একটা দারুণ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল, বাবাজী হয়ত যোগ-প্রভাবে অন্তর্য্যামী। তিনি হয়ত যোগপ্রভাবে আমার সম্বন্ধে সকল তথ্যই অবগত হইতে পারিয়াছেন। হায় হায়! আমি তাঁহার নিকট কোন্ সাহসে মিথ্যা কহিলাম! কিন্তু এখন ? এখন অনৃতকথন ব্যতীত আমার আর উপায় ছিল না। কাযেই মিথ্যার কলকলয়মান স্রোতে আমি গা ঢালিয়া দিলাম—দেখা যাউক এইটা কূল পাওয়া যায় কি না!

বাবাজী কহিলেন—"কার্ত্তিক বাবু, আপনি কি বিবাহিত হয়েছেন ?

আমি সুশীল,—আমি সহসা কার্ত্তিক নামে অভিহিত হওয়াতে একটু বিচলিত হইলাম ; যেন বোধ হইল, এ কার্ত্তিকের তলদেশ হইতে ময়ূরটা কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। মনের চাঞ্চল্য মনের মধ্যেই গোপন করিয়া আমি কহিলাম—"না মশায়, আমার মত অনাথ বালককে কোন্ বালিকা বিয়ে করবে ?"

বাবাজী। স্বদেশে আপনার কোন সম্পত্তি আছে ?

আমি। কিছু না।

বাবাজী। বাড়ী ?

আমি। আমার তাও নেই।

বাবাজী। কোথায় থাকতেন ?

আমি। কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে।

বাবাজী। আপনি তাঁকে ত্যাগ করে' চলে' আসায় তিনি ত দুঃখিত হবেন। আপনি তাঁর অনুমতি নিয়ে এসেছেন ?

আমি। হাঁ।

বাবাজী। বেশ! এখন আপনার কি বাসনা ?

আমি। আমি আপনার কাছে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হব।

বাবাজী। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতে হলে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার আবশ্যক হবে। ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা শরীরকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ করতে হবে। বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা মানসিক উন্নতিলাভ করতে হবে। মনকে এবং শরীরকে সবল করতে না পারলে, সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা বৃথা।

আমি। আমার শরীরে বিলক্ষণ বল আছে।

বাবাজী তাঁহার নিকটবর্ত্তী একখণ্ড প্রস্তর বাম হস্তের দ্বারা অক্লেশে আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া কহিলেন—"আপনি এই পাথরখানা কতদূর বয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তা পরীক্ষা করে দেখুন।"

প্রস্তরখণ্ড বিষম ভারী। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, তাহা দুই হস্তে উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলাম না। শরীরে এই বল লইয়া, আপনাকে বলবান মনে করিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলাম! বিঠুর বাবাজীর নিকট আমার শারীরিক বলের অহঙ্কার, করীপদ-দলিত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় চূর্ণ হইয়া গেল।

আমি বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, শারীরিক বলের উন্নতি-কল্পে যত্নবান রহিলাম। গৃহপ্রাঙ্গণে কতকটা ভূমিতে মৃত্তিকা খনন করিয়া মল্লক্রীড়ার জন্য স্থান প্রস্তুত ছিল। তথায় প্রত্যহ প্রত্যূষে বাবাজী মল্লক্রীড়া করিতেন। অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় আমিও তাহাতে যোগদান করিলাম।

কিন্তু কেবলমাত্র আমার দৈহিক উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই। মানসিক উন্নতির জন্যও তাঁহার আদেশক্রমে আমাকে পুনর্ম্মুখিক হইতে হইল;—পুনরায় পুস্তক খুলিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতে হইল। স্কুল ছাড়িয়া, মনে করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও পুস্তক খুলিতে হইবে না। তখন ত জানিতাম না যে, স্বর্গে যাইলেও ঢেঁকীর ধান ভানিতে হয়। হায়! এ পবিত্র যোগধর্ম্মও, কলঙ্কিত শশধরের ন্যায় পাঠাভ্যাসরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত। কিন্তু বিঠ্ঠুর বাবাজীর অধ্যাপনার গুণে, এই দুরূহ পাঠাভ্যাসেও কালক্রমে আমার প্রীতি জন্মিয়াছিল। আমার পাঠ সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি যোগধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইলেও, এবং বাবাজী একাহারী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও, তিনি আমাকে সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত, ইংরাজি পুস্তক সকল পাঠ করিতে দিয়াছিলেন।

এইরূপে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধনে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইল। এই শারীরিক ও মানসিক উন্নতির মধ্যে, কেবল একটা রক্তাক্ত ক্ষত আমার হৃদয়ে থাকিয়া গিয়াছিল। মার কষ্টের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরকীয়া সমস্যা।

চারি বৎসর কাটিয়া গেল। চারিবৎসর কাল বিঠুর বাবাজীর নিকট অবস্থিতি করিয়া বুঝিলাম যে বাবাজী অদ্ভুত লোক। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে, এই চারিবৎসর কাল মধ্যে একদিনও আমি তাঁহাকে ক্রোধ বা ক্ষোভ করিতে দেখি নাই। সর্ব্বদা সেই দুর্ব্বোধ, দুর্ল্লভ হাসিতে তাঁহার মধুর অধর ভরিয়া থাকিত।

তোমরা কেহ কখনও এমন অধর দেখিয়াছ কি, যাহা দেখিলে আপনাআপনি বুঝিতে পারা যায় যে, রক্তপুষ্পদলতুল্য এ মধুর অধর রূঢ় ভাষা ভাষণের জন্য সৃষ্ট হয় নাই? যদি এরূপ অধর তোমরা সংসারে দেখিয়া থাক, তাহা হইলে বাবাজীর হাস্যময় মধুর অধরের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। বিধাতা কোকনদের কমনীয় বর্ণে, নবনীতের কোমলতায়, এবং নবপল্লবের লালিত্যে সে অধর রচনা করিয়াছিলেন। তোমরা পাঠিকা! তোমরা সেরূপ অধরের অধিকারী হইতে পারিলে, ঠোঁট ফুলাইয়া বাঁচিতে।

প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে, সেই সহাস্য অধর লইয়া, বাবাজী আমাদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। আশ্রমের একটি অতি বৃহৎ প্রকোষ্ঠে, অত্যন্ত যত্নে রক্ষিত বহুসংখ্যক পুস্তক ছিল। এই সকল পুস্তক মধ্যে কোনও কোনও পুস্তক আমাদের পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত। আমরা দিবাবসানকাল পর্য্যন্ত, তাহা অত্যন্ত

আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ পাঠকালে বাবাজী কখন কখন আমাদের সহিত সমকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু তিনি যখন কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তখন আর আমরা পাঠ করিতে পারিতাম না। নির্ব্বাক হইয়া, একাগ্রচিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহার আবৃত্তি শেষ হইলেও কিয়ৎকাল পাঠাগার যেন তাঁহার গম্ভীর মধুর কণ্ঠস্বরে পূর্ণ হইয়া থাকিত।

তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে গোপনে কহিয়াছিলেন যে, বাবাজী যোগপ্রভাবে দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন। তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, দৈবশক্তির প্রভাবে কত সন্ন্যাসী তাম্রমুদ্রাকে স্থবর্ণ মুদ্রা করিয়া দিয়াছেন; সামান্য ভস্মকে, তোমরা ত শুনিয়াছ, খুঁড়োর সেই রেশমী আল্‌খাল্লা পরা বাবাজী, সর্ব্বরোগবিনাশকর মহৌষধে পরিণত করিতেন। আমি কিন্তু কোনও দিন বিঠুর বাবাজীকে এরূপ অদ্ভুত শক্তি প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। তথাপি একটি বিষয়ে তাঁহার দৈবশক্তি সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তিনি তামাকে সোণা করিতে পারিতেন কি না, তাহা না জানিলেও, তিনি যে গর্দ্দভকে মানুষ করিতে পারেন, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি আমার ন্যায় অতি-গর্দ্দভকেও মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। গর্দ্দভকে যিনি মানুষ করিতে পারেন, তাঁহার দৈবশক্তি সামান্য নহে। তাম্রকে স্থবর্ণ বা ভস্মকে মহৌষধে পরিণত করা অপেক্ষা, এ কার্য্য অল্প কঠিন নহে। আমার ন্যায় ঘোরতর হস্তী-মূর্খকে যিনি জ্ঞানের পথে টানিয়া আনিতে

পারেন, আমার ন্যায় অলস অকর্ম্মণ্যের হৃদয়ে যিনি কার্য্য-তৎপরতার বীজ বপন করিতে পারেন, তিনি মানুষ হইলেও দেবতার শক্তিতে শক্তিমান—তাঁহার নরদেহ দৈববলের আধার!

স্তুঁড়োর সেই বাবাজী সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে বিঠুর বাবাজী তাঁহার শিষ্য। আমি বাবাজীকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, বাবাজী উদ্দেশে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—"আমার ন্যায় তুচ্ছাদপি তুচ্ছকে তিনি এখনও মনে রেখেছেন? আমি যে তাঁর শিষ্য হবারও অনুপযুক্ত।" একজন সহপাঠী আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন—"না, না, তুমি বাবাজীর কথা বিশ্বাস করোনা। বাবাজীর গুরু যে কে, তা আমরাও জানি না বটে, কিন্তু এটা নিঃসন্দেহ জানি যে, বাবাজীর গুরুদেব কলকাতায় গিয়ে রেশমী আলখাল্লা পরেন না; স্তুঁড়োর বাগানবাড়ীতে বসে কামিনীগণের কর্ণে ভবপারাবার পারের উপদেশ প্রদান করেন না।"

আমি আমার সহতীর্থের বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া মৌন রহিলাম।

তিনি পুনরপি বলিলেন—"বাবাজীর একটা স্বভাব কি জান? ইনি সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে, তাঁকে গুরুত্বে বরণ করে ফেলেন।"

কথাটা শুনিয়া, হঠাৎ আমার চারি বৎসরের পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল।—আমি যেদিন প্রথম বাবাজীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন তিনি হাত তুলিয়া আমাকেও নমস্কার

করিয়াছিলেন। হায়! সেদিন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

আজ তাঁহারই অক্লান্ত যত্নে, তাঁহারই অমোঘ মহিমায় আমি ধন্য হইয়াছি—আপনাকে মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। যে প্রস্তর খণ্ডটা উত্তোলন করিবাব শক্তি একদিন আমার ছিল না, এক্ষণে তাহা অক্লেশে ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া, দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি। একদিন ইংরাজিতে কথা কহিতে হইবে ভাবিয়া, ভয়ে বাবার আফিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাহস হয় নাই। এখন কেবল মাত্র ইংরাজী নহে, সংস্কৃত ও উর্দ্দূ ভাষাতেও অবলীলাক্রমে অনর্গল কথা কহিতে পারি। বাবাজীর উপদেশ ছিল যে, সহপাঠিগণ পরস্পর সংস্কৃতভাষায় বাদানুবাদ করিবে; পল্লীবাসিগণের সহিত উর্দ্দূ ভাষায় কথোপকথন করিবে; এবং বিদেশীয়গণের সহিত ইংরাজী ভাষায় উক্তি প্রত্যুক্তি করিবে। আমরা এই উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া, ঐ সকল ভাষা কথনে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দুর্গম জ্ঞানপথেও আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলাম।

বাবাজীর অপূর্ব্ব শিক্ষকতায় যখন আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিলাম, তখন আমার সমস্ত উন্নতি-পথ অবরোধ করিয়া, এক মহা বিঘ্ন আসিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন দয়াময় প্রেমময় ভগবান, না জানি তাঁহার কোন্ মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, আমাকে এক মহা সমস্যার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

যে কামিনীকে ধর্ম্মপথের মহা বিঘ্ন এবং নিতান্ত ত্যজ্যা জানিয়া, আমি এতদিন সযত্নে পরিহার করিয়াছিলাম, সেই কামিনীগণের মধ্যে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর কমনীয় মূর্ত্তি, আমার হৃদয়পটে, প্রেমময় তাঁহারই মায়াতুলিকার দ্বারা বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়া দিলেন। কি মনোমুগ্ধকর সেই চিত্র! সেই চিত্রপটের মানসিক পূজার জন্য আমি পাঠ ও মল্লক্রীড়া ত্যাগ করিয়া, গঙ্গাতীরে এক নিভৃত বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আমাকে অধ্যয়নে অমনোযোগী ও কিছু উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত দেখিয়া, বাবাজী একদিন আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখছি কেন?"

বাবাজীর এই প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান না করিয়া, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—"কামিনী-কাঞ্চন কি বাস্তবিক ধর্ম্মপথের বিঘ্ন?"

বাবাজী আমার মুখের দিকে কিয়ৎকাল হাস্যমুখে চাহিয়া রহিলেন। আমার মনে হইল, তিনি আমার মর্ম্মের অতি নিভৃত স্থানও দেখিয়া লইলেন। পরে মৃদুস্বরে কহিলেন—"না কার্ত্তিক বাবু, কামিনীকাঞ্চন ধর্ম্মপথের বিঘ্ন নয়। সাধারণতঃ কামিনী ও কাঞ্চন মোহ-উৎপত্তির একটা বৃহৎ কারণ বলে', কেউ কেউ ওগুলো ত্যাগ করতে অন্যকে উপদেশ দেন। কিন্তু ধর্ম্ম সাধনার জন্যে ও সব ত্যাগ করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। কামিনী ও কাঞ্চন হতে যে মোহের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাই ধর্ম্মপথের কণ্টক। মোহটাই মহা বিঘ্ন, তা এ মোহটা কামিনীকাঞ্চন হতেই

উৎপন্ন হোক, বা অন্য কোন কারণ হতেই সম্ভূত হোক, মোহই সর্ব্বনাশের মূল—মোহই সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়।"

আমি। কামিনীকাঞ্চন ব্যতীত মোহ উৎপত্তির আর কি কারণ থাকতে পারে?

বাবাজী। মোহ উৎপত্তির শত শত কারণ বিদ্যমান আছে। পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হয়ে, অনেক পিতা অনেক সময় অনেক গর্হিত আচরণ করে' ফেলেন। অমূল্য বিদ্যা, শারীরিক বলও অনেক সময় মোহের কারণ হয়ে পড়ে। পুত্রস্নেহ, বিদ্যা, বল বর্জ্জনীয় নয়; কামিনী কাঞ্চনও ত্যজ্য নয়। শুনুন কার্ত্তিক বাবু, সকল আশ্রম মধ্যে সংসার আশ্রমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের সর্ব্বপ্রধান সামগ্রী কামিনী ও কাঞ্চন। সংসারে সহধর্ম্মিণীই আমাদের ধর্ম্মপথের সাথী; দান-যজ্ঞে অর্থই আমাদের আহুতি। ধর্ম্মপত্নী অতিথি-সেবায় আমাদের সহায়তা করে থাকেন; স্বামী-সেবায়, সন্তান পালনে, দাসদাসীদের প্রতি করুণায়, সংসারকে স্বর্গ করে রাখেন; অর্থের দ্বারা আমরা শত শত সৎকর্ম্মের সাধনা করতে পারি।

আমি। তা হলে কামিনী ত্যজ্যা নয়?

বাবাজী। যে জাতি পুত্রস্নেহ বক্ষে ধারণ করে', মা হতে পারেন, সেই স্ত্রীজাতি পূজ্যা, বরণীয়া; তাঁকে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মনে করে', বক্ষে ধারণ করবেন, তিনি ত্যাগের সামগ্রী নন।

আমি মনে মনে ভাবিলাম, কোন্ অর্ব্বাচীন এ অবর্জ্জনীয়া-গণকে ত্যাগ করিবে?

বাবাজী বলিতে লাগিলেন—"আমরা হিন্দু; আমরা কামিনী ব্যতীত আমাদের ইষ্টদেবতারও কল্পনা করতে পারি নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বামে রুক্মিণীদেবীকে বসিয়েছি; রামচন্দ্রের পাশে সীতা দেবীকে স্থাপন করেছি; একাসনে বসিয়ে হরপার্ব্বতীর পূজা করেছি। আমরা কিরকম করে' কামিনী ত্যাগ করব?"

আমি। কিন্তু যারা যোগধর্ম্ম অবলম্বন করবে?

বাবাজী। তাঁদের পক্ষেও কামিনী ত্যজ্য নন।

আমি। কামিনীরা যোগধর্ম্মেরও বিঘ্ন নন?

বাবাজী। আপনি ত জানেন, ভবানীপতি হলেও মহাদেব যোগিশ্রেষ্ঠ। অহল্যার স্বামী হলেও, গৌতমের আসন অনেক উচ্চে। কোনও কোনও কামিনী নিজেই যোগধর্ম্ম পালন করে' যোগিনী হয়েছেন। যোগী, যোগিনীর সহায়তায় অনায়াসে মহাযোগী হতে পারেন। মনে করুন, আপনি যদি পার্ব্বতীর মত কোন যোগিনীর সহায়তা লাভ করতে পারেন, তা হলে, তাঁর সহায়তায় অল্পকাল মধ্যে মহাদেবের ন্যায় মহাযোগী হয়ে উঠতে পারবেন।

আমি। পার্ব্বতীর মত কামিনী এই পৃথিবীতে কোথায় পাব?

বাবাজী। এই পৃথিবীতেই পার্ব্বতী জন্মেছিলেন, স্বর্গে নয়।

আমি। পার্ব্বতীর মত কামিনী, এই পৃথিবীতে আবার জন্ম গ্রহণ করলেও আমি তাঁকে লাভ করিতে পারব কেন? আমার কি গুণ আছে যে তেমন পত্নী পাব?

বাবাজী। সাধনা করুণ, সাধনায় সব সিদ্ধ হবে।

বাবাজীর সহিত উপরিউক্ত কথোপকথনের পর, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, মাতা ঠাকুরাণীর গুরুদেব প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব কিছুই জানিতেন না। তিনি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধে বাল্য-কালে আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎ-কর; তাহা কোন ক্রমেই শ্রবণযোগ্য নহে। কামিনী কাঞ্চন—বিশেষতঃ কামিনী—কোন ক্রমেই পরিহার্য্যা নহে। কামিনীর চিত্র হৃদয় মধ্যে স্থাপিত করিয়া, অহোরাত্র তাহার পূজা করিলেও, আমার যোগধর্ম্ম ব্যর্থ হইবে না; বাবাজীর আজ্ঞায়, কামিনীলাভের জন্য সাধনা করাও চলিবে।

কি মজা! যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেবও কামিনীকে ত্যাগ করেন নাই। বড় বড় ঋষিরাও বিবাহ করিতেন। বাবাজী বলিয়া-ছিলেন, সাধনার দ্বারা আমিও মনোমত কামিনী লাভ করিতে পারিব। সে কিরূপ সাধনা? তাহা বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করা চলিবে না। তাহা হইলে, আমার গুপ্ত প্রেম প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এ নিষিদ্ধ প্রেম প্রকাশ করিবার নহে; জানিতে পারিলে, বাবাজী আমাকে আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিবেন।

অতএব আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, অহোরাত্র প্রেম সাধনার মন্ত্র খুঁজিতে লাগিলাম। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভাগীরথী তীরে, সেই মহীরুহতলে উপবিষ্ট হইয়া, নিবিষ্ট-চিত্তে, আমার ইষ্টদেবীর চিত্র পূজায় দিবস-যামিনী অতিবাহিত করিলাম। ব্যায়াম ও পাঠাভ্যাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলাম; বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম, "শরীর সুস্থ নহে।" সহপাঠিগণের সহিত আর

বাক্যালাপ করি না ; তাহারা নিকটে আসিলে অন্য পথে চলিয়া যাই। আহারেও আমার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল না। তাহার মূর্ত্তি চিন্তা ছাড়া আর আমার কিছুই ভাল লাগিত না।

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই-রূপে ভগবান আমাকে যে মহা সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা জটিল হইতে জটিলতর হইতে লাগিল। এইরূপে জটিলতায় বিজড়িত হইয়া আমি জড়বৎ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

তা, যে কামিনীর মধুর চিত্র ভগবান আমার হৃদয় মধ্যে আঁকিয়াছিলেন, সে যদি আমার ঘরের কামিনী হইত, তাহা হইলে, তাহা বড় একটা সমস্যার কারণ হইত না। প্রেমময়ের ইচ্ছায়, একটি অপরিচিতা পরকীয়া কামিনীর জন্যই আমার প্রেমাগ্নি-প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। এমত অবস্থায়, আমার পাঠিকা-গণ আমার মুখাগ্নির ব্যবস্থা করিলে, আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইব না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অপরাজিতা।

এই যে পরকীয়া নারীর কথা বলিলাম, তিনি পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আমার সর্ব্বনাশের জন্য কিরূপে শুভাগমন করিলেন, বলি শুন।

একদল তীর্থযাত্রী তীর্থদর্শনাভিলাষে হরিদ্বারে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী। তাঁহারা হরিদ্বার দর্শনের পর, দেশে ফিরিলেন না, হরিদ্বারেই বাস করিতে লাগিলেন। বিঠুর বাবাজীর আশ্রমের অনতিদূরে, গঙ্গাতীরে, এক ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পুরুষ; তিনিই অবিভাবক। অন্য তিনটি কামিনী।

পুরুষ অবিভাবকটি দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ এবং প্রবীণ। বিঠুর বাবাজীর সহিত, বোধ হয়, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচয় ছিল। এই পরিচয়টা কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় বলিয়াই আমার অনুমান হইত।

স্ত্রীলোক তিনটির মধ্যে, দুইটি অবগুণ্ঠনবতী প্রবীণা। তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে লক্ষ্য করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

তৃতীয়টিই আমার সমস্যার মূল, আমার মানসমোহিনী, আমার চিত্তাধিকারিণী। সে যুবতী। অতি ভয়ঙ্কর যুবতী। বিদ্যুৎকটাক্ষময়ী যুবতী!—স্ফুরদ্বিদ্যুদ্বিভায় আমার যোগজ্যোতিঃপূর্ণ

নয়নদ্বয়কে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আমার চক্ষে, সে ছাড়া, সমুদয় পৃথিবী শূন্যময় হইয়া গিয়াছিল। আমি সেই রূপজ্যোতি ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইতাম না।

যুবতীর বয়স অনুমান করা সহজ নহে। ষোড়শীরা এরূপ পূর্ণাঙ্গিনী হয় না; তদধিক বর্ষীয়ারাও এরূপ চঞ্চল কটাক্ষময়ী হইতে পারে না।

সেই যুবতী গঙ্গাস্নানে আসিত। প্রবীণাগণের সমভিব্যাহারে আসিত না; একাকিনী আসিত। আমি যে বৃক্ষতলে উদ্ভ্রান্তচিত্তে উপবেশন করিয়া থাকিতাম, তাহারই অনতিদূরে এক ঘাটে সে অবগাহন করিতে আসিত। প্রত্যহ আসিত। অবগাহনান্তে, মুক্তকেশে আর্দ্রবসনে ঘাটে বসিয়া শিবপূজা করিত। এত ঘাট থাকিতে এই ঘাটে সে আসিত কেন? বোধ হয় ঘাটটী নির্জ্জন বলিয়া, তাহার পূজা আরাধনার সুবিধা হইত। সে কি আমাকে দেখিতে পাইত? কেন দেখিবে? আমার ন্যায় তৃণকে কে চক্ষু মেলিয়া দর্শন করে?

আমি কিন্তু তাহাকে দেখিতাম। মহা নরকের ভয় ভুলিয়া, দেখিতাম। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি, কৃষ্ণগগনের ছায়ার ন্যায়, গঙ্গার স্বচ্ছ জলে ভাসিত,—দেখিতাম। তাহার দিব্য অঙ্গ সঞ্চালনে গঙ্গাজল খল্‌খল্ শব্দে হাসিয়া উঠিত,—শুনিতাম। কূলে বসিয়া ভাবিতাম;—কোন যোগপ্রভাবে, মানুষ দ্রবময় হইয়া, দ্রবময়ীর নির্ম্মল জলে আপন সত্তা মিলাইতে পারে? তাহার বাহু-বিক্ষিপ্ত জলকণা সকল, তাহার রূপাগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, যখন

দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, তখন কূলে বৃক্ষতলে বসিয়া, অনল-পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় ভাবিতাম,—কোন যোগপ্রভাবে মানুষ এ অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিতে পারে?

আমার সর্ব্বনাশ হইল। কে জানে, সুন্দরীরা সংসারের কত সর্ব্বনাশের মূল! সুন্দরী সীতার জন্য লঙ্কার বিপুল রাক্ষসবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। পদ্মিনীর রূপাগ্নিতে মেবারের রণক্ষেত্রে সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সুন্দরী হেলেনার জন্য ট্রয়রাজ্য ছারখারে গিয়াছিল। মিসর-সুন্দরী ক্লিওপেট্রার কটাক্ষতলে রোমীয় বীর-শ্রেষ্ঠের সমস্ত বীরত্ব চূর্ণ হইয়াছিল। আর এই অপূর্ব্বা সুন্দরীর জন্য, আমার আজীবনের আকাঙ্ক্ষা, বাবাজীর সমস্ত শিক্ষা, দুই দিন মধ্যে ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি আত্মহারা হইয়া, মানসিক পাপের অতল জলে ডুবিতে লাগিলাম। কিরূপে এই সুন্দরীকে লাভ করিব, অহরহ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

পনের দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রথম বাবাজীর আশ্রমে দেখিয়াছিলাম। সে সেই পুরুষ অভিবাবকের সহিত বাবাজীকে প্রণাম করিতে আসিয়াছিল;—প্রায় সকল তীর্থযাত্রীই বাবাজীকে প্রণাম করিতে আসিত। আমি তখন বাবাজীর নিকট বসিয়া, কোনও উর্দ্দু পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। তাহাকে আগতা দেখিয়া অপরিচিতার প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ, আমি গৃহান্তরে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম; তাহা অবলোকন করিয়া বাবাজী কহিলেন,—"কার্ত্তিক বাবু, আপনার ওঠবার প্রয়োজন নেই; আপনি বসুন। অপরাজিতা দেবী আর তাঁর পিতা এখনই

প্রস্থান করবেন।” আমি অপরাজিতার দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম; সেও অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে, তাহার বিশাল চক্ষু বিস্তৃত করিয়া আমাকে দেখিতেছিল। সেই তাহাকে প্রথম দেখিলাম; সেই তাহার অপূর্ব্ব আঁখির দৃষ্টিতলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলাম। তদবধি পক্ষকাল গঙ্গাতীরে বৃক্ষতলে বসিয়া, ‘অপরাজিতা’ নাম জপ করিলাম; অপূর্ব্ব অপরাজিতা মূর্ত্তি ধ্যান করিলাম।

পনের দিন পরে, অপরাজিতা দেবী, ভ্রমে আমাকে যথার্থ সন্ন্যাসী মনে করিয়া, স্নান ও পূজা সমাপনান্তে গৃহপ্রত্যাগমন কালে বৃক্ষতলে আসিয়া, ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিল। আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিলাম না। সে দেবীকে আশীর্ব্বাদ করা চলে না। নির্ণিমেষ লোচনে তাহার দেবদুর্ল্লভ অপূর্ব্ব শ্রী অবলোকন করিয়া আত্মহারা হইলাম। তাহার কোকনদতুল্য পদতলে লুটাইতে সাধ হইল।

তদবধি প্রত্যহ স্নানসমাপনান্তে সে আমাকে প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিত। কিন্তু সে কখনও আমার সহিত বাক্যালাপ করিত না। আমিও সাহস করিয়া, তাহার সহিত কথা কহিতে পারিতাম না;—এ সাহস ভগবান সহসা মানুষকে প্রদান করেন না।

এইরূপে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু ক্রমে আমার পক্ষে ধৈর্য্যাবলম্বন করা একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। কেবল মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া তাহার চরণতলে যাইয়া

পতিত হই। চরণপ্রান্তে পড়িয়া বলি, "দেবি! অধমকে রক্ষা কর।"

একদিন অপরাজিতা আমাকে প্রণাম করিতে আসিলে, আমি তাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কি জানি কেন, যাহা আমি বিশেষরূপেই অবগত ছিলাম, তাহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার নাম কি ?"

সে অবনত মস্তকে উত্তর করিল—"আমার নাম অপরাজিতা।"

কি সুধাপূর্ণ কণ্ঠস্বর!—মধুরতায় আমার কর্ণ ভরিয়া গেল। তাহার পর, তাহার সহিত আর কি কথা কহিতে হইবে, কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহা ভুলিয়া গেলাম। আর এমন একটা কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, যাহা জিজ্ঞাসা করি। সে অল্প কাল আমার সম্মুখে —ভক্তের সম্মুখে প্রতিমার ন্যায়- উপবেশন করিয়া, বাটী ফিরিল।

কতদিন মৌনী থাকিয়া, যদি আজ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল, তবে তাহার সহিত কথা কহিবার কথা খুঁজিয়া পাইলাম না কেন? সে চলিয়া যাইবামাত্র আমার মনে শত শত কথা জাগিয়া উঠিল; এ সকল কথা তখন মনে পড়ে নাই কেন? যদি তোমরা পার, তবে এ 'কেন'র উত্তর দিও। আমার নিকট ইহার কোনও উত্তরের প্রত্যাশা করিও না;—তাহার কথা শুনিয়া অবধি আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি।

পরদিন স্নানান্তে নির্ম্মলা হইয়া, অপরাজিতা আবার আসিল। প্রণাম করিবার জন্য নির্ম্মুক্তকেশে আমার সম্মুখে উপবেশন করিল। বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া এতটুকু একটু সূর্য্যরশ্মি তাহার

নির্ম্মল ললাটে পতিত হইল। আমার মনে হইল, ভগবান ভাস্কর যেন তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবতার আশীর্ব্বাদমণ্ডিত, সেই অপূর্ব্বশ্রী মুখাবলোকন করিয়া আমি সেদিনও মূক হইয়া রহিলাম। সে চলিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া, তাহাকে ডাকিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু ডাকিতে পারিলাম না। কি অধিকারে এ অর্ব্বাচীন এক পরস্ত্রীকে আহ্বান করিবে?

তাহার পর দিন সে আবার আসিল। প্রণামের পর, কি জানি কেন, আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, একটু হাসিল। আমি গদ্‌গদকণ্ঠে ডাকিলাম—"অপরাজিতে!"

সে বলিল—"কেন?"

আমি এই ক্ষুদ্র কোমল 'কেন'র উত্তরে কি বলিব? তাহার সহিত কথা কহিবার জন্য অনেক বাক্য, প্রতিবাক্য, উত্তর, প্রত্যুত্তর, প্রশ্ন এবং সমাধান আমি দুই দিন ধরিয়া রচনা করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু এই বিন্দুপ্রায় 'কেনর' উত্তরে কি সদ্‌বাক্য প্রয়োগ করিতে হবে, তাহা স্থির করিয়া রাখা হয় নাই। সুতরাং তুষ্ণীভাবাপন্ন হইয়া, আমি এই প্রশ্নের উত্তর রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সে আমাকে তুষ্ণীক দেখিয়া আবার একটু হাসিয়া, চলিয়া গেল।

প্রতিজ্ঞা করিলাম, পরদিন যে কোনও উপায়ে হউক, তাহার সহিত কিছুক্ষণ বাক্যালাপ করিতে হইবে, তাহার সুধামুখের অমৃতবাণী শুনিতে হইবে; কিন্তু পরদিন সকালে তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

আমি মহা চিন্তিত হইলাম। কেন সে আসিল না? সে কি আমার প্রতি রাগ করিয়াছে? কেন রাগ করিল? আমি ত এমন কোন কার্য্য করি নাই যাহাতে তাহার ক্রোধ জন্মিতে পারে? কিন্তু একটা কথা আছে। বোধ হয়, সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত 'অপরাজিতে' পদে কিছু প্রণয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। বাঙ্গালা 'অপরাজিতা' বলিলেই ভাল হইত। তাহার প্রতি প্রণয়ভাবান্বিত 'অপরাজিতে' পদ প্রয়োগের অধিকার আমার ছিল না। কেন এরূপ কথা প্রায়াগ করিলাম, আমার এই মহা দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল? সে বোধ হয়, আমাকে মহাপাপিষ্ঠ জানিয়া, আমার কাছে কখনও আসিবে না।

একটু পরে, আবার ভাবিলাম, না, সে আমার প্রতি বিরক্ত হয় নাই। বিরক্ত হইলে প্রস্থানকালে হাসিমুখ দেখিতাম না। হয়ত সে অসুস্থ হইয়াছে। ক্রমে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। চিত্ত স্থির রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমি বৃক্ষতল ত্যাগ করিয়া, তাহাদের বাসাবাটীর অভিমুখে অগ্রসর হইলাম, ইচ্ছা যদি কোনও লোকমুখে তাহার তথ্য জানিতে পারি।

তাহাদের বাড়ীর পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে, পথিমধ্যে অপরাজিতার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ ছিল না। বিঠুর বাবাজীর আশ্রমে, অপরাজিতার সহিত সেই একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম; তখন তাঁহার সহিত বাক্যালাপও হয় নাই। এক্ষণে তিনি যেন অত্যন্ত পরিচিতের ন্যায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"এই যে কার্ত্তিক বাবু! আমি আপনার অনুসন্ধানেই বেরিয়েছিলাম।"

সর্ব্বনাশ! আমারই অনুসন্ধানে, আমার মনোমোহিনীর দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ ও প্রবীণ পিতাটি, স্থূল যষ্টিহস্তে রাজপথে বাহির হইয়াছেন! ভয়ে আমার তালু শুষ্ক হইয়া গেল। ভাবিলাম ইহা নিশ্চিত সেই সংস্কৃত 'অপরাজিতে' সম্বোধনের অবশ্যম্ভাবী ফল। নিশ্চিত নির্ম্মমা অপরাজিতা আমার এই প্রণয় সম্ভাষণের কথা তাহার পিতাকে বলিয়া দিয়াছে; শুনিয়া, তাহার পিতা লগুড় হস্তে আমার অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছেন।

আমি সভয়ে ও সচকিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনরূপ রোষলক্ষণ লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। তিনি হাস্যমুখে আবার বলিলেন— "আপনার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই; আমার আয়োজন সামান্য।"

আমি অবাক হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিসের আয়োজন?"

"কেন, আপনাকে কি বাবাজী বলেন নি? আমি যে আপনাকে বল্‌বার জন্যে প্রাতঃকালে তাঁকে বলে এসেছিলাম। তিনি কি আপনাকে বলেন নি? তবে, আপনি এই পথে কোথায় যাচ্ছিলেন?"

পাঠকগণ তোমরা বুঝিয়া দেখ, আমি এই দুর্ব্বোধ বাক্যের কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম কি না। যে মহাভীতি, পিতৃ-

দেবের হাস্যমুখ দেখিয়া আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, এই দুর্ব্বোধ বাক্যকে আশ্রয় করিয়া, তাহা পুনরায় অন্তর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। আমি অবসন্ন নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি কহিব? তাঁহার শেষ প্রশ্নের সত্য উত্তর প্রদান করাও সঙ্গত নহে।

আমাকে নীরব দেখিয়া, তিনি আবার বলিলেন—"আপনার বিলম্ব দেখে, আমি আপনার অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলাম। পথে আপনার দর্শন পেয়ে মনে করলাম যে, আপনি যথাসময়েই আমার বাড়ীতে উপস্থিত হবার জন্যে অগ্রসর হয়েছেন।"

তাঁহার বাক্যের প্রণালী শুনিয়া ও তাঁহার হাস্যমুখ নিরীক্ষণ করিয়া, আমার আতঙ্ক আবার বিদূরীত হইল। আমার বাক্য-স্ফুর্ত্তি হইল। তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশায়ের বাড়ীতে আমি কি কারণে উপস্থিত হব?"

তিনি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন—"আহারের জন্যে। কেন, বিঠুর বাবাজী কি আমার নিমন্ত্রণের কথা আপনাকে বলেন নি? তিনি বলেছিলেন যে, আপনি আহারের জন্য আশ্রমে উপস্থিত হলেই আপনাকে আমার নিমন্ত্রণের কথা বলে' আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন।"

আমি। সকালে আশ্রম ত্যাগ করে' গঙ্গাতীরে গিয়েছিলাম, এ পর্য্যন্ত আশ্রমে ফিরি নি।

তিনি। আর আশ্রমে ফেরবার কোনও প্রয়োজন নেই।

বেলা হয়েছে। আমার সঙ্গে চলুন, আহার করবেন। আপনার বিলম্ব দেখে, আমি আপনার অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলাম।

আমি। আপনি আজ কি উপলক্ষে অতিথি-ভোজনের আয়োজন করেছেন?

তিনি। ব্রত উপলক্ষে আমার কন্যা আজ ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। আপনার প্রতি তার ভক্তি; তার বিশ্বাস আজ ব্রত উপলক্ষে আপনাকে আহার করাতে পারলে, সে অক্ষয় পুণ্যলাভ করবে।

'অক্ষয় পুণ্য!'—'প্রগাঢ় ভক্তি'!—তাঁহার কথা শুনিয়া, তাপসংস্পর্শে তুষার-স্তূপের ন্যায়, আমি দ্রবীভূত হইয়া গেলাম। আহা! আমার মনোমোহিনীর আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি! তবে কিরূপে আমায় হৃদয়মধ্যস্থ মহাপাপ তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়া, তাহার প্রগাঢ় ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিব? হে ভগবান! তৎপূর্ব্বেই তুমি আমার বাক্‌শক্তি হরণ করিও।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অপরাজিতার পরিচয়।

অপরাজিতারা ব্রাহ্মণ। তাহার পিতার নাম অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি অনাথবাবুর সহিত আহার করিতে বসিলাম। দেখিলাম, আহারের জন্যে অন্য কোনও ব্যক্তি আহূত হন নাই। পরিষ্কৃত স্থালীতে বিবিধ ব্যঞ্জন পরিবেষ্টিত পরিষ্কৃত অন্ন! কলিকাতা ছাড়িয়া অবধি এরূপ চিত্তাকর্ষক আহার আর কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। আহার করিয়া বুঝিলাম, ব্যঞ্জন সকল কেবলমাত্র নয়নানন্দদায়ক নহে, সেগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু। সুক্তানি খাইয়া আমার মাকে মনে পড়িল; মা এমনই উত্তম সুক্তানি রাঁধিতে পারিতেন। আজ কোথায় তিনি? এ জীবনে আর কখনও কি সাক্ষাৎ পাইব? হায়! কি মহা পাষণ্ডের মত আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি!

আহার করিতে করিতে অনাথবাবু কন্যাকে আহ্বান করিলেন। সে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া সসঙ্কোচে আমাদের আহার স্থানে আসিল। আমি বুঝিতে পারি নাই, কেন সে আজ আমার নিকট অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া আসিল। অন্যদিন সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত মস্তকে সে আমাকে প্রণাম করিতে যাইত। আজ তাহার এ সলজ্জ ভাব কেন?

কন্যাকে সমাগত দেখিয়া, অনাথবাবু কহিলেন—"মা, এই কার্ত্তিক বাবুর জন্যে আর একটু মুগের ডাল নিয়ে এস।"

আমি বলিলাম—"না, না, আমার আর ডালের আবশ্যক হবে না।"

কিন্তু অপরাজিতা ডাল আনিয়া আমার বাটিতে ঢালিয়া দিল। মোহিনীর সুধাভাণ্ড হইতে কে যেন আমার ডালের পাত্র পূর্ণ করিল। আমি বাটি হইতে স্থালীতে ডাল ঢালিয়া, মহোৎসাহে তাহা আহার করিতে করিতে কহিলাম—"অনাথবাবু, এ ডালটি অতি উপাদেয় হয়েছে।"

অনাথবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ; এটা আমার মেয়ে অপরাজিতা রেঁধেছে।"

আমি ডালের বাটি তুলিয়া, তাহাতে যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া ভোজনপাত্রে ঢালিয়া লইলাম। অনাথবাবু হাঁকিলেন—"অপরাজিতা!"

অপরাজিতা আসিলে কহিলেন—"মা, তোমার রাঁধা ডাল কার্ত্তিক বাবুর বড় ভাল লেগেছে; আরও একটু ডাল এনে দাও।"

অপরাজিতা আবার ডাল আনিয়া, আমার নিবারণোক্তি উপেক্ষা করিয়া, বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিল। ডাল ঢালিবার সময় আমি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিলাম যে, অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কৃষ্ণ ভ্রূ-শরাসন আকুঞ্চিত করিয়া, সে এক হাস্যময় চঞ্চল কটাক্ষ আমার দিকে নিক্ষেপ করিতেছে। তবে কি,

আমার মত, সেও মরিয়াছে? তবে কি আমাকে দেখিবার জন্য তাহারও হৃদয়মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে? আমার হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। একটা মহা আনন্দে যেন আমার দেহ পূর্ণ হইয়া গেল। আহারে আমার প্রবৃত্তি রহিল না।

ভোজনে সহসা আমাকে বীতস্পৃহ দেখিয়া, অনাথবাবু—'ওটা খান, ঐটে খান,—বলিয়া শত শত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আর কোনও দ্রব্য গলাধঃকরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া-ছিল।

আহার ও আচমন সমাধা হইলে, অনাথবাবু একটি প্রকোষ্ঠে আসিয়া বসিলেন। আমিও তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কার্ত্তিক বাবু, আপনার নিবাস কোথায়?"

বাবাজীর নিকট আমি যে পূর্ব্বে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, এখনও তাহা বজায় রাখিতে হইল। আমি বলিলাম—"আমার বাড়ী বাঙ্গালাদেশে, নদীয়া জেলায়, হরিপুর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে।"

অনাথবাবু। আপনার পিতার নাম কি?

আমি। উমেশচন্দ্র রায়।

অনাথ বাবু। তিনি এখনও জীবিত আছেন?

আমি। না, তিনি জীবিত নেই; তিনি জীবিত থাকলে, আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারতাম না।

অনাথবাবু। তা হলে তাঁর মৃত্যুতে আপনার ধর্ম্মপথে

বিচরণের সুবিধা হয়েছে। কার্ত্তিকবাবু, আপনি ধার্ম্মিক বটেন; কিন্তু পিতৃভক্ত নন। আমার পক্ষে পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ। আমার পিতা যখন জীবিত ছিলেন—

আমি। আপনার পিতার নাম কি?

অনাথবাবু। ৺হরনাথ মুখোপাধ্যায়। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়। আমার মধ্যম ভ্রাতার নাম ৺সীতানাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলাম। সেই কাশীনাথ-সীতানাথ-কোম্পানীর কথা মনে পড়িল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার নিবাস?"

অনাথবাবু কহিলেন—"বাঙ্গালা দেশে আমার বাসস্থান নেই। পশ্চিম অঞ্চলে চাকরীর জন্যে যেখানে যাই, সেইখানে বাড়ী ভাড়া নিয়ে বাস করি।"

এই উত্তর শুনিয়া আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন আপনি কোন খানে চাকরী করছেন?"

অনাথবাবু। এখন আমি চাকরি করি না। তীর্থভ্রমণের জন্যে এক বছর ছুটি নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হরিদ্বারে কিছু বেশী দিন থাকা হয়ে গেল।

আমি। কেন?

অনাথবাবু। এ স্থানটা আমার মেয়ের অত্যন্ত ভাল লেগেছে। সে বলে, এ স্থান ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। আমার, আমার স্ত্রীর, আর আমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়া এসেছেন, সকলেরই

হরিদ্বার বড় ভাল লেগেছে। কি নির্ম্মল চঞ্চল গঙ্গার জল! দেখলে চক্ষু জুড়িয়ে যায়। মন ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হয়।

আমি। এখানে আর কতদিন থাকবেন?

অনাথ। জানিনে। আমার এক বছর ছুটির দু' মাস মাত্র শেষ হয়েছে। অপরাজিতার অনুরোধে বোধ হয় আরও দু' তিন মাস থাকতে হবে।

আমি। তার পর?

অনাথ। তার পর আবার অন্য কোনও তীর্থে গিয়ে বাস করব।

আমি কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া, অনেক বিবেচনার পর প্রশ্ন করিলাম—"আপনার মেয়ের কোথায় বিয়ে হয়েছে? জামাতার নাম কি? তিনি কি করেন?"

অনাথবাবু বলিলেন—"আমার মেয়ে কুমারী। এই বিদেশে মেয়ের জন্যে সৎপাত্র কোথায় পাব? দেশে এমন আত্মীয় স্বজন কেউ নেই যে অনুগ্রহ করে আমার মেয়ের জন্যে একটি সুপাত্র এনে দেবে। দেখুন, একটি কথা আমি আপনার কাছে গোপন করব না। হরিদ্বারে এসে আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে মেয়ের জন্যে আমি একটি সুপাত্রের সন্ধান পেলাম। আপনার পরণে দণ্ডীদের মত গেরুয়া কাপড় থাকলেও আমি মনে করে-ছিলাম, আপনার এ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়ে, আপনাকে জামাতা-রূপে গ্রহণ করব। কিন্তু—"

আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিলাম—"কিন্তু কি?"

তিনি বলিলেন—"বাবাজীর কাছে আপনার পরিচয় নিয়ে জানলাম যে আপনারা কুলীন নন, বংশজ ব্রাহ্মণ। আমরা কুলীন, খাসবাড়ীর মুখুয্যে। আমরা কুলপ্রথা নষ্ট করে বংশজ ব্রাহ্মণকে কন্যা সম্প্রদান করতে পারব না। আমরা বরাবর স্বঘরে মেয়ের বিয়ে দিই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনাদের স্বঘর কি?"—বুঝি আমার এই প্রশ্নে কিছু কাতরতা জড়িত ছিল। কিন্তু অনাথবাবু তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—"মনে করুন, আপনি যদি শাণ্ডিল্য গোত্র হতেন—"

আমি। অর্থাৎ?

অনাথ। অর্থাৎ আপনি যদি কার্ত্তিকচন্দ্র রায় না হয়ে, কার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হতেন, আর খড়দা মেলে, নারায়ণ বাড়ুয্যে কিম্বা ভগীরথ বাড়ুয্যের সন্তান হতেন, তা হলে—তা হলে—"

আমি। তা হলে? তা হলে কি করতেন?

অনাথ। তা হলে, বুঝেছেন?

আমি। কি বুঝব?

অনাথ। আমার সাংস্কারা অপরাজিতা কন্যাকে আপনার গৈরিক উত্তরীয়াঞ্চলে বেঁধে দিতাম।

এই বলিয়া অনাথবাবু হাস্য করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মিথ্যা-তত্ত্ব।

তোমরা দেখ, আমি বিঠুর বাবাজীর নিকট যে মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাতে কি ভয়ানক কুফল ফলিল! আমি নিজে জন্মাবধি বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার পিতা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে আমার চৌদ্দপুরুষ এই পরম স্পৃহনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন; আমি কি কুক্ষণে আপনাকে 'রায়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম! এই মহা মিথ্যার ফলে, আমি আমার সর্ব্বস্বকে কবল মধ্যে পাইয়াও হারাইলাম। হায়, দুর্ব্বুদ্ধি মানব কেন মিথ্যা কহে!

আহারাদি করিয়া আশ্রমে ফিরিলাম। বাবাজীর নিকটে অতি ত্বরিতপদে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অসময়ে প্রশ্ন করিলাম —"মিথ্যাকথন জন্য যে পাপ হয়ে থাকে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি?"

হাস্যতরঙ্গে বিঠুর বাবাজীর সমস্ত আনন তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"কার্ত্তিক বাবু, আপনি বসুন। আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যেতে পারে না।"

"কেন? এ কি অতি দুরূহ প্রশ্ন?"

"না, প্রশ্ন দুরূহ নয়। কিন্তু এটা আলোচনা করতে সময় লাগবে। আপনি দীর্ঘকাল কি করে' দাঁড়িয়ে থাকবেন?—বসুন।"

আমি বাবাজীর নিকট উপবেশন করিলাম। বাবাজী বলিলেন—"প্রথমে আমার জানা আবশ্যক, আপনি যে মিথ্যার কথা বল্লেন, সেই মিথ্যার দ্বারা কারও অনিষ্ট হয়েছে কি না। মিথ্যার দ্বারা যখন কারও অনিষ্ট না হয়, তখন ওটা পাপ নয়।"

আমি। তা হলে, পরের অনিষ্ট করাই পাপ ; মিথ্যাটা পৃথক ভাবে পাপ বলে গণ্য হতে পারে না—এই আপনার মত ?

বাবাজী। হ্যাঁ, তাই আমার মত বটে।

আমি। তবে জ্ঞানী লোক ছেলেদের কেন উপদেশ দিয়ে থাকেন যে কদাচ মিথ্যা বলো না ?

বাবাজী। সদুপদেষ্টাগণ এমনও উপদেশ দিয়ে থাকেন যে, কাকেও প্রহার করো না। এই প্রহার নিষেধ অর্থে আপনি এমন বুঝবেন না যে ছাত্র অবাধ্য হলে, শিক্ষক তার ভাবী মঙ্গল কামনা করে তাকে প্রহার করবেন না, কিম্বা যদি প্রতিবেশীর গৃহ দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তা হলে ছাত্র শিক্ষকের উপদেশ স্মরণ করে তাহাকে লগুড়াঘাত করতে বিরত থাকবে। এরূপ স্থলে উপদেশের অর্থ এরূপ বুঝতে হবে যে, যে স্থলে প্রহারের দ্বারা আপন জনের কল্যাণ সাধিত হয়, যে স্থলে প্রহার করতে হবে ; স্থলান্তরে তা নিষিদ্ধ হতে পারে। মিথ্যা সম্বন্ধে শিক্ষকের উপদেশও ঐরকম বুঝতে হবে। যেস্থলে মিথ্যাদ্বারা মানুষের অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মিথ্যাটা বা অন্যের অনিষ্ট করাটা পাপ বটে। কিন্তু এমন অনেক অবস্থা আছে, যে অবস্থায় মিথ্যা কওয়াটা মোটেই পাপ বলে গণ্য হতে পারে না।

আমি। আপনি এমন অবস্থা দেখাতে পারেন, যে অবস্থায় মিথ্যা পাপ নয়?

বাবাজী। তা পারি। আমি এই সকল নিষ্পাপ মিথ্যাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করি। প্রথম, মানুষ মানুষের হিতার্থে যে মিথ্যা কথা বলে, তা মিথ্যা হলেও পাপ নয়। একে 'হিতার্থিনী মিথ্যা' বলা যেতে পারে। এই হিতার্থিনী মিথ্যা স্থল-বিশেষে পুণ্য বলে পরিগণিত হতে পারে।

আমি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মিথ্যার স্বরূপ কি?

বাবাজী। মানসিক উচ্ছ্বাসের সময় মানুষ যে মিথ্যা কথা বলে থাকে, আমি সে সকল মিথ্যাকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করি। সেটা উচ্ছ্বাসময়ী মিথ্যা। মানুষ বিনয় প্রদর্শন জন্যে যে মিথ্যা বলে, সেই বিনয়জা মিথ্যাকে আমি তৃতীয় শ্রেণীর মিথ্যা বলব। এখন কয়েকটা দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে, হিতার্থিনী, উচ্ছ্বাসময়ী আর বিনয়জা মিথ্যার দ্বারা সাধারণতঃ মানুষের কোন অকল্যাণ হয় না। বরং ক্ষেত্র-বিশেষে কল্যাণই হয়ে থাকে।

আমি। মিথ্যার দ্বারা কিরকম করে' কল্যাণ হয়ে থাকে?

বাবাজী। শিক্ষক যখন শিশু-শিষ্যকে পাঠে মনোযোগী করাবার অভিলাষে, তাকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বলে থাকেন, 'পড়া মুখস্থ না করতে পারলে মেরে তোমার হাড় ভেঙ্গে দেব,' তখন নিশ্চয়ই তিনি সত্য কথা কন না। কিন্তু এই অসত্য দ্বারা শিশুর

কল্যাণ সাধিত হয়। অতএব হিতার্থিনী মিথ্যায় শিক্ষকের পাপ-স্পর্শ ঘটে না। আবার দেখুন, ঠাকুরমা যখন, এক যে ছিল রাজা—বলে', ক্ষুদ্র শিশুর চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক মনোরঞ্জন অলীক কাহিনী সকল তাদের কাণে ঢেলে দেন, তখন তাঁর মিথ্যার দ্বারা শিশুর মনে প্রীতি উৎপাদিত হয়। চিকিৎসক যখন মিথ্যা আশ্বাস বাক্যের দ্বারা রোগাতুরকে সান্ত্বনা প্রদান করে', তার আর্ত্তপ্রাণে আশার অগ্নি জ্বেলে দেন, তখন এই হিতার্থিনী মিথ্যা পুণ্যময়ী হয়ে, মানুষের জীবনদানে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্মবেত্তা যখন নরকের কাল্পনিক ভীষণ চিত্র এঁকে মানুষকে নরকের পথ থেকে ফিরিয়ে দেন, তখন হিতার্থিনী মিথ্যা স্বর্গ পথের প্রদর্শক হয়। ঔপন্যাসিক যখন আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্যে অসম্ভব অবাস্তব নায়ক নায়িকার সৃষ্টি করে', তাদের অনাচারিত কার্য্য কলাপ যথার্থ ঘটনার মত বর্ণনা করেন, তখন এই হিতার্থিনী মিথ্যা কি মনোহারিণী হয়ে ওঠে!—ঈসপ্‌, গ্রিম্‌, বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতির মিথ্যার মহিমা চিরদিন তাঁদিকে মহিমান্বিত করে রাখবে।

আমি। আপনি সত্য বলেছেন; তাঁহাদিগের মিথ্যাস্তূপ, নশ্বর জগতে তাঁহাদের অক্ষয় বিজয়স্তম্ভ স্বরূপ এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

বাবাজী বলিলেন—"রিপুগণের প্রাবল্যে, আমরা কখন কখনও এক প্রকার নিরীহ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি, তাও আমাদের সেই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তা উচ্ছ্বাসময়ী মিথ্যা। কাম ক্রোধাদির উচ্ছ্বাসে, আমরা অজ্ঞানান্ধ হয়ে পড়ি। এই অজ্ঞান

অবস্থায় আমরা যে মিথ্যার উচ্চারণ করি, তা, অজ্ঞানকৃত অন্য কার্য্যের মত, পাপ বলে গণ্য হতে পারে না।"

আমি। বলেন কি?—অজ্ঞানতাটা নিজেই ত একটা মস্ত পাপ।

বাবাজী। অজ্ঞানতা পাপ নয়।—অবিদ্যা পাপ বটে। মস্তিষ্কের বিকারে বা অপরিপক্কতায় অজ্ঞানতা আসে, মস্তিষ্কের অশিক্ষায় অবিদ্যা ঘটে। অজ্ঞান শিশু বা মূর্চ্ছিত ব্যক্তি, নিজ-কৃত কার্য্যের জন্যে পাপী হয় না। যাক্, এ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব না। এখন মিথ্যা তত্ত্বের আলোচনা হচ্ছে তাই শুনুন। উচ্ছ্বাসময়ী মিথ্যাকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। মিলনে বা বিচ্ছেদে, প্রণয়িনীর প্রতি আমরা যে মিথ্যার প্রয়োগ করি, তাকে আমরা কামজা মিথ্যা বলব; বিদ্বেষে, বিরাগে যে মিথ্যার উচ্চারণ করি, তা ক্রোধজা মিথ্যা; ক্ষুধায়, আকাঙ্ক্ষায় লোভজা মিথ্যার উচ্চারণ করে থাকি; গৌরবোচ্ছ্বাসে মদজা মিথ্যার উৎপত্তি; স্নেহে, ভয়ে, শোকে, কষ্টে আমরা বিহ্বল হয়ে যে মিথ্যা কই, তা মোহজা; এ ছাড়া, মাৎসর্য্য থেকেও উচ্ছ্বাসময়ী মিথ্যার উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই যে ছ' রকম মিথ্যার কথা বল্লাম, এ সমস্তই উচ্ছ্বাসময়ী মিথ্যা। রিপু সক থেকে এর উৎপত্তি হলেও, যতক্ষণ এতে কাহারও অনিষ্ট না হয়, ততক্ষণ এ মিথ্যাও পাপ নয়।

আমি। তা যেন বুঝলাম। কারও অনিষ্ট হল না, সুতরাং পাপ নেই। কিন্তু সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক, রিপু

সকল দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমরা যে কায করি, তা পাপ নয় কি?

বাবাজী। না। যতক্ষণ আমরা কারও অনিষ্ট চিন্তা না করে' রিপুচালন করি, ততক্ষণ রিপুসকলকে আপনি পাপোৎপাদক বলে' গণ্য করবেন না। রিপুর দ্বারা জগতের কত কল্যাণ হচ্ছে, তা কি আপনি জানেন না? যে দাম্পত্য-প্রেম পৃথিবীকে সুধাময় করে রেখেছে, তার উৎপত্তি কাম হতে। যে পবিত্র মাতৃস্নেহ পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলেছে, মোহ হতে তাহার উৎপত্তি। আর এই অহঙ্কার রিপুটা!—এ দ্বারা জগতের কত মঙ্গল হচ্ছে, তা একবার ভেবে দেখুন! যদি যোদ্ধার হৃদয়ে বীরত্বের অহঙ্কার না থাকত, যদি স্ত্রীগণের মনে সতীত্বের অহঙ্কার না থাকত, তা হলে মনুষ্য-সমাজ কতটা হীন হয়ে পড়ত বলুন দেখি! যদি রিপুর দ্বারা, অধিকাংশ স্থলে জগতের কল্যাণ না হত, তা হলে, কল্যাণময় বিধাতা মানব-হৃদয়ে তার অস্তিত্ব রাখতেন না।

অতঃপর তিনি উদাহরণ দ্বারায় বিবিধ প্রকারের নিরীহ মিথ্যার কথা আমায় বুঝাইতে লাগিলেন।

মিথ্যা-বিজ্ঞান সংক্ষেপে সমাধা করিয়া, মৃদু হাস্য সহকারে বাবাজী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

আমি বলিলাম—"আমার প্রশ্নের এখনও উত্তর পাই নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে মিথ্যাকথন জন্য যে পাপ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত কি? আপনি বলেছেন, সকল মিথ্যা অনিষ্টকারী নয়, কাযেই তা পাপ বলে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু আমি

যে মিথ্যার কথা বলছি তা আপনার কথিত মিথ্যা সকলের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। তাতে ব্যক্তি-বিশেষের অনিষ্ট ঘটেছে।"

বাবাজী হাসিলেন ; কহিলেন,—"কার অনিষ্ট ঘটেছে ?"

আমি একটু মুস্কিলে পড়িলাম। ভাবিলাম, কি উত্তর দিব ? মিথ্যা কহিয়াছি বলিয়া বাবাজীর নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ জন্য আসিয়াছিলাম, আসিয়া দেখিতেছি আবার মিথ্যা কথা না বলিলে উপায় নাই। হায়, ভগবান ! যে একবার মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে কি আর কখনই সত্য কথনের অবসর দিবে না ?

উত্তর দানে আমাকে অসমর্থ বুঝিয়া বাবাজী বলিলেন— "মিথ্যার দ্বারা অনিষ্ট ঘটলে তাতে পাপ আছে বটে ; কিন্তু প্রত্যেক পাপেই প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করতে হয় না। পরের অনিষ্টে যে পাপ-স্পর্শ ঘটে, তার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মিথ্যার অনিষ্টটা অনেক সময় মিথ্যাবাদীরই স্কন্ধে এসে পড়ে। অনিষ্ট নিজের স্কন্ধে এসে পড়লে আপনা হতেই পাপের দণ্ড-ভোগটা ঘটে যায়। তখন আর অন্য প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা থাকে না। আপনি বাঘ ও মেষ পালকের সেই পুরাতন গল্পটা জানেন ত ? সে স্থলে মিথ্যার জন্যে মিথ্যাবাদীর প্রাণদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।"

আমি। বেচারার মুণ্ডটা বাঘে চিবিয়ে খেয়েছিল। কি ভয়ানক !

বাবাজী। এজন্য মিথ্যা নিবারণ আশায়, আমরা শিশুদের কোমল গাত্রে বেত্রাঘাত করি। মিথ্যা গল্প বলে' মিথ্যাকথনের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করি। আপনি যে মিথ্যার কথা বলছেন, তাতে যদি মিথ্যাবাদীর নিজের দণ্ডভোগ ঘটে থাকে, তা হলে আর অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন কি?

ভগবান জানেন, মিথ্যাকথন জন্য আমি অন্তর মধ্যে কি দণ্ড-ভোগ করিতেছিলাম! মুষ্টিমধ্যে পাইয়াও, আপন মিথ্যা পরিচয় জন্য, আমি প্রাণাধিকা অপরাজিতাকে হারাইতে বসিয়াছিলাম। এ দণ্ড আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হইয়াছিল।

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ ছিল যে, তদ্দ্বারা কাহন কতক কড়ি বা মুণ্ডিত মস্তকের কেশরাশির বিনিময়ে পাপের কুফল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। আমার আরও বিশ্বাস ছিল যে, মিথ্যা-পাপের কুফল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই, আমার অন্যান্য পুণ্যফলে (আমি অত্যন্ত পুণ্যাত্মা কিনা) অপরাজিতাকে লাভ করিতে পারিব। কিন্তু বাবাজী কি বলিলেন, তাহা তোমরা শুনিলে ত? আমার কৃত কার্য্যের ফলভোগই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

তবে কি তাহার আশা আমি ত্যাগ করিব? মৃণাল-কণ্টকে জর্জ্জরিত-দেহ ভ্রমর কি পদ্মের আশা ত্যাগ করে? লগুড়-লাঞ্ছিত মার্জ্জার কি ভর্জ্জিত মৎস্যমুণ্ডের আশা ত্যাগ করে?

আমাকে যোগধর্ম্মাবলম্বী জানিয়া কেহ কেহ হয়ত একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। বলিতে পারেন, এই

মনোমোহিনী বালিকাকে লাভ করিবার জন্য, আমি কেন যোগ-বল প্রয়োগ করি নাই? বলিতে পারেন, যে বজ্রোলী মুদ্রা সাধন করিয়া, যদি স্বাধিষ্ঠান কমলদলাধিষ্ঠিতা রাকিণী শক্তির ধ্যান করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, এ বালিকা ত তুচ্ছা মানবী, দেব কন্যারাও আমার এই কর্দ্দমানুলিপ্ত কান্ত পদপ্রান্তে লুন্ঠিতা হইত। কিন্তু—কিন্তু বাবাজী মৃদু হাস্য সহকারে গার্গী, যাজ্ঞবল্ক্য, ঘেরণ্ড, ও অষ্টাবক্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন, কিন্তু যোগধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব আমাকে কিছুই অবগত করাইতেন না। পাপ পিত্তলকে কিরূপে পবিত্র সুবর্ণে পরিণত করিতে হয়, সংসারাসক্তা কুলকামিনীগণকে কিরূপে পবিত্র-প্রেমের পুষ্পাস্তীর্ণ পথে পরিচালিত করিতে হয়, এ সকল নিগূঢ় শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে কোন শিক্ষাই প্রদান করিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলে, হাসিতেন। বলিতেন, "পিত্তলকে সুবর্ণে পরিণত করিলে, ওটা যখন আর মূল্যবান বস্তু থাকিবে না, তখন এ প্রক্রিয়ার দ্বারা জগতের কি কল্যাণ সাধিত হইবে?" বলিতেন, "কামিনীগণ যখন স্বভাবতঃই প্রেমপথবিচারিণী, তখন ইহার জন্য আর যোগবল প্রয়োগের আবশ্যকতা কি?" বলিতেন, "আমরা এই অনুপম গূঢ় বিদ্যালাভের অনধিকারী। ঘেরণ্ড প্রভৃতির শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা এ বিদ্যা অনধিকারীকে প্রদান করেন না।"

বাবাজী একদিন আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি জানবেন কার্ত্তিক বাবু, এই হঠযোগ বিদ্যাটা শারীরিক ও মানসিক ব্যায়ামের চরম পরিণতি। এ বিদ্যা লাভ করতে হলে

শারীরিক ও মানসিক শক্তির শেষ সীমায় উপনীত হতে হয়। আপনি বা আমি এখনও সে চরম শক্তি লাভ করতে পারি নি; এ জীবনে কখনও যে লাভ করতে পারব এমন আশাও নেই—কেন না, এক জীবনকালব্যাপী অনুশীলনে সকলের সকল শক্তি স্ফুরিত হয় না। এ রকম শক্তি জন্ম জন্ম একাগ্র অনুশীলনের ফল। সুতরাং আমরা মুদ্রা কুম্ভক এবং সমাধির দ্বারা এখনও যোগী হবার যোগ্য হইনি।"

সেদিন রাত্রিকালে আমি সুখনিদ্রা লাভ করিতে পারি নাই। অপরাজিতা-লাভের চিন্তায় আমার চর্ম্মশয্যা হোমকুণ্ডের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়াছিল। অপরাজিতা-অগ্নিতে দহ্যমান দেহটা সদ্যোধৃত রোহিত মৎস্যের পুচ্ছের ন্যায় শয্যামধ্যে সন্তাড়িত হইতেছিল। হতাশাসের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে কক্ষবায়ু উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রভাত-দর্শন-লালসায় আমি বারবার গবাক্ষ পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। কখন প্রভাতের অরুণালোক দেখিব? কখন গঙ্গার তরঙ্গ সকলকে অরুণালোকে প্রতিবিম্বিত দেখিব? কখন অরুণালোকিত তরঙ্গ মধ্যে স্বর্ণালঙ্কারে জ্যোতির্ম্ময় রত্নের ন্যায় অবগাহননিরতা অপরাজিতার উজ্জ্বল রূপরাশি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব?

নবম পরিচ্ছেদ

বাধা ভাঙ্গিল।

বিরহের রাত্রি হইলেও, রাত্রি চিরস্থায়িনী নহে। তাই অবশেষে প্রভাত আসিল; শীতল বায়ু প্রবাহিত হইল; বায়ুস্পর্শে বৃক্ষগণ নাচিল; বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গমগণ সঙ্গীতে নিযুক্ত হইল। আমি বাঁচিলাম,—শয্যাত্যাগ করিয়া গঙ্গাসৈকতে সেই বৃক্ষতলে যাইয়া উপবেশন করিলাম। আমি অপরাজিতার আগমন প্রতীক্ষায় তাহার আগমন পথের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। বুঝি সূর্য্যোপাসকগণ প্রভাতারুণের প্রথম দর্শন-লালসায় তেমন আগ্রহভরে চাহিয়া থাকে না; বুঝি প্রভাতপদ্মের প্রথম উন্মেষণ প্রতীক্ষায় মধুমক্ষিকাগণ তেমন কাতরভাবে চাহিয়া থাকে না।

কিন্তু অপরাজিতার আগমন-প্রতীক্ষায় আমাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হয় নাই। আমি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম যে, সে আমার উপবেশন-স্থানের পার্শ্ব দিয়া, স্নানার্থ গঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। সে কখনই স্নানের পূর্ব্বে আমাকে প্রণাম করিতে আসিত না; আজও আসিল না।

স্নান-সমাপনান্তে সে আর্দ্রবসনে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল।

আজ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া ছিলাম যে, তাহার সহিত

কথা কহিব। কাযেই সে আমাকে প্রণাম করিবামাত্র, একটু সৎসাহস সংগ্রহ করিয়া, আমি বলিয়া ফেলিলাম—"আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করছি।" কি নীরস শুষ্ক সম্ভাষণ!—প্রণয়গন্ধবিহীন, এ বেসুরা আশীর্ব্বাদ কেন আমার মুখ হইতে নির্গত হইল? কথা যদি ফুটিল, ত সরস প্রেমপরিপ্লুত কথা ফুটিল না কেন?

সেই নীরস আশীর্ব্বাদ শুনিয়া, অপরাজিতা মৃদু হাস্যরসে রক্তাধর সরস করিয়া, আমার পদপ্রান্তে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার অবনত চক্ষু দুইটিতে কি একটা কৌতুক যেন ক্রীড়া করিতে লাগিল।

দেখিলাম, তাহার আর্দ্র বসনের জলকণার সহিত, তাহার লজ্জানিপীড়িত অঙ্গের লাবণ্য যেন ঝরিয়া পড়িতেছে; যেন সে দেহে, তত লাবণ্যের স্থান হইতেছে না। দেখিয়া বুঝিলাম, এ দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, মহা ধৃষ্টতা করিয়াছি,—এ দেবীর রক্তচরণতলে পতিত হইয়া বলিতে হয়, 'বর দাও, বর দাও।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। এই শুষ্ক, বেসুরা আশীর্ব্বচনের পর, মনোহারিণী অন্যা কি কথা কহিব? কোন্ সরস ভাষায় তাহার তৃপ্তিলাভ হইবে? স্থির করিলাম, কল্যকার উৎকৃষ্ট রন্ধনের কথা উত্থাপিত করিয়া, তাহার মনস্তুষ্টি সাধিত করিব;—কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম যে, স্ত্রীলোকেরা আপন রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিলে, একেবারে তরল

হইয়া যায়; তখন তাহাদিগকে পাত্রান্তর করা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। অতএব আমি আপন মনে তদ্‌বিষয়ক যশোবাক্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ভাবিলাম, প্রথমে বলিতে হইবে সুক্তানিটা সরস হইয়াছিল। তাহার পর বলিব, দালটা গলিয়া যেন ফেন হইয়া গিয়াছিল। ভাবিলাম, ফেন অতি ছোট কথা, উহার অগ্রপশ্চাৎ লেজ জুড়িয়া উহাকে জাঁকাল করিতে হইবে; বলিতে হইবে, দালটা দুগ্ধ-ফেন নিভ হইয়াছিল। দুগ্ধ-ফেন-নিভ দাল!—আহা! কি গালভরা নাম, কি বুকভরা, পেটভরা সামগ্রী! বলিতে হইবে, ডাল্‌নাটা মোক্ষফলের মত মধুর হইয়াছিল। মোক্ষফল তোমরা কখন খাইয়াছ কি? কলিকাতায় আমাদের পাড়ায়, পল্লীগ্রাম হইতে এক জমীদার-পুত্র আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। পৈতৃক ঋণের জন্য তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তচ্যুত হওয়ায়, তিনি পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পল্লীগ্রাম হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল একটি রূপার আলবোলা, আর একখানি জরাজীর্ণ জামীয়ার। সেই জমীদারপুত্রের নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতামহ তিব্বত হইতে মোক্ষফল আনাইয়া, তাহা পাঁচ সের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ এক-একটি আহার করিতেন। এই মোক্ষফল খাইয়া তাঁহার একশত বৎসর বয়সেও একগাছি চুল পাকে নাই; একটি দাঁত পড়ে নাই। ডাল্‌নাটা মোক্ষফলের মত হইয়াছিল বলিলে অপরাজিতা একেবারে গলিয়া যাইবে।

কিন্তু বহু কষ্টে যে সকল বাক্য রচনা করিলাম, তাহা আর

বলা হইল না। আমাকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া, অপরাজিতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমার ইচ্ছা হইল, তাহার রক্ত করপল্লব দুইখানি হস্তে ধারণ করিয়া, তাহাকে আবার উপবেশন করাই। কিন্তু কৈ তাহা পারিলাম? দীন সন্নাসী কিরূপে দেবীদুর্লভ অপূর্ব্ব কর স্পর্শ করিবে? আমি কেবলমাত্র সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাড়ী যাচ্ছেন ?"

সে অতি মৃদু স্বরে বলিল—"হ্যাঁ আজ যাই; কাল আবার আসব।"—কি মধুর স্বর! বুঝি প্রভাতের পাখীতেও তেমন মিষ্ট স্বরে গান গাহিতে পারে না; বুঝি, বীণাপাণির বীণাতেও তেমন তান বাজে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাল কখন আস্‌বেন ?" সে গমনোন্মুখী হইয়া বলিল—"গঙ্গাস্নানের পর এই সময় আসব।"

তাহার পর আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিন একটা মস্ত কায হইয়াছিল। প্রণয়-প্রবাহের একটা বৃহৎ বাধা অপসারিত হইয়াছিল। সেদিন আমার মুখ ফুটিয়াছিল;—আমাদের মধ্যে বাক্যালাপের বাধা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তোমরা জান, এ বাধা কি ভয়ানক বাধা। কিন্তু এ বাধা একবার ভাঙ্গিয়া গেলে, যে অবাধ বাক্যস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা সহজে নিবারিত হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ

মুখ ফুটিল।

কাযেই পরদিন প্রভাতে অপরাজিতা আমার নিকট আসিলে, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, সহজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম—"আপনি সমস্ত দিন কি করেন? আমাকে বলুন।"

সে মৃদু সুধাহাসি হাসিয়া বলিল—"গঙ্গাস্নানের পর বাড়ী গিয়ে রান্নাঘরে মার সাহায্য করি।"

আমি। আপনাদের রান্না অতি পরিপাটী। সেদিন যা খেয়ে এসেছি, তা জীবনে কখনও ভুলব না।

সে কিয়ৎকাল মৌন থাকিয়া বলিল—"আজ যদি অনুগ্রহ করে' আহার করেন, মা অত্যন্ত সুখী হবেন।"

আমি। আর, আপনি?

লজ্জারোগে তাহার গণ্ডযুগল বিলক্ষণ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে তাহার সস্মিত মুখখানি আনত করিয়া বলিল—"আমরা সকলেই সুখী হব। আপনি যাবেন কি না, বলুন।"

আমি। বাবাজী অনুমতি করলে, অবশ্যই যাব।

অপরাজিতা। আর, বাবাজী যদি অনুমতি না করেন?

আমি। তা হলেও যাব। আপনার নিমন্ত্রণ অবহেলা করবার সাধ্য আমার নেই।

অপরাজিতা। কেন?

আহা! কি উৎকৃষ্ট সুযোগ আসিয়াছে! এই 'কেন'র উত্তর দিতে পারিলেই ত প্রাণাধিকা অপরাজিতা আমার প্রাণের সংবাদ অবগত হইবে। এ 'কেন'র কি উত্তর দিতে পারিব না? জয় বাগ্‌দেবী! জয় দয়াময়ি! তুমি আমার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিতা হও। আমি যেন এ কেনর উত্তর দিতে পারি। আমি একদিন ভগবানের কাছে প্রর্থনা করিয়াছিলাম যে আমার হৃদয়ের পাপ মুখে ব্যক্ত করিবার আগে, যেন তিনি আমার বাক্‌শক্তি হরণ করেন। আজ সেই পাপ ব্যক্ত করিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়া দেবী সরস্বতীর বরপ্রার্থনা করিলাম! আমার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তোমরা হাসিও না। এখনও আমার অনেক পরিবর্ত্তন বাকী আছে। এ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল; আমি জগতের লোক, পরিবর্ত্তনে আমার লজ্জা কি?

অপরাজিতা স্বীয় প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশায়, তাহার বিশাল লোচনদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া মুগ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। দেবী সরস্বতীর কৃপালাভ করিয়া আমি বলিলাম —"সত্যি বলছি, আপনি ডাকলে আমি নরক পর্যন্ত যেতে পারি।"

অপরাজিতা। কেন, আমি কি, যে আমার ডাকে নরকে যাবেন?

আমি। আপনি আমার সব।

অপরাজিতা। ছি!

আমি। শুনুন—শোন অপরাজিতা। তুমি আমার—

অপরাজিতা। ছি ছি! গেরস্ত মেয়েদের ও সকল কথা শুনতে নেই। আমি বাড়ী ফিরে যাই। আপনি যোগধর্ম্মে মন দিন।

আমি। যোগধর্ম্ম আমি কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন দিয়েছি।

অপরাজিতা। আমি চল্লাম।

অপরাজিতাকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া, আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। কাতরস্বরে কহিলাম—"না না, এখন যেও না। আমার সকল কথা শোন। তোমাকে সকল কথা না বলতে পারলে আমি বাঁচব না।"

সে আমার দিকে ফিরিয়া হাসিল। আমার মনে হইল যেন আমার কাতরতা দেখিয়াই তাহার মনে আনন্দ হইল। সে হাসিয়া বলিল—"আপনি একটু ভেবে দেখুন। আপনি যে কথা বলছেন, তা আমার শোনা উচিত নয়। আমি বাড়ী যাই। আপনি আহার করবার জন্য যেতে ভুলবেন না।"

তাহার হৃদয়হীন হাসিতে আমার মর্ম্মপীড়া জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তাহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া আমার দুঃখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। দুঃখে চোক দিয়া দুই ফোঁটা জল বাহির হইয়া পড়িল। কাতরতায় মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়ভেদী স্বরে কহিলাম—"তবে যাও।"

সে আমার কাতরতা ও চক্ষে জল দেখিয়া আবার বসিল। বলিল—"ওকি! আপনি কেঁদে ফেল্লেন? আমাকে ক্ষমা করুন; আমার অপরাধ হয়েছে। কি বল্‌ছিলেন বলুন, আমি শুনব।"

দেখিলাম, দুফোঁটা চোখের জলে বিলক্ষণ কায হইয়াছে। বলিলাম—"আমি তোমাকে ভালবেসেছি।"

অপরাজিতা। তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

আমি। দেখ, যেদিন তোমাকে বাবাজীর আশ্রমে প্রথম দেখলাম, সেই দিন থেকেই আমার এই সর্ব্বনাশ হয়েছে। সেই দিন থেকে দিনরাত কেবল তেমারই নাম জপ করেছি; চোখে কেবল তোমাকেই দেখেছি; কাণে কেবল তোমারই কথা শুনেছি। আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়েছে, যেন তা তোমারই রূপে পূর্ণ হয়ে রয়েছে; গঙ্গার দিকে তাকালে মনে হয়েছে, যেন তা তোমারই লাবণ্য-প্রবাহ। ফুলের গন্ধে ভেবেছি তুমি এসেছ; শুকণ্ঠ পাখী ডাকলে ভেবেছি, তুমি কথা ক'চ্চ।

অপরাজিতা। দেখছি, আপনি আমাকে খুব বেশী ভালবেসে ফেলেছেন! এ আবার কাব্যময়ী ভালবাসা!—এতে আকাশ, গঙ্গা, ফুল, পাখী সবই আছে।

আমি। এখন আমার উপায়?

অপরাজিতা। দু'টি উপায় আছে। একটি হচ্ছে যোগধর্ম্মে খুব মনোনিবেশ করে, ভালবাসার কাব্যটুকু ভুলে যাওয়া। আর একটি হচ্ছে যোগধর্ম্মে আর অন্যান্য ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে, পাপপথে বিচরণ করা, আর আমাকেও সেই পথের পথিক করা।

আমি। যোগধর্ম্মে বহুকাল জলাঞ্জলি দিয়েছি। এ গেরুয়া বসনে, বুকের এই উদ্বেগ আর ঢেকে রাখবার উপায় নেই। আর, তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী নও, তোমাকে যেদিন কামনা করেছি, সেই দিন থেকেই নরকের পথে চলেছি।

অপরাজিতা। এটাকে যখন নরকের পথ বলে বুঝেছেন,

তখন এ পথ থেকে আপনি সহজেই ফিরতে পারবেন। আপনি পুণ্যাত্মা, যোগধর্ম্মের প্রভাবে আবার স্বর্গের পথ খুঁজে পাবেন।

আমি। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান।—আমি যদি তোমাদের 'পাল্‌টি' ঘর হতাম, তাহলে তোমার বাবার কাছে তোমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করতাম।

অপরাজিতা। তা হলে, বড় ভাল হত। আমাকে বিবাহ করে ধর্ম্মপথে থেকেই আপনার ভালবাসা সার্থক করতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নয়। আমি কুমারী নই;—অন্যের বিবাহিতা বনিতা। আমার স্বামী এখনও জীবিত আছেন। তাঁরই কল্যাণে, এই দেখুন, এখনও সিঁথিতে সিন্দূর পরে আছি। দুঃখের বিষয়, আমার স্বামী আমাকে কখনও গ্রহণ করেন নি!"

দেখিলাম, সত্যই ত!—ক্ষুদ্র দীপশিখার ন্যায়, সুন্দর সিন্দূর রাগ তাহার সীমন্তপ্রান্তে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে কম্পনে, মুহূর্ত্তমধ্যে, সমস্ত প্রেমচিন্তা আমার হৃদয় হইতে যেন ঝরিয়া পড়িল। আমি আর কোন কথাই অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

সে আমাকে মৌন ও চিন্তান্বিত দেখিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। পরে আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "খেতে যেতে ভুলবেন না।"

অপরাজিতা চলিয়া গেলে, আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমি কোন্ সাহসে এই পতিব্রতার প্রতি পাপদৃষ্টি নিক্ষেপ

করিলাম! ভাবিলাম, সর্ব্বশক্তিমানের সৃষ্ট আমরা মানুষ, আমরা কেন পাপ দমন করিতে অসমর্থ? হে সর্ব্বশক্তিমান! আমাকে বুঝাইয়া দাও, কেন তুমি আমাদিগকে পাপপথে বিচরণ করিবার অবসর প্রদান কর? তোমার অসীম শক্তির ভাণ্ডারে, আমাদের মন হইতে পাপ দূর করিবার শক্তি কি তোমার নাই? তবে—তবে আমরা তোমাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব কেন? আমি মনে মনে ঠিক করিলাম, বাবাজীকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ঠকাইব।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম প্রসঙ্গ।

অপরাজিতাদের বাটীতে আহার করিয়া, তৃতীয় প্রহরে আশ্রমে ফিরিয়া, বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরমেশ্বরকে আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলেন ?"

বাবাজী তাঁহার সেই দুর্ব্বোধ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"না।"

বাবাজীকে ঠকাইবার যে উৎসাহ-অনল, আমি হৃদয়ে প্রজ্জলিত করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা মূহূর্ত্তমধ্যে নিবিয়া গেল। আমি মনে করিয়াছিলাম যে বাবাজী বলিবেন, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্; আর আমি পৃথিবীর রাশি রাশি অভাব ও পাপ দেখাইয়া বলিব, তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান্, তবে তাঁহার রচনায় এত দুঃখ কেন ? তাঁহার পৃথিবী পাপে ডুবিয়া যাইতেছে কেন ? কিন্তু বাবাজী ছোট একটি 'না'তে আমার বাক্‌রোধ করিয়া দিলেন।

আমাকে নীরব দেখিয়া, বাবাজী বলিলেন—"কার্ত্তিকবাবু, আপনি বসুন, আজ আপনার সঙ্গে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করব।"

আমি। আপনি বলুন। কতকগুলি বিষয়ে আমার মনে কতকগুলি সন্দেহ জন্মেছে।

বাবাজী। সে সন্দেহগুলি, শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সন্দেহ।

তাঁরা ভগবানে নিজেদের মনগড়া কতকগুলি বিশেষণের আরোপ করে', তার পর সন্দিগ্ধ নয়নে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকেন।

আমি। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন যে ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা, ভগবান দয়াময়, ভগবান সর্ব্বশক্তিমান্। দেখছি আপনি ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমান বলেন না।

বাবাজী। আমি সুশিক্ষিত নই।

আমি। আপনি তাঁকে দয়াময়ও বলেন না।

বাবাজী। না।

আমি। স্রষ্টা?

বাবাজী। না, মনুষ্যরচিত ভাষায় কোন বিশেষণই তাঁতে প্রযোজ্য নয়। সেই নিত্য ও অব্যয় সামগ্রীটি সম্পূর্ণ নির্গুণ। ইয়োরোপীয় দার্শনিকগণ ভগবানে কতকগুলি মনুষ্য-কল্পনা-প্রসূত গুণের আরোপ করে, পরে তার অসামঞ্জস্য দেখিয়ে, আপনাদের গভীর দর্শন জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকেন। ইয়োরোপীয়দের কাছে শিক্ষিত হয়ে, আমরাও সেই নির্গুণকে কতকগুলি গুণে অলঙ্কৃত করে, পরে বিশ্বের কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বথা সে সকল গুণের সন্ধান না পেয়ে, তাঁর প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে পড়ি। ভারতীয় ঋষিগণ বলেছেন, তিনি—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাচ নিত্যং রসগন্ধবর্জ্জিতম্।" মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করে, শেষে মহা অপরাধীর ন্যায় বলেছেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।

ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্‌ ॥”

আমি। এই রসগন্ধ বর্জ্জিত রূপবিবর্জ্জিত অনির্ব্বচনীয়কে, আমরা কি করে’ ভাবব, কি করে’ ডাকব ?

বাবাজী। যে রকমে ভাবলে আপনি হৃদয়ে শান্তি পাবেন, আপনি তাঁকে সেই রকমই চিন্তা করবেন ; কিন্তু জানবেন, তিনি রূপ রস গন্ধাদির অতীত। যে নামে আপনার রসনা তৃপ্ত হবে, আপনি তাঁকে সেই নামেই ডাকবেন ; কিন্তু জানবেন, তিনি অনির্ব্বচনীয়।

আমি। এ রকম ধ্যানে, এ রকম আহ্বানে তিনি কি তৃপ্তি-লাভ করবেন ?

বাবাজী। তিনি নির্ব্বিকার।—তাঁর তৃপ্তি বা অতৃপ্তি কিছুই নেই। কিন্তু আপনি তৃপ্তিলাভ করবেন। ফুলের আঘ্রাণ নিলে ফুলের আনন্দ হয় না, যে আঘ্রাণ নেয়, সেই আনন্দ উপভোগ করে। ভগবৎ-চিন্তায় ও ভগবৎ-প্রসঙ্গে আপনার মনে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হবে, তাতে আপনার সরস হৃদয়ে ভক্তি অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে। ভক্তি চরম সীমায় উঠলে, আপনি তাঁর উপলব্ধি লাভ লাভ করবেন।

আমি। যিনি অনির্ব্বচনীয়, কেউ কি তাঁর উপলব্ধি লাভ করতে পারে ?

বাবাজী। আমি আগে একটা দৃষ্টান্ত দেব, পরে আপনার

প্রশ্নের উত্তর দেব। মনে করুন, আপনি কখনও গোলাপ ফুল দেখেন নি। এক অন্ধকার ঘরে, আপনার কোন বন্ধু আপনার জন্যে কতকগুলি গোলাপ এনে রেখেছেন। আপনি সেই অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করলেন। সৌরভে আপনার হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ফুলগুলি সেখান থেকে সরিয়ে, নিয়ে আপনার বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কিছু অনুভব করেছিলেন কি? আপনি বল্লেন যে হ্যাঁ, একটা চমৎকার গন্ধ অনুভব করেছিলাম। বন্ধু অবার জিজ্ঞাসা করলেন, সে গন্ধ কি রকম? তা কি মল্লিকাফুলের সুবাসের মত? তাহা কি শিউলি ফুলের গন্ধের মত? তা কি চাঁপাফুলের মত? বন্ধুর প্রশ্নের আপনি কোন উত্তরই দিতে পারলেন না। মানব ভাষায় কোনও হৃদয়ানুভূতিরই বর্ণনা হয় না। আপনি বল্লেন, সে সৌরভ অনির্ব্বচনীয়! কিন্তু আপনি অনির্ব্বচনীয়ের উপলব্ধি লাভ করেছেন, এবং তা লাভ করে হৃদয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন। এখন বুঝলেন যে, রূপবিবর্জ্জিত অনীর্ব্বচনীয়কে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

আমি। বুঝলাম। কিন্তু সেই অনির্ব্বচনীয়কে হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের কি লাভ?

..বাবাজী। কি লাভ, তা হৃদয়ঙ্গম না করলে, বুঝতে পারবেন না। যিনি কখনও মধুপান করেন নি, তাঁকে কি করে' বোঝাব মধু কত মধুর। যিনি কখনও সমুদ্র দেখেন নি, তাঁহাকে কি করে' বুঝাব বারিনিধি কি বিশাল! যে জন্মান্ধ, তাকে কি করে' বোঝাব নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের কি অপূর্ব্ব শোভা। যে কখনও

সেই অনির্ব্বচনীয়কে হৃদয়ঙ্গম না করেছে, সে কখনও বুঝবে না যে তন্ময় হওয়ায় আমাদের কি লাভ?

আমি। যাতে আমাদের কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁকে আমরা কিরে' ক নির্গুণ বলব?

বাবাজী। নির্গুণ কথাটায় কি বোঝায়, আমি বোধ হয় আপনাকে তা ঠিক বোঝাতে পারি নি।

আমি। নির্গুণ অর্থে আমি গুণহীন বুঝেছিলাম।

বাবাজী। আমরা ঐ রকম 'নির্গুণ'। কিন্তু ভগবানের নির্গুণতার অর্থ অন্য রকম। মানুষের কতকগুলি গুণ আছে,—মানুষ দয়ালু, মানুষ সত্যপ্রিয়, মানুষ স্নেহশীল। মানুষের কতকগুলি দোষও আছে, মানুষ ক্রূর, মিথ্যাবাদী, অহঙ্কারী। যারা গুণশালী, আমরা তাদের ধার্ম্মিক বলি; যারা দোষী আমরা তাদের অধার্ম্মিক বলি। ভগবান ধার্ম্মিকও নন অধার্ম্মিকও নন। তিনি ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে। তাঁর স্নেহ, দয়া, অহঙ্কার কিছুই নেই; তিনি এই সকল গুণ বা অগুণের অতীত। সাধারণতঃ মানুষ আপন অবস্থা থেকে ভগবান সম্বন্ধে ধারণা করে' থাকে। মানুষ মনে করে, ভগবান মানুষেরই মত। মানুষের মত তাঁর স্নেহ—তিনি তাঁর ভক্তগণকে স্নেহ করেন; তাঁর দয়া আছে—তিনি সামান্য জীবের জন্যেও আহার সংগ্রহ করে রেখেছেন; তাঁহার ক্রোধ আছে—পাপীগণের প্রতি তিনি খড়্গহস্ত; তাঁহার খুব বল আছে, বড় বড় ভারি ভারি গ্রহতারাগণকে অক্লেশে ঘোরাচ্ছেন। আমরা ভাবি, ভগবান আমাদেরই মত গুণে

অলঙ্কৃত—কেবল ঐ সকল গুণ তাঁতে অত্যন্ত প্রবলভাবে বর্ত্তমান আছে। তাঁর এত বল যে, নখাগ্রে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করতে পারেন। তাঁর এত রাগ যে, পৃথিবীর সমস্ত লোককে ডুবিয়ে মারতে পারেন। তাঁর এত বুদ্ধি যে, পাছে আমাদের বদহজম হয়, এজন্য আমাদের পাকস্থলীর মধ্যে পিত্তকোষ পূরে রেখেছেন। এ বিশ্বসংসারের এই সকল আশ্চর্য্য ক্রীড়া দেখে কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থির করেছেন যে, বিশ্বস্রষ্টা ভগবান, ম্যাকেব রদার্হাম প্রভৃতি ঘড়িওয়ালাদের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী বুদ্ধিমান। না কার্ত্তিক বাবু, ভগবান ঘড়িওয়ালাদের মত বুদ্ধিমানও নন, বিশ্বস্রষ্টাও নন। তিনি বুদ্ধি ও সৃষ্টির অতীত। তিনি যে কি, তার পরিচয় দেওয়া চিরকাল মানুষের অসাধ্য থাকবে। তাঁর উপলব্ধি লাভ করে যিনি তন্ময় হয়েছেন, তাঁর বাক্য ফুরিয়ে গেছে। তাঁর কাছ থেকে আর আমরা কোন উপদেশই লাভ করতে পারব না।

আমি। ভগবান যদি বিশ্বস্রষ্টা না হন, তা হলে এ বিশ্ব কার রচনা? এত বড় একটা রচনার একজন রচয়িতা অবশ্যই আছেন। প্রত্যেক কর্ম্মেরই একজন কর্ম্মকর্ত্তা থাকতে হবে।

বাবাজী। তার কোন কারণ নেই। প্রকৃতি আপনিই, সূর্য্য বায়ু বরুণ প্রভৃতি যোগ্য ও কার্য্যকুশল ভৃত্যগণকে নিয়ে, তাঁর আপনার কার্য্য সম্পন্ন করতে পারেন। তাঁকে চালনা করবার জন্যে কোন কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যকতা নাই। আমাদের দেশে একটি বড় চমৎকার রূপক প্রচলিত আছে। ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত শয্যায় মহাবিষ্ণু চিরশয়ান আছেন, আর মহালক্ষ্মী তাঁর পদসেবা

করছেন। এ রূপকের দ্বারা আপনি কি বুঝবেন? বুঝবেন যে সেই মধুর, অনন্ত, অজ্ঞেয়—চিরকাল নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প রয়েছেন; ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতি আপনার কায আপনি করছেন।

আমি। এই ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতিকে কে রচনা করলে?

বাবাজী। আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।

আমি। কেন?

বাবাজী। এ বাঙ্গলা দেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতদের প্রশ্নের মত;—বীজ আগে হয়েছিল, না গাছ আগে হয়েছিল? তাঁরা শাস্ত্র-শাস্ত্র উলট পালট করেও এ প্রশ্নের সমাধান করতে পারেন নি। আপনার প্রশ্ন অনেকটা সেই রকম।

আমি। কেন? আমার প্রশ্ন ত অতি সহজ।

বাবাজী। ওটা সীমাহীন প্রশ্ন।

আমি। কি রকম? আমি বলছি, যখন কর্ত্তা ব্যতীত কোন কর্ম্ম হয় না, তখন এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা খুঁজে নিতে হবে। সেই স্রষ্টাই ভগবান।

বাবাজী। আমি আপনাকে প্রশ্ন করব, আপনার সেই সৃষ্টি-কুশল ভগবানটিকে কে সৃষ্টি করলে? আপনিই ত বলেছিলেন যে সকল জিনিষেরই এক একটি স্রষ্টা থাকা আবশ্যক। আপনি বলবেন, স্রষ্টা-ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তা আরও একজন বড় ভগবান আছেন। আমি আবার প্রশ্ন করব সেই বড়-ভগবানের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এই রকমে প্রশ্ন সীমাহীন হয়ে পড়বে। তার চেয়ে ভগবানকে সৃষ্টিতত্ত্বের বাইরে রেখে দিন।

পূর্ব্বে বাবাজীর মিথ্যাবিজ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়া, আমি একবার অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ; আজ আবার সেই অন্যায়ের পুনরভিনয় করিতেছি। বাবাজীর সহিত আমার যে ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা হইতেছিল, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ভাল কায করিলাম না। ইহা কাহারও ভাল লাগিবে না। গল্প পড়িতে বসিয়া, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ কি কাহারও ভাল লাগে ? আমার ন্যায় প্রেমিকের এবং অপরাজিতার ন্যায় প্রেমিকার শ্রুতিসুখকর প্রেমালাপ শ্রবণ করিতে আসিয়া, কে সন্ন্যাসীর অনির্ব্বচনীয়ের কথা শুনিবে ? যুবক যুবতীর কটাক্ষময় নেত্রাভিনয় দেখিতে আসিয়া, কে ঊর্দ্ধনেত্র সন্ন্যাসীর স্তিমিত লোচন অবলোকন করিবে ? অতএব আমি আর অগ্রসর না হইয়া, এই খানেই এ নীরস পরিচ্ছেদের উপসংহার করি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রথম চুম্বন।

পরদিন ক্ষণকালের জন্য অপরাজিতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহারা মায়াদেবীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিল। দেবীর সিন্দূরের ফোঁটা ললাটে ধারণ করিয়া প্রত্যাগমন-পথে সে আমাকে প্রণাম করিতে আসিল।

তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আমি তাহার ললাটস্থ সিন্দুর বিন্দুর দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিরা কহিলাম—"তোমার বাবার কাছে শুনেছিলাম যে তুমি কুমারী।"

অপরাজিতা একটু হাসিল। ইহা পূর্ব্বদিনের সেই প্রাণহীন হাসি নহে। যে ভালবাসিয়াছে, সেই এমন হাসি হাসিতে পারে। সে হাসিতে তাহার মুখমণ্ডল এবং আমার সেই বৃক্ষতল যেন হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে যেন সমস্ত জগৎ ভরিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল—"বাবা সত্যি কথা বলেন নি।"

আমি বলিলাম—"আমি সন্ন্যাসী, আমাকে মিথ্যা বলবার কারণ কি?"

অপরাজিতা। সত্যি কথা না বলবার একটু কারণ আছে।

আমি। কি কারণ?

অপরাজিতা। ছেলেবেলা থেকে আমাকে স্বামিসুখে বঞ্চিতা দেখে, বাবার ইচ্ছা হয়েছে যে আমার আবার বিয়ে দেবেন।

আমি। বিবাহিতার বিবাহ কি রকম করে সম্ভব হবে?

অপরাজিতা। এই সুদূর পশ্চিমে, বাঙ্গালীর পক্ষে এ অতি সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। আপনি যদি আমাদের স্বঘর হতেন, আর, বিবাহে যদি আমার একান্ত অমত না থাকত, তা হলে শুভ-কর্ম্মটা আপনার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। এ কথা বাবা একদিন স্পষ্টই বলেছিলেন।

আমি একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—"ভগবান যদি আমাকে তোমাদের উপযুক্ত কুলীন করতেন, আর তুমি যদি বাধা না দিতে, তা হলে আমি তোমাকে বিবাহ করে নিষ্পাপে সুখকর সংসারধর্ম্ম আরম্ভ করে দিতাম। কিন্তু—

অপরাজিতা। এ আবার 'কিন্তু' কি?

আমি। দৈবক্রমে তোমার পূর্ব্ব স্বামী উপস্থিত হলে, তাতে একটা বিঘ্ন ঘটবার আশঙ্কা থাকত।

অপরাজিতা। সে বিষয়ে চিন্তা নহে। প্রথমতঃ এতকাল পরে তাঁর আসবার কোনও সম্ভাবনা নেই। তারপর তিনি দৈবক্রমে এলেও, এতকাল পরে তিনি আমাকে চিন্‌তে পারবেন না। আর বাবা বলবেন যে তাঁর সেই মেয়ে মারা গিয়েছে; আমি তাঁর অন্য মেয়ে। এই জন্যে বাবা আমার নূতন নাম রেখেছেন অপরাজিতা। কিন্তু আমি আর বিয়ে করব না। আমার অদৃষ্টে যদি বিধাতা স্বামিসাহচার্য্য না লিখে থাকেন, তা হলে হয়ত আমার নূতন স্বামীও আমাকে গ্রহণ করবেন না।

আমি। না না সে ভয় নাই। আমাকে তুমি বিয়ে করলে আমি তোমাকে ত্যাগ করব না।

অপরাজিতা। আপনার সঙ্গে বিয়েতে আমি অমত না করলেও, বাবা খাসবাড়ীর মুখুয্যে, তিনি কোন মতে কুল-গৌরবহীনের সঙ্গে আপন মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

হায়, কি কুক্ষণেই আমি রায় উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলাম! কেন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল?

কিয়ৎকালীন নীরব থাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "তোমার নাম অপরাজিতা নয়; তোমার আসল নাম কি?"

অপরাজিতা। তা কাকেও বলব না। বাবার নিষেধ আছে। থাক্, তাহা শুনে আপনার কোনও লাভ হবে না। না, অপরাজিতার বদলে আমার অন্য নাম প্রচারিত থাকলে, বোধ হয় আপনার প্রণয়বেগ কিছুই কম পড়ত না। আপনি কি নামটাকে চান, না মানুষটাকে চান?

আমি। মানুষটাকে পাইবার কোন উপায় দেখছি নে। তুমিও বিয়ে করবে না, তোমার বাবাও বিয়ে দেবেন না, কি করে' তোমাকে লাভ করব? তোমাকে লাভ না করে কি করে' জীবন ধারণ করব?

অপরাজিতা। এখন আমাকে লাভ করতে হলে, আপনাকে অধঃপাতে যেতে হবে। আর, পাছে আমাকে না পেলে আপনার জীবন ধারণ অসম্ভব হয়, এই ভয়ে আমাকেও আপনার সঙ্গে অধঃপাতে যেতে হবে। কেমন? ব্রহ্মহত্যার ভয়ে, আপনার

যোগধর্ম্মের মত, আমারও কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হবে। সে মন্দ হবে না;—দুজনে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী হয়ে সংসারধর্ম্ম পালন করব।

আমি। না, তা কখনও হবে না। আমার এ পাপপঙ্কে কখনও তোমাকে লিপ্ত করব না। তুমি চিরকাল আমার কাছে পুণ্যময়ী দেবীই থাকবে। আমি দূর থেকে তোমায় পূজা করব।

অপরাজিতা। তা কি কখনও হয়? আপনি আপনার জীবন যৌবন রূপ নিয়ে আমাকে প্রাণপণে ভালবাসবেন; আর আমি আমার অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণাতুর স্ত্রী-হৃদয় নিয়ে দূরে অবিচলিত চিত্তে বসে থাকব! মাটীর কি পাথরের পুতুলও ভক্তের ভক্তির আবেগে সজীব দেবতা হয়ে উঠে। আমি মানুষ, আমার একটা রক্তমাংসের শরীর আছে; শরীরের আধারে একটা স্বামি-প্রেম-বিরহিতার নারীহৃদয় আছে; হৃদয়ের মধ্যে প্রণয়ের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে;—আপনার ভালবাসার উদ্দাম আবেগে দিনরাত আমি কি করে' আমার মনকে স্থির রাখব? তার চেয়ে, আপনি আপনার এই অযথা প্রেমবেগ সংবরণ করে' যোগধর্ম্মে মন দিন। আর আমি আমার পলাতক স্বামীর উদ্দেশে, ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

আমি। তোমার স্বামীকে তুমি কখন দেখেছ?

অপরাজিতা। বিয়ের সময় দেখেছিলাম। আর একবার তিনি রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, চকিতের মত তাঁকে দেখে নিয়েছিলাম।

আমি। তাঁকে কি তুমি মনে মনে ভালবাস?

অপরাজিতা। স্বামীকে কে না ভালবাসে? স্বামীই আমাদের গতি।

অপরাজিতার এ কথা শুনিয়া, আমার বাকরোধ হইয়া গেল। মনের মধ্যে একটা ধিক্কার ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, এই স্বামিভক্তিপরায়ণা পুণ্যময়ীকে কিরূপে পুণ্যের উচ্চ সিংহাসন হইতে নামাইয়া, একটা অধর্ম্ম বিবাহের নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিব? না, পরের পরিণীতা, পতিগতপ্রাণা রমণীকে আমি কোনক্রমে বিবাহ করিতে পারিব না। এ মনকে শাসন করিতে হইবে। এ অযথা প্রণয়বেগ দমিত করিতে হইবে। প্রাণপণ সংযমে অপরাজিতাকে ভুলিতে হইবে। প্রকাশ্যে বলিলাম—"অপরাজিতা, দেবি! তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তোমার মত পতিব্রতার পক্ষে আমার সংসর্গ বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে বেশীক্ষণ বসে থাকলে লোকে তোমার কুৎসা করবে।"

আমার এই মত পরিবর্ত্তন দেখিয়া, অপরাজিতা মনে মনে কি ভাবিল; তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—"লোকের কুৎসায় যদি ভয় পেতাম, তা হলে নিত্য এই নির্জ্জনে একা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতাম না। আপনার সঙ্গে আমার এই নির্জ্জন সাক্ষাতের কথা এখন বোধ হয় হরিদ্বারেরর কারও অবিদিত নেই।"

আমি। মিছামিছি দুর্ণাম।

অপরাজিতা। আমি ত বলেছি যে আমার দুর্ণামে ভয় নেই।

আপনার পক্ষে দুর্ণামটা ত মিছামিছি নয়। আপনি সত্যই ত আপনার হৃদয়ে একটা কুলবালার প্রতি অনধিকার প্রেম পোষণ করে রেখেছেন।

আমি। কেন আসতে ?

অপরাজিতা। আপনি ভালবাসতেন কেন ?

আমি। আমি ভালবাসতাম বটে, কিন্তু আগে সে ভালবাসার কথা ত তোমাকে বলি নি।

অপরাজিতা। না বল্লেও আমার তা অবিদিত ছিল না।

আমি। কি করে' ?

অপরাজিতা। ভালবাসাটা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী। এতটা বয়স হল, আজও তা লাভ করতে পারি নি। স্বামীর কাছ থেকে তা লাভ করতে পারি নি ; ঐ দুষ্প্রাপ্য জিনিষটি কেবল আপনিই দিয়েছেন। বাবাজীর আশ্রমে যেদিন আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম, সেই দিনই বুঝেছিলাম যে সেই প্রথম দর্শনেই আপনি আমাকে ভালবেসেছেন।

আমি। দেখ, তোমার প্রতি আমার অন্যায় ভালবাসার জন্যে তুমি আমার উপর রাগ করো না। আমি এ ভালবাসা ভুলতে চেষ্টা করব।

অপরাজিতা। না না, যা দিয়েছেন তাহা আর ফিরে নেবেন না ;—আমি আপনার উপর রাগ করব না। মানুষকে কেউ ভালবাসলে মানুষ কি তার উপর রাগ করে ? ভালবাসা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে আদর ও আকাঙ্ক্ষার জিনিষ ! ভালবাসা

বাজারে কিন্‌তে পেলে, আমি আমার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রি করে' তা কিনতাম। আপনি সেই ভালবাসা আমাকে অকাতর দিয়েছেন; আমি আপনার উপর রাগ করব কেন?

অপরাজিতা চলিয়া গেলে, তাহার শেষ কথাগুলি আমার কর্ণে মধুসিঞ্চন করিতে লাগিল। বুঝিলাম, আমার আত্মসংযমের চেষ্টা বৃথা। যে অগাধ প্রেমসমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলাম, তাহাতে ডুবিতে হইবে।

গঙ্গাতীরে আমি যেস্থানে উপবেশন করিতাম, তাহা একটা ভগ্ন দেবালয়ের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত থাকায় লোকলোচনের সম্পূর্ণ অন্তরালে ছিল। নিকটবর্ত্তী রাস্তার লোকে সে নিভৃত স্থানের কোন সন্ধানই পাইত না। সে স্থানের নিকটে যে গঙ্গার ঘাট ছিল, তাহাতে অতি কম লোকই স্নান করিতে আসিত; যাহারা আসিত তাহারা ইচ্ছা করিলে ঐ স্থানের সামান্য অংশ মাত্র দেখিতে পাইত। অপরাজিতা রাস্তা হইতে একটা নিম্নভূমিতে নামিয়া উপরোক্ত ভগ্ন দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া আমাকে প্রণাম করিতে আসিত।

পরদিন সে গঙ্গাস্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া, ভিজা কাপড়খানি গামছায় বাঁধিয়া লইয়া আমার নিকট আসিল। আসিয়া, গাছের শাখায় ভিজা কাপড়ের ছোট পুটলিটি টাঙ্গাইয়া রাখিল। পরে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট শিলাখণ্ডে পা রাখিয়া, একটি বৃহত্তর প্রস্তরে উপবেশন করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজ তুমি শুক্‌নো কাপড় পরেছ কেন?"

সে বলিল—"পর্শু বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছিল, তাই মা বলেছিলেন ততক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকা ভাল হয় নি। আজ তাই শুকো কাপড়ে এসেছি।"

আমি। তুমি কি মনে করছ যে আজও তোমায় ফিরতে দেরী হবে?

অপরাজিতা। দেরী হওয়াই সম্ভব।

আমি। কেন?

অপরাজিতা। আপনি কাল পর্শু যেমন কথা কয়েছেন, আজও যদি অনুগ্রহ করে সেই রকম কথা কন, তা হলে আমার কাণটা আপনার কাছেই বেশীক্ষণ থাকতে চাইবে। আর কাণটার জন্যে মাথা আর মাথাটার জন্যে আমাকেও থাকতে হবে।

আমি। আমার পাপ কথায় তুমি কাণ দেবে কেন?

অপরাজিতা। আমার পাপী কাণে পাপের কথাই মিষ্ট লাগে।

আমি। তা হলে তুমি আমাকে ভালবাস?

অপরাজিতা কিয়ৎকাল নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর নতমুখেই বলিল—"বাসি।"

আমি। খুব?

অপরাজিতা। খুব।

আমি। তবে কাল কেন বলেছিলে, 'স্বামীকে কে না ভালবাসে?'

অপরাজিতা। স্বামীকেও বাসি, তোমাকেও বাসি।

আমি। তা কি হয়? একজনকে ভালবাসলে আর এক-জনকে ভালবাসা চলে না। আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসি না; আর কাউকে কখনও ভালবাসব না।

অপরাজিতা। আপনার স্ত্রী থাকলে তাকে নিশ্চয়ই ভাল-বাসতেন।

যেখানে অপরাজিতা বসিয়া ছিল, তাহার অত্যন্ত নিকটে আমি অন্য এক শিলাখণ্ডে বসিয়া ছিলাম। সমীপবর্ত্তিনীর সুন্দর করপল্লব আপন হস্তমধ্যে গ্রহণ করিয়া অবর্ণনীয় পুলকচিত্তে আমি বলিলাম—"আবার আমাকে আপনি বলছ কেন?"

অপরাজিতা বলিল—"তোমাকে ত বরাবরই আপনি বলি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এই যে তুমি বল্লে।"

অপরাজিতা আমার দিকে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, হাস্যরসে মধুর অধর ঈষৎ স্ফীত করিয়া বলিল—"তোমার যদি তাই ভাল লাগে, তা হলে আজ থেকে তোমাকে তুমিই বলব।"

শুনিয়া আমি গলিয়া গেলাম। করধৃত হাতখানি অধরপ্রান্তে তুলিয়া তাহা চুম্বন করিলাম। সে কোমল হস্তের নবনীতনিন্দিত কোমলতা অনুভব করিয়া পুলকভরে কাঁপিয়া উঠিলাম।

সে বলিল—"আজ তুমি আমার পাণিগ্রহণ করলে।"

আমি বলিলাম—"ঐ গঙ্গা সাক্ষী, আকাশে ঐ সূর্য্য সাক্ষী, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করলাম। বল তুমি আমাকে বিবহ করবে?"

সে। এই ত বিবাহ হয়ে গেল ;—আবার কেন ?

আমি। সংসারের লোক যেমন বিবাহ করে থাকে, আমি সেই রকম বিবাহ করে তোমাকে ধর্ম্মপত্নী করব। তুমি এতে অমত করো না।

সে। তোমার যা ইচ্ছে তুমি করো। আমার ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য সকলই তোমাকে আমি সমর্পণ করেছি। আমার সকলই তোমার।

আমি। তোমার বিবাহিত পতির জন্যে কি রেখেছ ?

সে। আজ আমার আর কেউ নাই—আজ তুমিই আমার সব। আজ তুমিই আমার পতি ; তুমিই আমার দেবতা,—দেবতার অধিক। এ জীবনে তোমার চরণপূজা ছাড়া, আমার আর অন্য কায থাকবে না।

এই বলিয়া, অপরাজিতা আমার পদধূলি গ্রহণ করিল।

আমি তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে উঠাইলাম ; এবং সস্নেহে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলাম—"আমার আজ জীবন সার্থক হল ; আজ তুমি আমাকে ধন্য করলে।"

অপরাজিতা কথা কহিল না। আমার সম্মুখে বসিয়া, আমার হাতে তাহার হাত দুইখানি রাখিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রেমপরিপ্লুত সে মুখের অপূর্ব্ব শোভা, প্রভাতরবিকর-চুম্বিত পদ্মের ন্যায় আমার নয়নাগ্রে ফুটিয়া রহিল। হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া আমি তাহা চুম্বন করিলাম। সে আমার গৈরিক উত্তরীয়াঞ্চলে মুখ লুকাইল। আমি সে চন্দ্রমুখ আদরে বক্ষে

চাপিয়া ধরিলাম। এইরূপে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া গেল। যাহার জন্য মাতাকে শোকে ও অভাবে ফেলিয়া পাষণ্ডের মত বিদেশে চলিয়া আসিয়াছিলাম, আজ সেই সন্ন্যাসধর্ম্ম এইরূপে অপরাজিতার নিকট পরাজিত হইল। হায় পুরুষের গর্ব্ব! কে জানে নারীর রক্তচরণতলে তাহা কতবার বিলুণ্ঠিত হইয়াছে।

অপরাজিতা আমার বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া, আমার দিকে চাহিলে আমি আদর করিয়া বলিলাম—"আজ তোমার জন্যে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম ব্যর্থ হল।"

অপরাজিতা বলিল—"আজ তোমার জন্যে আমার ব্যর্থ নারী-জীবন সার্থক হল। আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, তুমি স্বামিরূপে এসে আমাকে গ্রহণ করলে। আমার নারীজীবন এক নিরুদ্দিষ্টের উদ্দেশে ভেসে যাচ্ছিল, তুমি দয়া করে তা কূলে তুলে। প্রাণাধিক তুমি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো না।"—গোলাপদলরচিত মাল্যের ন্যায় কোমল ও কমনীয় বাহুদ্বয় দ্বারা আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, সে আবার বলিল—"বল, তুমি আমাকে কখন ত্যাগ করবে না।"

আমি। তোমাকে ত্যাগ করলে আমি বাঁচব না।

সে। বল, এমনই ভালবাসা নিয়ে তুমি আমাকে চিরকাল ভালবাসবে?

আমি। তুমি চিরকাল আমার কণ্ঠরত্ন থাকবে। আমার কেবল একটা ভয় হয়—পাছে তোমার পূর্ব্ব স্বামী এসে, একটা গোলমাল বাধিয়ে দেয়,—আমার এ কণ্ঠরত্ন কণ্ঠচ্যুত করে।

সে। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার স্বামী নেই। আমি ত বলেছি, তুমিই আমার সব।

আমি। পূর্ব্ব......?

সে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—তুমিই আমার সব।

আমি। তোমার পূর্ব্বপতি?

সে। ঈশান নৈর্ঋত বায়ু অগ্নি—তুমিই আমার সকল দিকের দিক্‌পতি। শিবপূজোর মত আমি তোমার পূজো করে পূর্ব্বদিকে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ"; ঈশান-কোণে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ"; উত্তর-দিকে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ"; বায়ুকোণে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ"; পশ্চিমে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ"; নৈর্ঋত কোণে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ"; দক্ষিণে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ"; অগ্নি কোণে ফিরে বলব—"এতে গন্ধপুষ্পে ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ।"

আমি। দেখছি, শিবপূজো তোমার বেশ জানা আছে।

সে। সকল হিন্দুর মেয়েই শিবপূজো জানে। আমি আগে শিবপূজো করতাম না। শিবের রাগ হল;—আমার স্বামীটি পালিয়ে গেলেন। মা বল্লেন—স্বামীকে যদি পেতে চাস, শিবপূজো কর। সেই অবধি আমি রোজ শিবপূজো করেছি। তার ফলে আজ তোমাকে স্বামিরূপে পেলাম—তুমি আদর করে' আমার পাণিগ্রহণ করলে।

আমি। এই শিবপূজোর জোরে যদি সে স্বামী আবার ফিরে আসে? তুমি আর শিবপূজো করো না।

সে। এখন আমি আমার শিবকে পেয়েছি; অন্য শিবপূজোর আর আবশ্যক হবে না।

এই সময় আমার আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেখছ?"

আমি বলিলাম—"তোমাকে দেখছি। এই সুন্দর মুখটি কি চমৎকার! এত রূপ তুমি কোথায় পেলে? আর তোমার এই ঠোঁট দুটি—ওতে যেন ভগবান পৃথিবীর সমস্ত মধু সঞ্চয় করে রেখেছেন; তোমার গাল দুটিতে, যেন জগতের যাবতীয় পুষ্পের লাবণ্য নিয়ে এসে স্থাপন করেছেন।"

আমি সেই অধরে সেই গণ্ডে চুম্বন করিয়া আবার বলিলাম—"পৃথিবীতে এই আমার স্বর্গ।"

আমার কথা শুনিয়া সে তাহার মুখখানি এক অপূর্ব্ব রঙে রঞ্জিত করিয়া, বিলোল অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে আমার দিকে চাহিল। তাহার পর, ধীরে ধীরে আমার তপঃশুষ্ক অধরের উপর তাহার সরস রক্তাধর স্থাপিত করিয়া আমার নিশ্বাস-বায়ুর আঘ্রাণ গ্রহণ করিল। আমার মনে হইল, নিশ্বাসের সহিত আমার সমস্ত প্রাণ বাহির হইয়া পড়িল।

ইহার পর আমি উন্মত্তের ন্যায় কি প্রলাপ কথা কহিয়াছিলাম তাহা আর আমার মনে নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমার ভাবনা।

অপরাজিতা চলিয়া গেলে, আমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া, আমার আজীবনের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিলাম, আমার বাল্যকালের যোগধর্ম্মের কথা। যোগবল লাভ করিবার প্রলোভনে গৃহত্যাগের কথা। আমি কি যোগবল লাভ করিতে পারিয়াছি? না পারিলে কোন দৈব বলে, আমার এই অধম রূপ লইয়া, আমি অপরাজিতাকে লাভ করিতে পারিলাম? তাহার হৃদয়-মথিত সমস্ত ভালবাসার একমাত্র অধিকারী হইলাম? মাতাকে একাকিনী গৃহে ফেলিয়া আসাটা আমার ভাল হয় নাই। কিন্তু গৃহত্যাগ না করিলে, আমার ত অপরাজিতা-লাভ ঘটিত না। ভগবান আমাকে গৃহত্যাগী করিয়া ভালই করিয়াছেন। বাবাজী তর্কের অনুরোধে যাহাই বলুন, আমি বেশ বুঝিয়াছি, ভগবান অসীম দয়াময়। তাহার দয়ায় এক্ষণে অপরাজিতাকে লইয়া, আবার গৃহে ফিরিব। মা,—মাকে আমি খুব জানি—তিনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন; অপরাজিতাকে বধূরূপে বরণ করিয়া ক্রোড়ে লইবেন। তিনি আমাকে বলবান ও কৃতবিদ্য দেখিয়া কত আনন্দিত হইবেন! আমি অর্থোপার্জ্জন করিয়া, মাতাকে ও অপরাজিতাকে প্রতিপালন করিব।

কিন্তু কথাটা এই হইতেছে যে, আমি যোগী হইতে পারিলাম না। তাহাতে ক্ষতি কি? বাবাজী বলিয়াছেন, সংসার ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার সংসার ধর্ম্মে অপরাজিতা সহধর্ম্মিণী হইবে; তাহার রূপজ্যোতিঃ লইয়া, আমার ধর্ম্মপথ আলোকিত করিয়া রাখিবে। কে বলিতে পারে তাহার সহায়তায় হয়ত আমি যোগবলও লাভ করিতে পারিব।—বাবাজী বলিয়াছেন, ভবানীপতি হইলেও মহাদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। আমার অপরাজিতা, দেবী ভবানীর মত আমাকে যোগিশ্রেষ্ঠ করিবে।

এই সুখচিন্তার মাঝে, হঠাৎ একটা আশঙ্কার কথা আমার মনে উদিত হইল। সেই কালীঘাটের আমার সেই পঞ্চমবর্ষীয়া পত্নীকে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। সে কি এখনও জীবিতা আছে? এই দীর্ঘ পতিবিরহে হিন্দুনারীর কি জীবিত থাকা উচিত? সেই পতিবিরহিতা পামরী যদি কোন ক্রমে জীবিতা থাকে, তাহা হইলে,৺কালীঘাটের খড়্গধারিণী জগন্মাতা কি তাহার রক্ষা রাখিবেন?—তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ খড়্গ কি বৃথায় ধারণ করিয়াছেন? জয় মা কালী! তোমার অমোঘ খড়্গ লইয়া, আমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিও।

কিন্তু কালীমাতার নিকট বরপ্রার্থনা করিয়াও আমার অন্তরের আশঙ্কা প্রশমিত হইল না। কেবল মনে হইতে লাগিল, আমার সেই পঞ্চমবর্ষীয়া সর্ব্বনাশী আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আমি তাহাকে অপরিচিতার ন্যায় বিদায় করিয়া দিলেও, সে নির্লজ্জা আমাকে ছাড়িবে না। কি হইবে? আমার সুখ-পথের এই কণ্টককে আমি কিরূপে অপসারিত করিব?

আমার মাথায় অকস্মাৎ একটা দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল। আচ্ছা, আমি যদি একবারে অস্বীকার করি,—বলি যে সেই পামরীর সহিত কোন জন্মে আমার পরিণয় ঘটে নাই, তাহা হইলে, সে কিরূপে প্রমাণ করিবে যে আমি তাহার পতি? সেই বিবাহের প্রধান সাক্ষী সেই দিদিমা বুড়ী, এক্ষণে ভগবানের কৃপায়, যমালয়ে বাস করিতেছে; যমালয়ে যাইয়া, কোনও লোক কখনও প্রত্যাগমন করে না; অতএব আমার বিপক্ষে সে সাক্ষ্য দিতে আসিতে পারিবে না। দ্বিতীয় সাক্ষী, সেই পুরোহিত; তখনই সে মরণাপন্ন বৃদ্ধ ছিল; এখন সে নিশ্চয় মরিয়াছে। আমার শ্বশুর আমাকে দেখেন নাই,—যেদিন তিনি আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, সেদিন আমি আপনাকে লুক্কাইত রাখিয়াছিলাম; তাহা ছাড়া, বিবাহের সময়ও, ছুটী না পাওয়ায় তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কাযেই তিনি আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আর এক সাক্ষী ছিলেন, আমার বাবা; কিন্তু তিনি ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর এক সাক্ষী সেই সর্ব্বনাশীর মা; তিনি আমাকে চিনিতেই পারিবেন না;—কোথায় সেই দ্বাদশবর্ষীয় অজাতশ্মশ্রু বঙ্গীয় বালক, আর কোথায় এই চোগোম্ফা-ওয়ালা ভোজপুরী পালোয়ান। তোমরা বলিবে যে আমার মা আমাকে চিনিবেন, এবং আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। আমি বলিতেছি, তোমরা মাতৃজাতিকে এখনও চিনিতে পার নাই;—বহুবৎসর পরে, হারাণো রত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, কোনও মাতা কখনও তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতে

পারেন না। অতএব আমি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিব যে, পামরী মেনকার সহিত আমার কথনও বিবাহ হয় নাই।

মেনকার সহিত বিবাহ অসিদ্ধ হইল বটে, তথাপি আমার হৃদয়াভ্যন্তরের অতি গুহ্যতম প্রদেশে একটু 'খট্‌কা' রহিয়া গেল। যদি দুষ্ট পাড়াপড়শীরা সাক্ষ্য দিতে আসে? যদি সেই ঢাকীরা আদালতে যাইয়া ঢাক বাজাইয়া দেয়! অতএব আমি স্থির করিলাম, অপরাজিতাকে লইয়া সহসা স্বদেশে যাওয়া হইবে না। আমার জানা ছিল যে এসব ব্যাপারে ৺কাশীধাম অতি উদার ও পরম পবিত্র স্থান; এজন্য আমি ঠিক করিলাম, কাশীতেই বাস করিব। মাতা ঠাকুরাণীকেও সেই স্থানেই লইয়া আসিব;—এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কাশীবাসই ভাল।

মানুষ যখন ভাবনা সাগরে ঝাঁপ দেয়, তখন সে সহজে কূলে উঠিতে পারে না। মেনকা সম্বন্ধে আপনাকে নিরাপদ ভাবিতে না ভাবিতে, আমার মনোমধ্যে নূতন আশঙ্কার উদয় হইল। আমার আশঙ্কা হইল, অপরাজিতাকে লইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করা ত দূরের কথা, তাহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করাই আমার পক্ষে কঠিন হইবে। আমার মত কুলগৌরবহীন (তোমরা জান, এ'টা কতদূর মিথ্যা) রায় বামুনের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে, অপরাজিতার পিতা কখনই স্বীকৃত হইবেন না। স্বামী বর্ত্তমানে কন্যার দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু কুলগৌরবহীন পাত্রে তাহাকে পাত্রস্থ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। অপরাজিতা আমাকে স্পষ্টই এ কথা

বলিয়া গিয়াছে ; আর পূর্ব্বে তিনি নিজেও এ কথা বলিয়াছেন। অতএব শ্রীযুক্ত অনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যাইয়া, আমি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিলে, তিনি নিশ্চয় আমার সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন।

তবে কি তাহার সহিত আমার বিবাহ হইবে না? তবে কি আমার সংসারধর্ম্মের সুখস্বপ্ন অকালে ভাঙ্গিয়া যাইবে?

অসম্ভব! আমি অপরাজিতাকে বিবাহ করিবই। অপরাজিতার যখন মত আছে, তখন কে আমাকে বাধা দিবে? পিতা? হায় হায়! আমি কি ইংরাজি উপন্যাস পাঠ করি নাই?- দেখি নাই যে, প্রেমের প্রবল স্রোতে কত ডজন ডজন পিতা ভাসিয়া গিয়াছে? পিতার মত না থাকিলে, অপরাজিতার সহিত পরামর্শ করিয়া, এ কার্য্য পিতার অগোচরেই সম্পন্ন করিতে হইবে। একদিন ভগবৎ-কৃপায়, তাহাকে লইয়া কাশীতে পলায়ন করিবই। তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসীই আমাদের গোপনে বিবাহের উপযুক্ত স্থান।

কিন্তু সে যদি পিতামাতার মমতা ত্যাগ করিতে না পারে? বাল্যকাল হইতে তাঁহাদের সহিত একত্র বাস করিয়া, আজ হঠাৎ এক অপরিচিতের সহিত, এক অপরিচিত দেশে যাইতে না চায়? আগামী কল্য তাহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সে কি আমার এই প্রেমের মহা আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে পারিবে? না; সে নিশ্চয়ই আমার সহিত পলায়ন করিবে। ভগবানের এই প্রেমের রাজ্যে এরূপ পলায়ন নিত্য ঘটিতেছে—নিত্য ঘটিবে।

কিন্তু—আর একটা মস্ত 'কিন্তু' আছে। অর্থ? অপরাজিতাকে

লইয়া পলাইতে হইলে, অর্থের আবশ্যক। স্বার্থপর রেল কোম্পানি অর্থ না পাইলে আমাদিগকে তাহাদের গাড়ীতে চড়িতে দিবে না। গাড়োয়ান প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিবে না, গাড়ীভাড়া চাহিবে; মুটে পয়সা না পাইলে গালি দিবে। সেই কুসুমকোমলা, স্নেহলালিতা ললিতাকে লইয়া, পদব্রজে হরিদ্বার হইতে কাশী যাওয়া অসম্ভব। সম্ভব হইলেও তাহাতেও অর্থের আবশ্যক ;—রাস্তায় তাহাকে খাইতে দিতে হইবে, নিজেও আহার ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারিব না। তাহার পর, রাত্রিবাসের জন্য কুটীর ভাড়া লইতে হইলে, তাহাতেও অর্থব্যয় আছে। কাশীতে যাইয়াও বাড়ীভাড়া লইতে হইবে; নিত্য দুই প্রাণীর আহারের আয়োজন করিতে হইবে। আমি কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী, ইহার জন্য অর্থ কোথায় পাইব ? হায়, প্রেমময় !—চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায়, সুবাস, কুসুম মধ্যে কীটের ন্যায়, আমাদের প্রেমলীলার মধ্যে কেন 'তৈল-তণ্ডুল বস্ত্রে-ন্ধন চিন্তা' রাখিয়া দিলে ? দ্বাপরযুগের শেষ রাজা পরীক্ষিতের হস্তধৃত সুপক্ব ফল হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদ্রকায় তক্ষক যেমন বৃহদাকার ধারণ করিয়া অভিশপ্ত রাজাকে দংশন করিয়াছিল, আজ সুপক্ক অপরাজিতা-প্রেমের মধ্য হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদ্র অর্থচিন্তা, তেমনই বৃহদাকার ধারণ করিয়া, অর্থহীন আমাকে দংশন করিতে লাগিল। এ বিষম অর্থসমস্যা কিরূপে নিরাকৃত হইবে, কোন ক্রমে স্থির করিতে পারিলাম না।

ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, আচ্ছা কিছুদিনের জন্য কোন স্থানে যাইয়া, কোনও সরকারি আফিসে কোন কর্ম্ম গ্রহণ

করিয়া, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে কি হয়? এখন বাবাজীর কৃপায় আমার যে গুণপনা জন্মিয়াছে, তাহাতে অনায়াসে মাসিক শতাবধি মুদ্রা বেতন লাভ করিতে পারিব। এরূপ বেতন পাইলে, নিজের অশন বসনের জন্য যৎসামান্য ব্যয় করিয়া, এক বৎসরে প্রায় হাজার টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব। পরে ভদ্রবেশে হরিদ্বারে ফিরিয়া, অপরাজিতাকে লইয়া কাশী পলায়ন করিব। তথায় তাহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া, গৃহস্থালী স্থাপন করিব। এবং স্থানীয় কোনও দপ্তরে প্রবেশ করিয়া, পুনরায় অর্থোপার্জ্জনে মন দিব।

কিন্তু—ইহাতে একটা 'কিন্তু' আছে। আমাদের ভাবনা-সাগর 'কিন্তু'র তরঙ্গে সদাই সন্তাড়িত। অর্থ সংগ্রহ জন্য আমি যখন দীর্ঘকাল বিদেশে অবস্থান করিব, তখন আমার প্রণয়িনীর পিতা, আমার প্রণয়িনীর জন্য নূতন পতির অন্বেষণে যদি স্থানান্তরে প্রস্থান করেন,তাহা হইলে, আমার যত্নগঠিত আশাস্তম্ভ, বাবিলনের মন্দিরের ন্যায় মূহূর্ত্ত মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। না না, অর্থ সংগ্রহ জন্য আমার হরিদ্বার ত্যাগ করা হইবে না। অর্থহীন ও নিরুপায় হইয়া আমাকে হরিদ্বারে থাকিতেই হইবে। আমার অপরাজিতাকে চক্ষের অন্তরালে রাখা হইবে না। আমাদিগকে প্রেমপথে এতটা চালিত করিয়া, ভগবান কি আমাদিগের একটা উপায় করিয়া দিবেন না?

তোমরা কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে যে, ভগবান বহুপূর্ব্বেই আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া, তোমারা বুঝিবে যে বাবাজীর কথা ঠিক নহে;—তিনি দয়াময়, সত্যই দয়াময়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রণয় ও পল্‌তার বড়া।

পরদিন প্রত্যূষে অপরাজিতা আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলে, আমি তাহার বামহস্ত আপন হস্তমধ্যে গ্রহণ করিয়া, অনুরাগভরে তাহা নিপীড়িত করিলাম, এবং কহিলাম—"দেখ।"

সে আমার দিকে তাহার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কহিল—"কি ?"

আমি। দেখ, আগে তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাওনি। কালকে কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছ।

সে। কি করি ? তুমি যে ছাড়লে না।

আমি। এখন এই বিয়েটা কবে কি রকমে ঘটবে; তার একটা উপায় স্থির করতে হবে। ·

সে। কি রকমে ঘটবে ?

আমি। তোমার বাবার কাছে গিয়ে তোমাকে প্রার্থনা করলে, তিনি আমার সঙ্গে তেমার বিয়ে দেবেন না ?

সে। না। তুমি কুলীন হলে দিতেন ; তুমি কুলীন নও ব'লে দিবেন না।

আমি। কোন মতেই না ?

সে। কোন মতেই না।

আমি। তবে কি করে' আমাদের বিয়ে হবে ? ·

সে। এত তাড়াতাড়ি কেন? সে একদিন হবে। ভগবান তার একটা উপায় করে দেবেন। এখন সে জন্মে কোন ভাবনা নেই।

আমি। শোন। তোমার বাবার অগোচরে আমি লুকিয়ে তোমাকে বিয়ে করব।

সে। কোরো।

আমি। এই বিয়ের জন্মে, তুমি তোমার বাপ মাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে দূর দেশে যেতে পারবে ত?

সে। নিশ্চয় পারব। সে দিন তুমি আমার আহ্বানে নরক পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত ছিলে, আজ তোমার আহ্বানে আমি স্থানান্তরে যেতে পারব না? আমি কি এমনই অকৃতজ্ঞ?

আমি। তোমার কোনও কষ্ট হবে না?

সে। না। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, তাই আমার স্বর্গ।

অপরাজিতার কথা শুনিয়া, একটা বিষয়ে আমার মন স্থির হইল। আমি বুঝিলাম যে অন্যান্য প্রণয়িনীগণের ন্যায়, সেও প্রণয়ীর সহিত পলায়নে পরাঙ্মুখ হইবে না;—ইহাই সনাতন প্রথা। এক্ষণে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। তাহা কিরূপে সংগ্রহ করিব?

আমি আপন মনে ভাবিতে লাগিলাম। আমার অর্থাভাবের কথা আমি অপরাজিতাকে বলিব কি? ছি! সে কথা কি বলা যায়? প্রেমশাস্ত্রে কি প্রণয়িনীকে অর্থাভাবের কথা বলিবার ব্যবস্থা আছে? হায়! কে জানে কত প্রণয়িনীর প্রবল প্রেম-

মন্দাকিনী, ঐ নিষ্ঠুর কথায়, মরুভূমির দিকে প্রবাহিত জল প্রবাহের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? অতএব আমি ঐ নীরস কথা কহিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে কি রসপূর্ণ কথা সকলের অবতারণা করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, অপরাজিতা যখন জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবছ?" তখন আমি আমার করতলগত তাহার কোমল করপল্লব আমার অধরপ্রান্তে তুলিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বল দেখি, কি ভাবছি?"

সে বলিল—"তুমি যোগী; বোধ হয় যোগধর্ম্মের কথা ভাবছ। অঙ্গন্যাস, করন্যাস ব্যাপকন্যাসের কথা ভাবছ, মার্জ্জন, প্রণায়াম, অঘমর্ষণের কথা ভাবছ, ধেনুমুদ্রা, নারাচমুদ্রা, গালিনী মুদ্রার কথা ভাবছ।"

তাহার শ্রীমুখে এ সকল কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম অপরাজিতা কি যোগিনী? এই যোগিনীকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়া, হয়ত গৃহে থাকিয়াই আমার যোগধর্ম্ম সার্থক হইবে; আর যোগধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বনে বনে ঘুরিতে হইবে না। মুখে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি এ সকল কথা কোথায় শিখলে? তুমি কি যোগধর্ম্মের আলোচনা করেছিলে?"

সে তাহার মধুরাধর সুহাসে সজ্জিত করিয়া, লজ্জিত গণ্ড গোলাপরাগে রঞ্জিত করিয়া, লোল-নয়নে আমার মুখাবলোকন করিয়া কহিল—"কেন, আমাদের কি যোগধর্ম্ম করতে নেই?

মেয়েমানুষ কি যোগিনী হয় না? তুমি যোগী, তুমি আমাকে বিয়ে করলে, আমি তোমার যোগিনী হয়ে থাকব। কেমন?"

আমি বলিলাম—"তুমি দেবী; তোমাকে বিয়ে করলে, তুমি আমাকে দেবতা করে তুলবে। তোমার ভালবাসায় আমি দেবত্ব লাভ করব।"—এই বলিয়া আমি তাহার লজ্জাচিত্রিত গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলাম।

সে আমার বক্ষে তাহার মস্তক স্থাপিত করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিল—"আবার, আবার তুমি কালকের মত কথা কচ্চ! আমি তোমার সেবিকা; তুমি আমাকে আদর করো না; তোমার আদরের কথা শুনলে, আমি আত্মহারা হয়ে যাই। পৃথিবীর কোন কথা তখন আর আমার মনে থাকে না। তুমি যেন সংসারের একমাত্র সামগ্রী হয়ে পড়। দেখবার, শোনবার, পূজা করবার, বর নেবার একমাত্র দেবতা হয়ে পড়। তোমার আদরে, আমার ইচ্ছা যায় যেন জন্ম জন্মান্তর তোমাকে পতিরূপে পাই; যেন অনন্তকাল তোমার সেবিকা হয়ে থাকি। যেন তোমার এই চরণধূলিতে—"

বলিয়া, প্রণতা হইয়া, আমার পদধূলি তাহার মস্তকে গ্রহণ করিল।

প্রণয়াবেগে বিহ্বল হইয়া, আমি তাহাকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিলাম। তাহার বক্ষের স্পন্দনের সহিত আমার হৃদয়তন্ত্রী স্পন্দিত হইতে লাগিল। আর, দেখ দেখ, আমার সম্মুখের কঙ্কর-ময় ভূমি যেন পুষ্পাকীর্ণ হইয়া গেল। মস্তকোপরি সূর্য্যালোকিত

বৃক্ষপত্র সকল যেন সুবর্ণময় হইয়া উঠিল; বৃক্ষোপরি পক্ষী সকল যেন স্বর্গের বীণা বাজাইল।

তোমরা আমার এই প্রেমচক্ষে জগৎকে একবার দেখিও। দেখিবে, ঐ গঙ্গার জল, জল নহে,—অমৃতপ্রবাহ। দেখিবে, ঐ সূর্য্যোলোক কেবল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু উহাতে উত্তাপ নাই। দেখিবে, গঙ্গাতীরে সূর্য্যালোকে ঐ বালুকাকণা সকল, বিচিত্র মণি মাণিক্যের ন্যায়, উজ্জ্বল বিচিত্ররাগ বিকীর্ণ করিতেছে। দেখিবে, ঐ বালুকা কণা মাথায় লইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল, উজ্জ্বল ও মধুময় হাসি হাসিতেছে। দেখিবে, সে হাসিতে আকাশ হাসিয়া উঠিয়াছে।

কতক্ষণ পরে, অপরাজিতা বলিল—"বেলা হয়ে গেল; আজ যাই, কাল আবার আসব।"

আমি বলিলাম—"কে জানে কবে আমার এমন দিন আসবে, যে দিন বেলা হলেও তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে না; দিনরাত তোমাকে পাশে পাব।"

অপরাজিতা। তোমার ভয় নেই; সে শুভদিন শীঘ্র আসবে। তখন দিনরাত আমি আমার দেবতাকে ষোড়শোপচারে পূজা করব। ঐ দেখ, একটা কথা তোমাকে বলতে আমি একবারে ভুলে গিয়ে ছিলাম।

আমি। কি কথা।

অপরাজিতা। মা তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে বলেছিলেন। আজ তুমি আমাদের বাড়ীতে খেতে যেও।

আমি। দেখ, তোমার মা আমাকে প্রায় প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করেন কেন?

অপরাজিতা। আমি তোমাকে খাওয়াতে ভালবাসি যে।

আমি। এতে তোমার বাপ মার মনে কোন সন্দেহ হবে না ত?

অপরাজিতা। কেন হবে? তীর্থক্ষেত্রে এসে কে না সন্ন্যাসীদের ভোজন করায়? বিশেষতঃ তুমি বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আর আমরা বাঙ্গালী। তোমার কোন ভয় নেই; তুমি নিশ্চিন্ত মনে খেতে যেও।

আমি। যাব। আজ আমার জন্যে তোমরা কি রাঁধবে?

অপরাজিতা। তুমি যা খেতে ভালবাস।

আমি। আমি কি ভালবাসি?

অপরাজিতা। মুগের ডাল, পল্‌তার বড়া, আমসীর অম্বল, আর ......

আমি। পল্‌তা? পল্‌তা হরিদ্বারে কি করে' পেলে? পল্‌তার বড়া যে কতকাল খাইনি, বলতে পারি নে।

অপরাজিতা। বাবার এক বন্ধু পাটনা থেকে হরিদ্বারে তীর্থ করতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের জন্যে কতকগুলি পল্‌তা এনেছিলেন। আমরা তা শুকিয়ে রেখেছি। দরকার হলে, ভিজিয়ে বেঁটে নিই। আজ সেই রকম ভিজিয়ে, তোমার জন্যে বড়া তৈয়ারী করব।

আমি। তুমি কি করে' জানলে যে আমি পল্‌তার বড়া খেতে ভালবাসি?

অপরাজিতা দাড়াইয়া উঠিল এবং হাসিয়া বলিল—"আমি সতী; স্বামী কি খেতে ভালবাসেন, সতীরা তা মনে মনে জানতে পারে। চল্লাম,—এস।"—এই বলিয়া, গজেন্দ্রগামিনী ধীর পাদক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। সুখনিশার অন্তে যেন পূর্ণিমার চাঁদ নিবিয়া গেল।

স্নান সমাপনান্তে, সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া, আমি আশ্রমে ফিরিলাম। বাবাজী বলিলেন—"কার্ত্তিক বাবু, অনাথ বাবু এই মাত্র এসেছিলেন; তাঁদের বাড়ীতে আপনাকে খেতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কি বল্লেন?"

বাবাজী বলিলেন—"আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমাদিকে উপেক্ষা করে, কেবল কার্ত্তিকবাবুকেই নিমন্ত্রণ করেন কেন?' তিনি বল্লেন যে তাঁর কন্যা অপরাজিতা আমাদের চেয়ে আপনাকেই বেশী ভক্তি করে থাকেন, আপনাকে খাইয়েই তাঁর বেশী তৃপ্তি হয়; তাই তিনি আপনাকেই খেতে বলেন।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম,—তাহা হইলে, আমার প্রতি অপরাজিতার ভক্তির কথা, তাহার পিতা বেশ উত্তম রূপেই জানিতে পারিয়াছেন। এ জানাজানিটা এই খানেই শেষ না হইয়া, আর একটু অগ্রসর হইলেই মহা বিপদ,—আমার বিপদ, অপরাজিতারও বিপদ! আমাদের প্রেমাধিক্যের কথা প্রকাশ হইলে, আমি নিশ্চয় প্রহৃত হইব, এবং অপরাজিতা হয়ত লোক-লজ্জায় আত্মহত্যা করিবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যোগধর্ম্মের বিসর্জ্জন ও পলায়ন।

লোক-লজ্জার ভয়ে, অপরাজিতা আমার নিকট আসিতে বিরতা হয় নাই ; এবং আমিও প্রহার ভয়ে আমার প্রেমালাপ বন্ধ করি নাই। উহা সপ্তাহ কাল অবিরাম গতিতেই চলিল। আরও কতকাল চলিত, তাহা ভগবান জানেন, কিন্তু সহসা উহাতে একটা বাধা পড়িল। তখন অপরাজিতাকে লইয়া শীঘ্র পলায়ন ছাড়া আর উপায়ান্তর রহিল না।

সাত দিন পরে, এক অপরাহ্ণে অপরাজিতা বজ্রাঘাততুল্য এক অশুভ সংবাদ লইয়া আসিল। বলিল যে, পরদিন প্রত্যূষেই তাহাকে লইয়া তাহার পিতা হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া যাইবেন। শুনিয়া, আমি ললাটে করতল সংলগ্ন করিয়া বসিয়া পড়িলাম। অত্যন্ত কাতরতার সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন আমার দশা কি হবে ?"

সে বলিল—"তোমার ভালই হল। তুমি আমাকে নিয়ে, কাশী গিয়ে শীগ্‌গির বিবাহটা শেষ করবে। তুমি ত আগেও আমাকে নিয়ে পালাবার কথা বলেছিলে, তাতে আমি স্বীকৃতও হয়েছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু এত হঠাৎ যেতে হবে, আমি ত তখন তা ভাবি নি। আচ্ছা, তোমার বাবার হঠাৎ এ মতি-

পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আজ তোমাদের বাড়ীতে খাবার সময়ও তিনি আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি ;, বরং কাল আবার আমাকে খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। না, তিনি কাল সকালে কখনই হরিদ্বার ত্যাগ করে যেতে পারেন না। অসম্ভব! তুমি বোধ হয় ভুল শুনেছ।"

সে। না, আমি ভুল শুনি নি। যা ঘটেছে, তা তোমাকে বলছি, শোন। আজ তুমি খেতে বসলে, আমি অন্য দিনের মত তোমায় ঘোমটা দিয়ে খাবার পরিবেষণ করছিলাম। পরিবেষণের সময়, আমার হাতের চুড়ির শব্দ শুনে, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, একটু হেসেছিলে। মনে আছে?

আমি। মনে আছে। আর আমার হাসির উত্তরে, তুমিও বোধ হয় একটু হেসেছিলে।

সে। সেই হাসিতেই সর্ব্বনাশ ঘটেছে। সে হাসি বাবা দেখতে পেয়েছিলেন।

আমি। সর্ব্বনাশ!

সে। দেখে, তোমার হাত থেকে, তাঁর পরমা সতী কন্যাকে রক্ষা করবার জন্যে, তাড়াতাড়ি সপরিবারে হরিদ্বার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। কাল সকালের গাড়ীতেই যাবেন। বাড়ীভাড়া, অপরাপর দেনা পাওনা সব পরিশোধ করা হচ্ছে। মোট পুটুলি বাঁধা হচ্ছে। সকলকে কার্য্যে মনোযোগী আর আমার প্রতি অমনোযোগী দেখে, আমি চুপি চুপি তোমাকে খবর দিতে এসেছি। আজ রাত্রেই তুমি আমাকে সরিয়ে ফেলতে

না পারলে, কাল সকালে বাবা আমাকে সরাবেন—তুমি আর আমাকে দেখতে পাবে না; আমি তোমাকে দেখতে পাব না।

আমি। আজ রাত্রেই কি করে' যাব, ভেবে স্থির করতে পারছি নে।

সে। আমি তোমার কাছে একটু বসি; তুমি আরও একটু ভাব। ভেবে, আমাকে নিয়ে, যাতে আজ রাত্রেই পালাতে পার, তাহার একটা সদুপায় স্থির করে ফেল।

আমি। ভেবে কি স্থির করব? আজ রাত্রে পালাতে হলে, দু'ক্রোশ না যেতেই সকাল হবে; আর দিনের বেলায় বাবাজীর সহপাঠীরা সহজেই আমাদিকে ধরে ফেলবে।

সে। কেন ধরা পড়ব? আজ রাত্রে বারটার গাড়ীতে চড়লে, এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা লাক্সার পৌছব।

আমি। ট্রেণে গেলে গাড়ীভাড়া দিতে হয়।

সে। গাড়ীভাড়া দেবে।

আমি। কোথায় পাব? আমার নিজের কোনও টাকাকড়ি নেই। বাবাজীর কাছে চাইলে কিছু পেতে পারি। কিন্তু হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় টাকা চাইলে তিনি কি মনে করবেন, আর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমিই বা কি উত্তর দেব? তোমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া, আজ রাত্রেই হরিদ্বার ত্যাগের আর কোনও সম্ভাবনা নেই। রাত্রি মধ্যে আমরা যতদূর যেতে পারব, সকালে বাবাজীর শিষ্যেরা তা অনায়াসে অতিক্রম করে' দু' ঘণ্টার মধ্যে আমাদিগকে ধরে ফেলবে।

অপরাজিতা তাহার অলঙ্কারশোভিত বাম বাহুটি, ধীরে আমার দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া বলিল—"শোন, বলি।"

আমি তাহার বাহুবেষ্টনে বিচলিত হইয়া, চারিদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; দেখিলাম, দয়িতার এই আদর-সুখস্বর্গ কাহারও দৃষ্টিকণ্টকে কণ্টকিত কিনা? পরে নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি বলবে?"

অপরাজিতা বলিল—"শোন, টাকার জন্যে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে।"

আমি। এই যথেষ্ট টাকা তুমি কোথায় পেলে?

অপরাজিতা। আমার এক আত্মীয়া, মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত জমানো টাকা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ টাকা বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন।

আমি। ঐ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে কি করে' আজ হঠাৎ উঠিয়ে নেবে?

অপরাজিতা। তা উঠিয়ে নেবো কেন?

আমি। তবে?

অপরাজিতা। ঐ টাকার সুদ বাবা কখনও কিছুই নেন নি। বছর বছর সমস্ত সুদ এনে আমাকে দিয়েছেন। আমি ঐ সুদের টাকা কিছু কিছু খরচ করেছি বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই এখনও আমার গহনার বাক্সে মজুদ আছে। আমি আজ তা গুণে দেখেছি। সাতাশ খানা একশো টাকার নোট আছে, দশটাকার নোট দুইশো চল্লিশ খানা আছে, আর তা ছাড়া খুচরো টাকাও কিছু আছে।

আমি। সাতাশ থানায় দুই হাজার সাতশো, আর দুশো চল্লিশ থানায় দুই হাজার চার শ ;—দেখছি তোমার পাঁচহাজার টাকারও বেশী আছে।

অপরাজিতা। ঐ টাকাতে, আমাদের পাঁচ বছর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হতে পারবে।

আমি। তার অনেক পূর্ব্বেই আমি উপার্জ্জন করে, তোমার টাকা পরিশোধ করতে পারব।

অপরাজিতা। আমার ভালবাসার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করতে চেষ্টা করবে না ?

আমি। প্রাণপণ ভালবেসে তাও সুদ সমেত পরিশোধ করব।

অপরাজিতা। তা পরিশোধ করতে না করতে, আমি তোমাকে আবার ঋণী করব।

আমি। অসম্ভব নয় ; বোধ হয়, চিরকালই তোমার কাছে ঋণী থাকতে হবে।

অপরাজিতা। দেখ, আমার ঋণ কখনও পরিশোধ করতে চেষ্টা করো না। যে সামান্য দেয়, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারা যায়। যে সর্ব্বস্ব দেয়, তাহার ঋণ পরিশোধ করতে পারা যায় না,—সর্ব্বস্ব দিয়েও সে ঋণ পরিশোধ করা চলে না।

আমি। বেশ, আমি সর্ব্বস্ব দেবো, এবং তোমার কাছে চির-ঋণীই থাকব। কেমন ?

অপরাজিতা। আর, আমাকেও চিরঋণী করে রেখ।

এই বলিয়া অপরাজিতা অর্দ্ধস্ফুট গোলাপের মত তাহার অধরোষ্ঠ আমার মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল। আমি তাহা চুম্বন করিয়া তাহাকে ঋণী করিলে, সে তখনই সে ঋণ পরিশোধ করিল। এবং ঋণের সুদ স্বরূপ আর একবার আমার মুখচুম্বন করিয়া কহিল—"এই নাও, সুদ নাও। কেমন, আজ রাত্রেই আমাকে নিয়ে পালাবে ত?"

আমি। পালাব।

অপরাজিতা। আমি সন্ধ্যার আগে, তোমার কাছে আমার টাকাগুলি রেখে যাব। তার পর রাত্রি এগারোটার সময় তুমি খুব চুপি চুপি অন্ধকারে অন্ধকারে, আমাদের বাড়ীর দরজার পাশে যাবে। সেখানে আমাকে দেখতে পাবে। আমার একটা বড় ট্রাঙ্ক আছে সেটাও সঙ্গে নিতে হবে। তুমি একটা মুটে নিয়ে যেও।

আমি। মুটে, আমাদের কার্য্যকলাপে একটা সন্দেহ করে' গোলমাল বাধাতে পারে; মুটে নিয়ে যাওয়া হবে না। আমিই সেটা কোনও রকমে বয়ে সর্ব্বনাথের শিবালয় পর্য্যন্ত আনব। সেখানে একখানা একা ভাড়া নিয়ে ষ্টেশনে যাব। আর টাকাটা তোমার ঐ ট্রাঙ্কের ভিতরেই রেখ, রাস্তা খরচের জন্যে সামান্য কিছু টাকা আমার কাছে রাখলেই চলবে।

অপরাজিতা। তুমি আগেই আমাদের দু' জনের জন্যে দু'খানা টিকিট কিনে রেখ। আমরা একবারে গাড়ীতে গিয়ে চড়ব। আর একটা কায করতে হবে। আমি যখন তোমাকে টাকা

দিতে আসবো, তথন তোমার জন্যে জুতো জামা ধুতি চাদর আনব ; আর, একথানা কাঁচি আনব।

আমি। কেন? কাঁচি নিয়ে কি করব?

অপরাজিতা। রাত্রে আমাদের বাড়ীর দরজার পাশে যাবার আগে, তুমি কোন নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে তোমার মাথার এই লম্বা চুল, আর এই সাত হাত লম্বা দাড়ি, অন্ধকারে যত পার, কেটে ফেলো ; আর তোমার গেরুয়া কাপড় ত্যাগ করে আমার আনা ধুতি চাদর পরো। এত রাত্রির অন্ধকারে, এখানকার লোক আর তোমাকে হঠাৎ চিনতে পারবে না। তোমাকে কোনও সস্ত্রীক তীর্থযাত্রী মনে করে' কাহারও মনে কোন সন্দেহ হবে না।

* * * *

সন্ধ্যাকালে, আমি অপরাজিতা-প্রদত্ত বস্ত্রাদি লইয়া, গঙ্গা-তীরে মানবলোচনের অগোচর এক স্থানে বসিয়া, আমার যোগি-জনবাঞ্ছিত দীর্ঘ কেশরাশি এবং নবীন জলধরতুল্য কৃষ্ণ শ্মশ্রু-শোভা স্বহস্তে অনেকটা কাটিয়া ফেলিলাম। পরে গঙ্গাস্নান করিয়া, ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, গৈরিক বসন গঙ্গা-জলে ভাসাইয়া দিলাম। এইরূপে আমার চিরজীবনের যোগধর্ম্ম ভাসিয়া গেল।

জামা জুতা পরিয়া বাবু সাজিয়া, রেল ষ্টেশনে যাইয়া, আমি কাশী যাইবার দুইখানি টিকিট খরিদ করিলাম। তাহার পর

যথাসময়ে যাইয়া দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে, অপরাজিতাকে সর্ব্বনাথের শিবালয়ে লইয়া আসিলাম। রাস্তার এক দীপালোকে আমার মুণ্ডিত মস্তক ও শ্মশ্রুহীন চিবুক দেখিয়া অপরাজিতা হাসিল। তোমরা পাঠক, তোমরাও হাস।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আমার পাপ ও নির্ব্বুদ্ধিতা।

তখন গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। তখন শিবালিখ পর্ব্বতের কৃষ্ণমূর্ত্তি, রজনীর অন্ধকারে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। তখন হরিদ্বার প্রায় দৃষ্টিপথের অতীত। আমি গাড়ীতে বসিয়া, নত মস্তকে তীর্থেশ্বরী মায়াদেবীর চতুর্ভুজা ত্রিমুণ্ডধারিণী করালমূর্ত্তির চিন্তা করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল, দেবীমূর্ত্তির করধৃত ত্রিশূল, যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মনে হইতে লাগিল, পাষাণময়ীর নয়নতারা হইতে ক্রোধাগ্নি নির্গত হইয়া, সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমার দিকে ধাবিত হইতেছে। মনে হইল দেবীর হস্তস্থিত প্রস্তরময় নর-কপাল, যেন সজীব হইয়া আমার দিকে স্তিমিত নেত্রে চাহিতেছে; সে স্তিমিত নেত্র যেন বলিয়া দিতেছে, 'পাপী, তুমি আমারই মত নির্জ্জিত হইবে।'

ভাবিলাম, আমি কি সত্যই পাপ করিয়াছি?

কনখলের দক্ষিণে নীলধারা গিরি। গিরিগাত্রে দক্ষেশ্বরের শিবালয়। শুনিয়াছিলাম, ঐ স্থানে পতিনিন্দা শুনিয়া দক্ষনন্দিনী সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; সতীর সম্মানার্থে, ঐ শিবালয়ের ছায়ায় বসিয়া, আমি সতীর অবমাননা করিয়াছি—কুলকামিনী অপরাজিতার সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্যোগ করিয়াছি; তাহার পিতা-

মাতার বক্ষে দারুণ বেদনা দিয়া, তাঁহাদের উন্নত মস্তক কলঙ্ক-ভারে অবনত করিয়া, তাঁহাদের একমাত্র সন্তানকে পাপের পঙ্কিল পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছি। কল্য প্রভাতে উঠিয়া তাঁহারা কন্যাকে, এবং বাবাজী আমাকে দেখিতে পাইবেন না। তখন ব্যাপারটা বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইবে না। আমার স্বরূপচিত্র তাঁহাদের নেত্রে প্রকট হইয়া উঠিবে। বাবাজী ভাবিবেন, 'পাপিষ্ঠ এত পাপ লইয়া কিরূপে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল!' অনাথ-বাবু ভাবিবেন, 'পাপিষ্ঠ মনে মনে আমার এই সর্ব্বনাশের কামনা লইয়া কিরূপে নিত্য আমার অন্ন গলাধঃকরণ করিত!" বাবাজীর শিষ্যেরা মনে করিবে, তীর্থস্থানে থাকিয়া, নিত্য পবিত্র গঙ্গাজলে স্নান করিয়া, সে কিরূপে অন্তর মধ্যে এত পাপ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল।

বুঝিলাম, যথার্থই আমি মহাপাপী।

আমরা গাড়ীর যে কামরাটিতে উঠিয়াছিলাম, তাহাতে অন্য আরোহী ছিল না। উহাতে দুইটি মাত্র বেঞ্চ ছিল। বাহুতে মস্তক রক্ষা করিয়া একটি বেঞ্চে অপরাজিতা শুইয়া পড়িল; এবং শুইবার জন্য আমাকেও অনুরোধ করিল। আমি তাহার অনু-রোধক্রমে শুইলাম বটে, কিন্তু আমার নিদ্রা হইল না। তোমরা ত জান, পাপের সহিত নিদ্রার তত সদ্ভাব হয় না। আমি শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, চিন্তাবেগে হৃদয় আলোড়িত ও ব্যথিত হইতে লাগিল।

ভাবিলাম, চারি বৎসর পূর্ব্বে দুঃখিনী অসহায়া মাতাকে

একাকিনী গৃহে ফেলিয়া কেন আমি হরিদ্বারে আসিয়াছিলাম? আশা করিয়াছিলাম, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া আমি একজন মহাযোগী হইব। হায়, নির্ব্বোধ আমি! কেন বুঝি নাই যে এই পৃথিবীতে মানুষের কোন আশাই পূর্ণ হয় না। এক অজ্ঞেয় শক্তি, মানবলোচনের অন্তরালে থাকিয়া, এই সংসারচক্র চালাইতেছেন; মানুষের আশা, তাঁহার সেই ঘূর্ণ্যমান চক্রতলে, অতি ক্ষুদ্র পুষ্পের ন্যায় পলকমধ্যে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। হরিদ্বারে আমার আজীবনের আশা, সেই নির্ম্মম চক্রীর চক্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। যাহা ত্যাগ করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিলাম, দেখ, সেই কমিনীকাঞ্চন লইয়াই আজ কেমন পাপের স্রোতে ভাসিয়াছি! একটা গৃহস্থকে চিরকলঙ্কের অনন্ত সাগরে ডুবাইয়া, অন্যের পরিণীতা সহধর্ম্মিণীকে হরণ করিয়া, এবং তাহার সমুদয় অর্থ ও অলঙ্কার আপন করায়ত্ত করিয়া রাত্রের অন্ধকারের আশ্রয়ে চোরের ন্যায় পলায়ন করিতেছি!

নিজের এই দুষ্কার্য্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। বাল্যকালের একটা ঘটনা সহসা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমাদের শ্যামবাজারে, এক বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে লইয়া, এবং তাহার অলঙ্কারাদি হস্তগত করিয়া তাহাদেরই বাটীর পাচক ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়াছিল। কন্যার এই কলঙ্কে, কন্যার মাতা আত্মহত্যা করিয়াছিল; এবং পিতার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছিল। আমার ভয় হইল, পাছে অপরাজিতার কলঙ্কে তাহার মাতা সেইরূপ আত্ম-

হত্যা করেন। তাহা হইলে, আমার পাপের ফল কি ভীষণ হইবে! পরস্ব ও পরদার-অপহারী চোর আমি, তখন স্ত্রীহত্যাকারী হইব। আমাদের আইনে, এইরূপ স্ত্রীহত্যার জন্য কোন প্রকার দণ্ডের ব্যাবস্থা নাই বটে, কিন্তু পরস্ত্রীকে অপহরণ করিলে, রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইতে হয়। সেই পাচক ব্রাহ্মণ পরে ধরা পড়িয়া, দুই বৎসর কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল। আমিও হয়ত পুলিসের হাতে ধরা পড়িব! অনাথ বাবু প্রভাতে উঠিয়াই, যখন আমাদের পলায়ন-কাহিনী বিদিত হইবেন, তখন তিনি নানা স্থানে টেলিগ্রাম করিবেন। মুরাদাবাদ কিংবা বেরিলি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ধরা পড়িব। সর্ব্বনাশ! তাহা ঘটিলে, আমার দশায় কি হইবে? পুলিসের লোক যখন আমাকে ধরিয়া কারাগারে বন্ধ করিয়া রাখিবে, তখন অসহায়া অপরাজিতা কোথায় যাইবে; কি করিবে? শ্যামবাজারের সেই বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা কি করিয়াছিল? সে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া, আপনার কলঙ্ক-লীলার অবসান করিয়াছিল। অপরাজিতা যদি সেইরূপ আত্মহত্যা করে? আমার হৃদয় মধ্যে যেন একটা মহা প্রদাহ জ্বলিয়া উঠিল।—হায় হায়!—কেন আমার মনে পলায়নের পাপ বুদ্ধি প্রবেশ করিল? হে ভগবান, এখন আমি কি করিব? আমার চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়াছে, হে জ্ঞানময়, তুমি আমাকে সুবুদ্ধি দাও।

কতক্ষণ পরে স্থির করিলাম যে এ পাপ-পথে আর অগ্রসর হইব না। লাক্‌সার ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া, প্রভাতে

কাশী-অভিমুখী অন্য গাড়ীতে চড়িয়া, কাশী যাইব না; তৎ-পরিবর্ত্তে হরিদ্বারমুখী ট্রেণে আবার হরিদ্বারে ফিরিব। অপ-রাজিতাকে তাহাদের গৃহদ্বারে কোনক্রমে পৌছাইয়া দিয়া, আমি নিশ্চিন্ত মনে হরিদ্বার ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষুক বেশে দেশে দেশে ফিরিব। না, তাহাও করিব না; এ কলঙ্কিত মুখ আর লোকালয়ে দেখাইব না। গহন বনে প্রবেশ করিয়া, বনফল খাইয়া জীবন ধারণ করিব।

কিন্তু এ সম্বন্ধে অপরাজিতার মত কি?

তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য, তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। সে মুখে, গাড়ীর ছাদ হইতে আলোকরশ্মি পতিত হইয়াছিল। দেখিলাম সে শান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পিতা-মাতাকে ত্যাগ করার জন্য, একটু বিষাদের সামান্য চিহ্নও তাহার মুখে দেখিতে পাইলাম না। ভবিষ্যৎ জীবনের কোন ভাবনাই, তাহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডলের প্রশান্ত প্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারে নাই। যেন সে তাহার জীবনের সমস্ত শুভাশুভের জন্য, আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে করিয়াছে। দেখিলাম, আজ তাহার সীমন্তপ্রান্তে সিন্দুর-রাগ কিছু বেশী পরিমাণে অনুলিপ্ত রহিয়াছে। অধিকন্তু, ভ্রূদ্বয় মধ্যে আরও একটি সিন্দুরের সুন্দর টিপ শোভা পাইতেছে।—সেই প্রসন্ন প্রশান্ত ললাটে সেই টিপ। তেমন কি কেহ কখনও দেখিয়াছে? মরি মরি। জোৎস্নাপ্লাবিত ক্ষুদ্র গগনে, শরতের পূর্ণশশী যেন ক্ষুদ্রাকারে উদিত হইয়াছে; উজ্জ্বল রজত-

পাত্রের উপর কে যেন পদ্মরাগমণি স্থাপন করিয়াছে ; সৌন্দর্য্য-সাগরে যেন বালারুণ ভাসিয়া উঠিয়াছে।

আমি ডাকিলাম—"অপরাজিতা।"

আমার আহ্বানে, গভীর নিদ্রামগ্না অপরাজিতা কোনও উত্তর প্রদান করিল না।

আমি আবার ডাকিলাম, আবার ডাকিলাম। কিন্তু অপরাজিতার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। নিদ্রালস ললিত বাহুতে মস্তক স্থাপিত করিয়া, সে পূর্ব্ববৎ নিদ্রা যাইতে লাগিল। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, রক্তপুষ্পকোরকতুল্য তাহার নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। শ্লথবস্ত্রাবৃত তাহার বক্ষ নিশ্বাসে নিশ্বাসে তরঙ্গিত হইতে লাগিল।

আমি তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া, তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য উদ্যত হইলাম। কিন্তু উদ্যত হস্ত সরাইয়া লইলাম। ভাবিলাম, এ কলঙ্কিত হস্তের স্পর্শে, তাহার পুণ্যদেহ আর কলঙ্কিত করিব না। এ সিন্দূরবিন্দুশোভিতা সতীকে, তাহার সতীত্ব স্বর্গ হইতে নামাইয়া, আর কলঙ্কের পঙ্কিল কুণ্ডে নিক্ষেপ করিব না। ইহা প্রেমের ধর্ম্ম নহে। প্রেম, প্রেমিকাকে স্বর্গ হইতে নামাইয়া নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করে না। সে সেই দেবীকে স্বর্গের আসনে বসাইয়া পূজা করে।

সুতরাং আমি অপরাজিতার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারিলাম না। বিনিদ্র নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

এক ঘণ্টা পরে, রাত্রি একটার সময়, গাড়ী লাক্‌সার জংসনে আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে ঐ গাড়ী সাহারাণপুরের দিকে যাইবে। হরিদ্বার হইতে পলায়নের কার্য্যটা রাত্রের অন্ধকারে সম্পন্ন করিব বলিয়া, এইরূপ গাড়ী পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল; নতুবা গাড়ী পরিবর্ত্তন না করিয়াই হরিদ্বার হইতে কাশী যাওয়া [illegible]।

গাড়ী হইতে যাহারা অবতরণ করিতেছিল, তাহাদের কোলাহলে অপরাজিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা কোথায় এসেছি?"

আমি বলিলাম—"আমরা লাক্‌সার জংসনে এসেছি। এখানে আমাদের গাড়ী থেকে নামতে হবে।"

অপরাজিতা বলিল—"আমি একঘণ্টা বেশ ঘুমিয়েছি।"

আমি একটা মুটিয়া ডাকিয়া, ট্রাঙ্কটা তাহার মাথায় তুলিয়া দিলাম এবং নিজে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। অপরাজিতা আপন বেশবাস সংযত করিয়া, পরে নামিল।

নামিয়া, সে আমার হস্ত ধারণ করিল। সে কোমল স্পর্শে আমার সমস্ত দৃঢ়তা শিথিল হইয়া গেল; আমি আমার সব সংকল্প ভুলিয়া গেলাম। সে আমার হস্তাকর্ষণ করিয়া বলিল—"চল, আমার জানা একটা দোকানে চল। লাক্‌সারে আমি ছেলেবেলা অনেকবার এসেছি; আমি এখানকার সকল লোককে চিনি।" পরে কুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"চল্, জগন্নাথ বেনিয়ার দোকানে চল্।"

নক্ষত্রের অস্পষ্টালোকে, কঙ্করময় পথ অতিবাহিত করিয়া, ষ্টেশনের অনতিদূরে, আমরা জগন্নাথ বেনিয়ার দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লাক্‌সারে।

তথায় জগন্নাথ বেণিয়ার বিধবা স্ত্রী ও তাহার সধবা কন্যা আলোক জ্বালিয়া, অপরাজিতাকে চিনিল; চুপি চুপি কি কথা কহিল; অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে আমার দিকে গুপ্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া হাসিল; এবং আমাদিগের জন্য দোকান ঘরের পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহাতে দুইখানা কম্বল বিছাইয়া দিল।

একখানি কম্বলে, আমি উপবেশন করিলাম।

অপরাজিতা অপর কম্বলে উপবেশন করিয়া, অঞ্চল হইতে চাবি লইয়া, তাহার পেটক খুলিল; এবং তাহার মধ্য হইতে বাতি ও দীপশলাকা বাহির করিয়া কক্ষমধ্যে আরও একটি আলো জ্বালিল। পরে একখানি বিছানার চাদর আমার কম্বলের উপর বিছাইয়া, কাপড়ের একটি ছোট পুটুলি বালিশের পরিবর্ত্তে তাহাতে স্থাপিত করিয়া বলিল—"এই শেষ রাত্রে, তুমি এইটি মাথায় দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি বাইরে গিয়ে, বেণে বুড়ীকে নিয়ে, আমাদের জন্য কিছু খাবার তৈরী করব।"

আমি, আমার পূর্ব্ব রাত্রের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বলিলাম —"না, তুমি বস; আমার কিছু কথা আছে, সকল কাযের আগে তোমাকে তা শুনতে হবে।"

"কাল তখন গাড়ীতে বসে বসে, সারা দিনমান ধরে শুনব। এখন তুমি ঘুমোও।—আমি বাইরে গিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে, চারটি রান্না চড়িয়ে দিই।"—এই বলিয়া, আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, কেরোসিনের প্রদীপটি লইয়া, সে বাহিরে চলিয়া গেল।

তাহার আদেশে নিদ্রা আসিয়া যেন আমার চোখের পাতা টিপিয়া ধরিল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন প্রভাতালোক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন অপরাজিতা আসিয়া সংবাদ দিল—"ছ'টা বেজেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন কি করব ?"

অপরাজিতা। উঠিয়া মুখ ধোও, মুখ ধুইয়া কাপড় পড়।'

আমি। 'কাপড় পরিয়া পড়িতে বস।'

অপরাজিতা। না, খাইতে বস !

আমি। কি রেঁধেছ ?

অপরাজিতা। তুমি যা ভালবাস ;—সেই, সেই রকম মুগের ডাল, আর ভাত, আর আলু দিয়ে, বেগুন দিয়ে, বড়ি দিয়ে একটা...

আমি। বড়ি কোথায় পেলে ?

অপরাজিতা। বড়ি আর আমসী হরিদ্বার থেকে এনেছিলাম। আমসীর অম্বল রেঁধেছি। আর একটি জিনিষ তোমার জন্যে তৈরী করেছি। বল খাবে ?

আমি। মাছ রেঁধেছ না কি?

অপরাজিতা। মাছ এখানে এই ভোরের বেলায় কোথায় পাব?

আমি। তবে কি?

অপরাজিতা। বল খাবে?

আমি। খাব।

অপরাজিতা। তোমার জন্যে গোটাকতক পাণ সেজেছি। বল খাবে?

তাহার সেই সুধাপূর্ণ মুখের সেই আগ্রহময় প্রশ্নের অন্য উত্তর ছিল না। আমি বলিলাম—"খাব।" আমার উত্তর শুনিয়া, বুঝিলাম সে মহা আনন্দিতা হইল। আনন্দ-জ্যোতিতে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া বলিল—"আমি তোমার জন্যে ভাত আনি। তুমি বাইরে গিয়ে মুখ ধুয়ে স্নান করে এস।"

আমি কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অপরাজিতার কাণ্ড! একটা নাপিত জলভাণ্ড লইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আমার হাজামৎ করিবে।

সে আমার অবশিষ্ট কেশগুলির পুনঃ-সংস্কার করিল; দশ আনা ছ' আনা হিসাবে তাহা কর্ত্তন করিয়া, আমাকে নববিবাহিত একটি নব্য বাবু করিয়া তুলিল। আর দীর্ঘ নখগুলি কাটিয়া দিল। ক্ষৌরাচারে আমার চিবুক চিক্কণ করিয়া দিল। তাহার পর, আমাকে ইঁদারার নিকট লইয়া গিয়া, আমার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, আমার গাত্র ও মস্তক সাবান

দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া, আমার যোগধর্ম্মের ‘বোটকা গন্ধ’ একেবারে লোপ করিয়া দিল।

স্নানান্তে পরিধান জন্য অপরাজিতা তাহার পেটক মধ্য হইতে আমাকে নূতন বস্ত্র বাহির করিয়া দিল; এবং নাপিতকে একটি রজতমুদ্রাদ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিল।

সুগন্ধি সাবান অনুলেপনে স্নাত ও নববস্ত্র-পরিহিত হইয়া, আমি পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে অপরাজিতা বুরুষ, চিরুণী ও সুগন্ধি তৈলের শিশি লইয়া আমার সমীপবর্ত্তিনী হইল, এবং আমাকে তাহার হস্তস্থিত বুরুষ ইত্যাদি দেখাইয়া বলিল—“এই দেখ, এ তোমার জন্যে কিনে এনেছি। এস তোমার মাথা আঁচড়ে দিই।”

আমি মুস্কিলে পড়িলাম। কি করিব? রাত্রের সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। না, এ পাপ-পথে আর অগ্রসর হইব না। অপরের পরিণীতা কুলকামিনীকে দিয়া আর কোন মতে কেশ-বিন্যাস করান হইবে না। একটু দূরে সরিয়া বলিলাম—“না না, মাথা আঁচড়াতে হবে না। তোমার সঙ্গে কতকগুলি কথা আছে, তা আগে শোন।”

“মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে শুনব।”—এই বলিয়া, সে আমার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া, আমাকে কম্বলের বিছানার উপর বসাইল।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—“না না, তোমার আঁচড়াতে হবে না; আমাকে চিরুণী দাও, আমিই আঁচাড়াচ্চি।”

সে আমার সম্মুখে একখানা আয়না রাখিল; এবং গন্ধতৈলের শিশি হইতে কয়েক ফোঁটা গন্ধতৈল আপন পদ্মবৎ পাণিতলে গ্রহণ করিয়া, তাহা আমার কেশে মাথাইয়া দিতে দিতে কহিল—"আজ আমার জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। একদিন নিজের চুল বাঁধতে বাঁধতে বলেছিলাম, যদি কখনও তোমার রুক্ষ চুল মুড়িয়ে দিয়ে, কখন তাতে গন্ধতেল মাথাতে পারি, তা হলেই আমার চুল বাঁধা আর সিঁদূর পরা সার্থক হবে। যা বলেছিলাম, আজ তা করলাম। আজ আমার সিদূর পরা সার্থক হল।"

সেই কোমল করস্পর্শে, সে আনন্দোজ্জ্বল মুখের সেই মধুর কথায় আমি প্রায় গতচেতন. হইয়া পড়িয়াছিলাম। তথাপি কতকটা বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া আমি বলিলাম—"তুমি পরস্ত্রী, তোমাকে নিয়ে পালানো আমার ভাল হয় নি।"

সে বুরুষ দিয়া চিরুনী দিয়া আমার কেশবিন্যাস করিতে করিতে কহিল—"তা বিচার করবার এখন আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে নাও, নইলে গাড়ী ধরতে পারবে না—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাকসারেই থাকতে হবে।"

আমি আহার করিতে বসিয়া বলিলাম—"যদি ধরা পড়ি, দু' বছর জেলে যেতে হবে।"

সে জিজ্ঞাসা করিল—"তরকারিটা কেমন হয়েছে? বেণে বুড়ির কাছ থেকে কিছু লঙ্কার আচার এনে দেব কি?"

আমি বলিলাম—"তরকারি ডাল দুইই ভাল হয়েছে; তোমার

রান্না কবে মন্দ হয়? আর, লঙ্কার আচার?—দাও একটু এনে—আমসীর অম্বলের সঙ্গে তা মন্দ লাগবে না।"

অপরাজিতা একটা মৃৎপাত্রে অতি সুদর্শন বিম্ববিনিন্দিত চারিটি লঙ্কার সুরস আচার আমার ভোজন পাত্রের পার্শ্বে রাখিল।

আহা আহা, তোমরা যদি কখনও ভাঁজকরা কম্বলে বসিয়া, অপরাজিতার রান্না আম্‌সীর অম্বলের সহিত বেণে বুড়ীর লঙ্কার আচার খাইতে,—সেই স্বর্গীয় ঝাল অম্ল মধুর রসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের আর বয়োবৃদ্ধি হইত না, চুল পাকিত না, দাঁত পড়িত না, গাত্রচর্ম্ম শিথিল হইয়া যাইত না। সেই অম্ল খাইয়া, আমি কারাদণ্ডের ভয় ভুলিয়া গেলাম। পুলিশ, লালপাগড়ী কারাগারের লৌহদণ্ড—সমস্তই সেই অম্লরসে বেমালুম হজম হইয়া গেল।

নির্ভয়ে আহার সমাধা করিয়া, আমি অপরাজিতা-প্রদত্ত তাম্বুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম।

ইত্যবসরে, অপরাজিতা বেশ-পরিবর্ত্তন ও আপন আহার সমাধা করিয়া লইল, এবং অতি অল্প সময় মধ্যে পেটকাভ্যন্তরে বস্ত্রাদি পূরিয়া ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাজের মুটেকে বলা ছিল; সে যথাসময়ে আসিয়া পেটকটি গ্রহণ করিল। আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষ্টেশনে আসিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া, আমি অপরাজিতাকে বলিলাম—"দেখ, আমার আর কাশী যাবার ইচ্ছে নেই।"

"কোথায় যাবে ?"

"আবার হরিদ্বারে ফিরে যাব।"

"কেন ?

"সেখানে তোমাদের বাড়ীতে তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে, আমি অন্যত্র চলে যাব।"

"আমাকে বিয়ে করবে না ?"

"না; আমার সঙ্গে তোমাকেও কলঙ্কিনী করব না। যাতে রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে হয়, এমন কায করতে আমার সাহস হচ্চে না।"

তাহার প্রসন্ন ললাট কুঞ্চিত করিয়া, অপরাজিতা আমার মুখের দিকে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল। বুঝি আমার মুখমণ্ডলে আমার অন্তরের ছায়া দেখিতে চেষ্টা করিল। আমার অন্তরের ভাব বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। বুঝিয়া, সে একটু ভ্রুকুটি করিল এবং একটু হাসিয়া বলিল—"তোমার কোন ভয় নেই। আমাকে হরণ করার জন্যে, তোমাকে কখনও রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে হবে না;—কে তোমার বিপক্ষে আদালতে নালিশ করবে ? আর, হরিদ্বারে ফিরে যাবার কথা বলছ ? সেখানে আমি কার কাছে যাব ?"

"কেন, তোমার বাপ মার কাছে।"

"আমরা সেখানে পৌঁছবার আগেই তারা হরিদ্বার ত্যাগ করবেন; এখান থেকে সাতটার সময় যে গাড়ী গিয়েছে, তাতেই তাঁরা যাবেন।"

"কোথায় যাবেন ?"

"বোধ হয়, দেরাদুন বা মসুরি পাহাড়ে যাবেন।"

"তোমার পালাবার কথা জানতে পেরেও কি মসুরি যাবেন ?"

"আরও নিশ্চয় যাবেন ; আমাকে খোঁজবার জন্যে যাবেন। আমি আমার বিছানার উপর একখনা কাগজে লিখে এসেছি যে আমি দেরাদুন যাচ্ছি, কোনও ভয় নেই, শীঘ্রই সংবাদ দেবো। ঐ কাগজ পেয়ে, তাঁরা যত শীঘ্র পারেন, দেরাদুন যাবেন। আর দেরাদুনে আমার সন্ধান না পেয়ে তাঁরা নিশ্চয় মনে করবেন যে আমি মসুরি গিয়েছি। তখন তাঁদের মসুরি যেতেই হবে। এর মধ্যে কাশীতে গিয়ে, তুমি আমাকে বিয়ে ক'রে একেবারে দখল ক'রে ফেলবে, আর বাবাকে খবর দেবে যে তাঁর কুমারী কন্যাকে তুমি যথাশাস্ত্র বিয়ে করেছ। আমি জানি, বাবা তাঁর একমাত্র আদরের মেয়েটিকে; কেবলমাত্র অকুলীন বিয়ে করেছে বলে' ত্যাগ করতে পারবেন না। কাযেই তোমাকেও তাঁর গ্রহণ করতে হবে। ঐ গাড়ী এল। চল আমরা গাড়ীতে উঠি। একটা নির্জ্জন কামরা খুঁজে নিও, বেশ গল্প করতে করতে যাব।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আত্মপ্রকাশ।

প্রভাতবায়ু ভেদ করিয়া, সুদূর লাক্‌সার ছাড়িয়া গাড়ী যখন পূর্ব্বমুখে ছুটিল, তখন আপনাকে স্বদেশাভিমুখ মনে করিয়া, আমি কতকটা পুলকিত হইয়া পড়িলাম। এক অভিনব উল্লাসে আমার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। গাড়ীর গবাক্ষ দিয়া দেখিলাম, প্রভাত সূর্য্যের অপ্রখর কিরণে স্নাত হইয়া, প্রান্তরসীমাবর্ত্তী বৃক্ষ সকল নৃত্য করিতেছে; শষ্পশয্যায় গাভী সকল শয়ান রহিয়াছে; নদী-তীরে মহিষেরা দল বাঁধিয়াছে; রেলপথের অদূরে ক্ষুদ্র পল্বল-পার্শ্বে সারস সকল ক্রীড়া করিতেছে; টেলিগ্রাফের তারে, বিচিত্র বর্ণের পক্ষী সকল বসিয়া, যেন গীতিময় পুষ্পের মালা গাঁথিয়াছে।

ধরণীর আনন্দ-হিল্লোলে, রৌদ্রময় আকাশের অসীম উদারতায়, আমার মুগ্ধহৃদয় সহসা প্রভাত-শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সেই শুভমুহূর্ত্তে আমি সহসা দেখিতে পাইলাম যে আমার হৃদয়মধ্যে, পদ্মমধ্যে কীটের ন্যায়, রাশি রাশি ছলনা এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে—আমার যথার্থ পরিচয় এখনও আমি হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছি। বক্ষে এই ছলনা লইয়া আমি কিরূপে আমার হৃদয়েশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিব? অতএব আমি স্থির করিলাম, সর্ব্বাগ্রে অপরাজিতাকে আমার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিব।

আত্মপরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়া গাড়ীর গবাক্ষ হইতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, অপরাজিতা বেঞ্চের উপর শুইয়া গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া, সে নিশ্চয় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এক্ষণে গাড়ীর আন্দোলনে ও বায়ুর শীতল স্পর্শে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় সে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে জাগাইলাম না; পুষ্পরাশির ন্যায় তাহার সেই আন্দোলিত দেহশোভা দেখিতে লাগিলাম।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে, গাড়ী নজীবাবাদ জংসনে পৌঁছিল। তথায় খাদ্যবিক্রেতাগণ খাদ্যপূর্ণ ডালি লইয়া প্লাটফরমে বিচরণ করিতেছিল। আমি এক ফলওয়ালার নিকট হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ন্যাসপাতি ক্রয় করিলাম; এবং অপরাজিতার জাগরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

নজীবাবাদ হইতে গাড়ী ছাড়িবার প্রায় একঘণ্টা পরে অপরাজিতা জাগ্রত হইয়া বলিল—"খুব ঘুমিয়েছি।"

আমি বলিলাম—"কাল রাত জেগে তুমি ক্লান্ত হয়ে ছিলে; এই ঘুমে তোমার অনেকটা ক্লান্তিদূর হল।"

সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি একটু ঘুমোলে না কেন?"

আমি বলিলাম—"না, আমি জেগে পথের নানা দৃশ্য দেখ্‌ছিলাম। দেখ, তোমার জন্যে কেমন ন্যাসপাতি কিনে রেখেচি।"

সে বলিল—"তুমি খাও, আমি এখন কিছু খাব না। আমার বাক্সে ছুরি আছে, দাঁড়াও বের করে' দিই, কেটে খাবে।"

আমি ন্যাসপাতি কাটিয়া তাহা চর্ব্বণ করিতে করিতে কহিলাম—"তোমার সঙ্গে কথা আছে। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলে বলে' বলতে পারি নি।"

অপরাজিতা প্রভাতের ন্যায় আবার ললাট কুঞ্চিত করিয়া ভ্রুকুটি করিল; বলিল—"আবার কি কথা?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি আমার পরিচয় কিছু জান?"

সে। খুব জানি। না জানলে বাপ মাকে ছেড়ে, কে তোমার সঙ্গে হাসিমুখে একলা বিদেশে যেত? প্রাণপণে ভালবাসলেও, অপরিচিতের আহ্বানে তার সঙ্গে পালাতাম না। তোমার পরিচয় আমি খুব জানি।

আমি। আমার কি পরিচয় জান?

সে। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তোমার সব পরিচয়ই আমি জানি।

আমি। তা কি?

সে। জানি যে হরিদ্বারে তুমি যোগী ছিলে,—নধর দাড়ি, লম্বা চুল, গেরুয়া বসন। এখন সে দাড়ি, সে বসন ভগবানের কৃপায় অথবা প্রেমের মহিমায় গঙ্গালাভ করেছে; সে চুল ছোট হয়েছে, তাতে গন্ধতেল মাখিয়ে আমি বাঁকা টেরি কেটে দিয়েছি;—এখন তুমি নবীন নাগর হয়েছ। কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায়, তুমি আমার প্রাণেশ্বর হবে। এই তোমার অতীত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের পরিচয়। কেমন?"

আমি। আমার বাপ মা কে, আমি কোন দেশের লোক—এ সকল কিছু জান কি ?

সে। সবই জানি। সবই বাবাজীর কাছে শুনেছি। আমিও শুনেছি, বাবাও শুনেছেন। তোমার বাড়ী বাঙ্গালা দেশে, শান্তিপুরের কাছে হরিপুরে। তোমার বাবার নাম ৺উমেশচন্দ্র রায়।

আমি। সব মিথ্যা; ওর এক বর্ণও সত্য নয়। আমি 'রায়' বামুন নই, আমার বাবা 'রায়' বামুন ছিলেন না, আমার চৌদ্দপুরুষ 'রায়' বামুন ছিল না।

সে। সর্ব্বনাশ! বল কি ? বামুন নও ? তবে তোমারা কি জাত ? মুসলমান না কি ? সর্ব্বনাশ! তুমি আমাদের বাড়ীতে খেলে, আমি যে তোমার পাতে খেয়ে ফেলেছি! ও মা কি হবে! আমার একেবারে জাত গেছে! কাশীতে গিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে দশটা ডুব দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আমি। না না, তোমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না।—আমি মুসলমান নই।

সে। সর্ব্বরক্ষে! তাহা হলে তুমি কি ?

আমি। আমি ব্রাহ্মণ—বন্দ্যোপাধ্যায়,—ভগীরথ বাঁড়ুয্যের সন্তান।

সে। আমাদের পাল্‌টি ঘর! হায় হায়! এ কথা আগে বল নি কেন ? শুনলে বাবা নিশ্চয় তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতেন। আমাদের পালাবার কোন আবশ্যক হত না; আর শুভকর্ম্মটা একমাস আগে হয়ে যেত।

আমি। আমার বাবার নাম ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে। তবে বাবাজীর কাছে কেন মিথ্যা কথা বলেছিলে?

আমি। দুর্ব্বুদ্ধি। মনে করেছিলাম, বাবাজীর কাছে মিথ্যা পরিচয় দিলে, বাবাজীর আর আমার মাকে হরিদ্বারে আনতে কিম্বা আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে আমার যোগধর্ম্মের বিঘ্ন ঘটাতে পারবেন না—আমি নিরাপদে যোগী হয়ে উঠব।

সে। তোমার মা আছেন?

আমি। যখন বাড়ী ছেড়ে এসেছিলাম, তখন তিনি বেঁচে ছিলেন। পুত্রহারা হয়ে, এখনও বেঁচে আছেন কিনা বলতে পারি নে।

সে। তুমি তাঁকে ফেলে এসে ভাল কর নি। আমাদের বিয়ের পর তুমি আমাকে হরিপুরে তাঁর কাছে নিয়ে যেও।

আমি। আমার বাড়ী হরিপুরে নয়।

সে। তবে কোথায়?

আমি। কলকাতায়,—শ্যামবাজারে। আমি স্বপ্নেও জানি নে, হরিপুর কোথায়।

সে। তবে আমাকে কলকাতায় সেই শ্যামবাজারেই নিয়ে যেও। কেমন?

আমি। না, সেখানে তোমার যাওয়া হবে না। আমি কাশীতে বা পশ্চিমাঞ্চলের অপর কোন সহরে বাস করব। সেই খানেই মাকেও নিয়ে আসব। দেশে শ্যামবাজারে আর কখনও বাস করা হবে না।

সে। কেন ?

আমি। দেশে আমার একটা ভয়ঙ্কর বিঘ্ন আছে।

সে। কি বিঘ্ন ?

আমি। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে কালীঘাট বলে' একটা ভয়ঙ্কর স্থান আছে। সেই স্থানের এক ব্রাহ্মণকুমারীর সঙ্গে ছেলেবেলা আমার বিয়ে হয়েছিল।

সে। বল কি ? পাকাপাকি বিয়ে ? মাগী এখনও বেঁচে আছে নাকি ? কি জ্বালা ! তোমার সন্ধানে সন্ধানে সে নিশ্চয় কাশীতে আসবে। গন্ধে গন্ধে তোমাকে খুঁজে বের করবে। —মেয়েমানুষ জাত এমন নয় ; দশক্রোশ তফাৎ থেকে স্বামীর সন্ধান পায় ! তার পর তোমাকে পেয়ে, একেবারে দখল করে বসবে। তখন আমার দশায় কি হবে ?

আমি। তোমার কোন ভয় নেই ;—তুমি চিরকাল আমার একমাত্র আদরিণী থাকবে। তাকে আমি কখনও গ্রহণ করব না।

সে। সে কোন কাযের কথা নয়। তাকে গাঁটছড়া বেঁধে বিয়ে করেছ ; কি করে' ত্যাগ করবে ? গাঁটছড়ার বাধন, বড় কঠিন বাঁধন ! তুমি কেন সে পোড়ামুখীকে বিয়ে করেছিলে ?

আমি। আমি দিব্যি করে' বলছি, আমি তাকে আপন ইচ্ছায় বিয়ে করি নি।

সে। বিয়ের মন্ত্র ত বলেছিলে।

আমি। না, মন্ত্রও উচ্চারণ করিনি।—সে কটমট মন্ত্র

প্রায় কোন বরই উচ্চারণ করতে পারে না; পুরোহিতের কথায় সায় দিয়ে যায়।

সে। বিয়ের পর তাদের বাড়ীতে যেতে?

আমি। না, একবারও যাইনি।

সে। তবে সে পোড়ারমুখীর কথা কেন তুল্লে? একটা সতীনের জ্বালা কেন আমার বুকে জ্বেলে দিলে?

আমি। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আজ হঠাৎ আমার মনে হল যে তোমার কাছে আমার কোন কথা গোপন রাখা উচিত নয়। তাই সকল কথা তোমাকে বল্লাম। এখন তুমি আমার যথার্থ পরিচয় পেলে; জানলে যে আমার জীবন ছলনাময়; জানলে যে আমি কৃতদার। এখন যদি তুমি মনে কর যে, এই বিবাহিত মিথ্যাবাদী বরকে বিয়ে করা তোমার পক্ষে সুখকর হবে না, তা হলে, তুমি তা বলবামাত্র আমরা মুরাদাবাদে নেমে পড়ব; আর হরিদ্বারে বাবাজীকে টেলিগ্রাফ করে জানাব, তোমার বাবা এখন কোথায় আছেন;—তিনি নিশ্চয় বাবাজীকে সে কথা বলে গিয়েছেন। তোমার বাবা কোথায় আছেন তা জেনে, আমি তোমাকে তাঁর কাছে পৌছে দেব। আর তাঁর কাছে, বাবাজীর কাছে আপনার অপরাধের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করে, দেশে বিদেশে, তোমার কয়েক দিনের অতুলন ভালবাসার কথা ভেবে, ঘুরে বেড়াব।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আমি অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি হইলাম।

গাড়ী মুরাদাবাদে আসিয়া পৌঁছিল। মস্ত ষ্টেশন। প্লাটফরমে অনেক দোকান। খাদ্যদ্রব্য ক্রয় জন্য আমি প্লাটফরমে নামিলাম। পুরী ও তাহার সহিত কিছু কুমড়ার তরকারী কিনিলাম, আলুর দম কিনিলাম, দইবড়া কিনিলাম, মিঠাই কিনিলাম, গরম গরম চীনের বাদামভাজা কিনিলাম; এবং একে একে সকল জিনিষ অপরাজিতার নিকট গাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।

খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া অপরাজিতা বলিল—"এই আমাদের দু'জনের যথেষ্ট হবে। আর কিছু নিতে হবে না। কেবল কিছু দুধ নাও।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দুধ নেবো; কিন্তু পাত্র কোথায়?"

অপরাজিতা মুরদাবাদী বাসনের দোকান দেখাইয়া দিল। সেখানে, রাঙের কলাইকরা বহুবিধ সুদৃশ্য পিত্তল পাত্র বিক্রীত হইতেছিল। অপরাজিতার অনুরোধক্রমে, আমি একটী গেলাস, একটি লোটা আর একটি ছোট বাল্তি ক্রয় করিলাম। একটি পয়সা দিয়া পাণিপাড়ের নিকট হইতে বাল্তি পূর্ণ করিয়া জল লইলাম। লোটাতে দুগ্ধ কিনিয়া রাখিলাম। গেলাসটি জলপূর্ণ করিয়া গাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম। এইরূপে

অপরাজিতার সহিত, বিবাহের পূর্ব্বেই আমি গাড়ীতেই সংসার পাতিলাম।

তাহার পর দুই দিনের পুরাতন একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র একটি পুস্তকের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া, আমি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম; এবং অপরাজিতা খাদ্যদ্রব্য সকল বেঞ্চের উপর একটি শালপাতায় সুসজ্জিত করিয়া দিলে, আহারে মনোনিবেশ করিলাম।

আহার অর্দ্ধসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার আহার হইলে, অপরাজিতা আহার করিয়া বলিল —"কুলীন বামুনের উচ্ছিষ্ট কি মিষ্ট!"

দুধ, কিছু মিষ্টান্ন ও সকালের সেই ন্যাসপাতি রাত্রের আহার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল।

অপরাজিতা সকালে যে সকল পাণ সাজিয়াছিল, এখনও তাহার কতকগুলি তাহারের নিকট ছিল। সে তাহা হইতে দুইটি পাণ লইয়া একটি আমাকে দিল একটি আপনি খাইল।

পাণ খাইয়া, আমি সংবাদপত্র লইয়া দুনিয়ার সংবাদ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম।

পড়িলাম, যোধপুরে বড়লাট সাহেবের বক্তৃতা; লাট বাহাদুর, আহারাদির পর, নাবালক মহারাজার অভিবাবকের সুখ্যাতি করিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন এবং অবশেষে মহারাজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সবান্ধবে মদ্যপান করিয়াছেন। পড়িলাম, আমেরিকার মহাসভায় সভাপতির জ্বালাময়ী বক্তৃতা। পড়িলাম,

বাঙ্গালার লাটসভায় এক বাঙ্গালী সদস্যের অভ্রভেদী বক্তৃতা। পড়িলাম, ইংলণ্ডে প্রধান মন্ত্রীর কূটনীতিময়ী বক্তৃতা। বুঝিলাম মাতা বসুমতী বক্তৃতাময়ী হইয়াছেন।

কলিকাতার সংবাদ পড়িয়া বুঝিলাম যে কেল্লার সময়গোলক ঠিক একটার সময় পড়ে নাই, বারো সেকেণ্ড পরে পড়িয়াছে; এক বালিকা মোটরগাড়ীর তলায় চাপা পড়িয়া মরিয়াছে; আগুন লাগিয়া এক পাটের গুদাম পুড়িয়া গিয়াছ; এক চীনে, চোরাই আফিং রাখায় ধরা পড়িয়াছে; গঙ্গার পুল বেলা দুইটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকিবে; ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদালতের সংবাদ পড়িয়া জানিলাম যে, আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক সঙ্গীন মকর্দ্দমা চলিতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে শ্যামপুর নামক এক গ্রামে, মাসিক আট টাকা ভাড়ায় এক দ্বিতল বাড়ী লইয়া, পাঁচটি যুবক তাহাতে বাস করিত। এই যুবকগণ একটা পিস্তল, একটা কুক্রী, দুইটা ছুরি, তিনটা কাঁচি ও তিনটা লাঠি লইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে মহা সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পুলিশের অদম্য চেষ্টায় পাপিষ্ঠেরা সকলেই ধরা পড়িয়াছে। একজন কেবল পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া পশ্চিমাঞ্চলে কোথায় পলাইয়াছে। কেবল তাহাকে ধরিবার জন্য পুলিশ পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছে; আশা করা যায় যে পলাতক পাপিষ্ঠ শীঘ্র ধৃত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইবে। পাপিষ্ঠেরা সুঁড়োর এক বাগানবাড়ীতে বারুদ প্রস্তুতের কারখানা

খুলিয়াছিল। সেখানে খানাতল্লাসী করিয়া, পুলিশ অর্দ্ধমণ কয়লা, একপোয়া গন্ধক, প্রায় ছয় ইঞ্চি চওড়া ও আট ইঞ্চি লম্বা একখানি সীসার পাত এবং সন্দেহজনক অন্যান্য বহুবিধ দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যে চারিজন লোক ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক সুবোধ ব্যক্তি রাজসাক্ষী হইয়া, অনেক লোমহর্ষক ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছে। যে বাটীতে পাপিষ্ঠগণ বাস করিত, তাহাতে একখানি কাগজ পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে অনেক লোকের নাম আছে; বুঝা গিয়াছে যে এই সকল লোক রাজদ্রোহ ব্যাপারে সংসৃষ্ট। এই সকল লোকের নাম পুলিশ আপাততঃ প্রকাশ করিবে না। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মকর্দ্দমা চালাইতেছেন কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার বাবু ও সরকারী উকীলবাবু; আর আসামীদের পক্ষে আছেন, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ইউ, এন, দাস। পুলিশ আরও কতকগুলি সাক্ষী-প্রমাণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আরও কিছু দিনের সময় প্রার্থনা করিলে, আদালত পনের দিনের জন্য মকর্দ্দমা মুলতবি রাখিয়াছেন। আসামীগণ হাজতে বাস করিতেছে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে পড়িলাম, চীন দেশের লোকেরা আফিম খাইয়া বড় দুর্ব্বল ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িতেছে। অতএব জগতের প্রত্যেক সভ্য জাতির চেষ্টা করা উচিত যে ইহারা যেন আর আফিম খাইতে না পায় এবং ইহাদের দেশে যেন আফিমের চাষ একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এই চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টেরও সহায়তা করা উচিত। পরে, সম্পাদক মহাশয় জ্বালাময়ী

ভাষায় লিখিয়াছেন যে এই মহা প্রাচীন জাতি যাহাতে ক্রমশঃ নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া, ক্রমে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীর বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

সম্পাদকের এই মন্তব্য পাঠ করিয়া, আমার সন্দেহ হইল যে, চীন জাতির এই মহা প্রাচীনত্ব বুঝি আফিমের প্রসাদেই ঘটিয়াছে। অন্যপক্ষে, আলিপুরের সংবাদ পড়িয়া, আমার মনে সন্দেহ হইল না যে, অবিলম্বে আমি নিজে ঐ ঘটনায় বিজড়িত হইব।

সংবাদপত্র পাঠ সমাধা করিয়া, আমি নানা বিষয়ে অপরাজিতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার সুমিষ্ট ও রহস্যময়ী কথা সকল শুনিয়া, শ্রবণ জুড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেই অল্পবয়সে সে নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে।

রাত্রি আটটার সময়, গাড়ী বেরিলী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল।

এতক্ষণ আমারা আমরা গাড়ীর কামরাটি দুইজনে উপভোগ করিতেছিলাম। কিন্তু বেরিলীতে দুইটি ভদ্রলোক ও একটি উত্তরীয়াবৃতা মহিলা আমাদের কামরায় আরোহণ করিলেন। ভদ্রলোক দুইটির মধ্যে, একজন হ্রস্বকায় বৃদ্ধ—সুগৌরতনু, জাতিতে পশ্চিমদেশীয় ক্ষেত্রী। অপর প্রবীণ ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র; মহিলাটি পুত্রবধূ। এ সকল সংবাদ বৃদ্ধ আপনিই আমাকে প্রদান করিলেন।

তাহার পর বৃদ্ধ বলিলেন—"আমরা বেশী দূর যাব না।

সাহজাহানপুরে নামব। সেখানে আমার ছেলে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। সেখানে আমার তিন পৌত্র আছে। আমার অসুখ হওয়ায়, আমার ছেলে, আমার পুত্রবধূকে নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছিল। এখন আমার অসুখ ভাল হয়েছে। এখন আমি কয়েক দিনের জন্যে সাহজাহানপুরে গিয়ে থাকব। কিন্তু বেশী দিন থাকতে পারব না। দেশে না থাকলে, চলে না। বাড়ী ঘর মাটী হয়ে যায়। খাজনা পত্র আদায় হয় না। আপনাকে ত বাঙ্গালী দেখছি ;—আপনি কতদূর যাবেন ?"

আমি ভাবিলাম, একজন পরস্ত্রীকে লইয়া পলায়নের সময়, একজন অপরিচিত লোকের নিকট সত্য সংবাদ দেওয়া হইবে না। কি জানি, যদি কোন গোলযোগ ঘটে! অতএব আমি পুনরায় আমার পুরাতন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি বলিলাম —"আমরা ফয়জাবাদ যাব।"

বৃদ্ধ। ওঃ! সেইখানেই বুঝি আপনারা থাকেন? কি করেন ?

আমি। আমি কোন কায কর্ম্ম করি না। আমার শ্বশুরের সেখানে ঔষধের দেকান আছে। সেখানে তাঁর কাছে, তাঁর কন্যাকে পৌছে দেবো।

বৃদ্ধ। এইটি বুঝি তাঁর কন্যা—আপনার স্ত্রী? অপনারা কোথা, থেকে আসছেন ?

আমি। আমরা গাজিয়াবাদ থেকে আসছি।

বৃদ্ধ। বেশ বেশ। আপনার নামটি কি বল্লেন ?

আমি। আমার নামটি এখনও আমি আপনাকে বলি নি।

বৃদ্ধ। বলবার কিছু বাধা আছে কি?

"কিছু না।"—এই বলিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি একবার আপন মনে ভাবিয়া লইলাম; কি মিথ্যা নাম বলিব? এবার আপনাকে 'রায়' বামুন করা হইবে না। এবার বলিব, কাৰ্ত্তিক-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। না না, মুখোপাধ্যায় বলা হইবে না।—অপরাজিতারা মুখোপাধ্যায়; মুখোপাধ্যায়ের সহিত মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয় না। গাঙ্গুলি বলিতে হইবে;—বেগের গাঙ্গুলিরা ভারি কুলীন। কাৰ্ত্তিকচন্দ্র গাঙ্গুলি?—না, হরিদ্বারের সেই 'কাৰ্ত্তিকচন্দ্র' নামটা লুকাইতে হইবে। ভাবিয়া বলিলাম—"আমার নাম, অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি।"

নামটা শুনিবামাত্র, বৃদ্ধের পুত্র একবার আমার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন এই দৃষ্টিপাতের অর্থ আমি বুঝতে পারি নাই। পরে উহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ইংরাজ কবিশ্রেষ্ঠ সেক্ষপীয়র যে বলিয়াছিলেন—'নামে কিছু আসিয়া যায় না, গোলাপ অন্য নামেও মধুর হইত'—তাহা কেবল কবিত্ব মাত্র; এই গন্ডময় সংসারে নামে বিলক্ষণ আসিয়া যায়! তোমরা পরে তাহা বুঝিবে।

আমার নাম শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"আপনারা ব্রাহ্মণ; আমরা ক্ষেত্রী;—আমার নাম সদানন্দ সায়গাল; আমার ছেলের নাম, পুরুষোত্তম সায়গাল। আমার এই এক পুত্র, আর তিন পৌত্র। বড় পৌত্র আপনার সমবয়স্ক হবে। আমরা সাহজাহান্-

পুরে নেমে গেলে, আপনি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবেন। রাত্রে আর এ গাড়ীতে লোক ওঠবার সম্ভাবনা নেই, সকালে গাড়ী লক্ষ্ণৌ পৌছলে যদি দুই একজন লোক ওঠে। তা লক্ষ্ণৌয়ে অপনারা ত নেমে ফয়জাদাবাদের গাড়ীতে চড়বেন? ফয়জাবাদের গাড়ীর জন্তে লক্ষ্ণৌয়ে আপনাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। তা বেশ হবে, সেইখানে আপনারা স্নানাহার করে নিতে পারবেন।"

বৃদ্ধের বাক্যস্রোত বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার বাক্যাপেক্ষা দ্রুতগামী গাড়ী, হুড়্ হুড়্ দুড় দুড় করিয়া সাহজাহানপুরে আসিয়া পৌছিল। তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়াছে। বৃদ্ধ, তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। ষ্টেশনে ডেপুটীবাবুর দুইজন ভৃত্য এবং একজন চাপরাসী উপস্থিত ছিল; তাঁহারা আসিয়া জিনিষপত্র সব নামাইল। এক ভৃত্যকে একটি ক্ষুদ্র হাঁড়ি উঠাইতে দেখিয়া, বৃদ্ধ সেই হাঁড়িটি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"বাবু, বাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এই হাঁড়িতে আমার পুত্রবধূর প্রস্তুত কিছু জলখাবার এনেছিলাম। আপনার সঙ্গে গল্প করতে, আর ক্ষুধার অভাবে, ওগুলো আর খাওয়া হয়নি। এখন ওগুলো আর বয়ে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া বৃথা; সেখানে আমাদের রাত্রের খাবার প্রস্তুত আছে। ওগুলো আপনি দয়া করে গ্রহণ করলে, আমার মহা তৃপ্তি হবে। আপনার চেহারাটা অনেকটা আমার জ্যেষ্ঠ-পৌত্রের মত, তাই আপনার প্রতি আমার একটা স্নেহের আকর্ষণ জন্মেছে।"

অগত্যা কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া, আমি সেই খাদ্যভাণ্ড গ্রহণ করিলাম।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে অপরাজিতা আমার দিকে ফিরিয়া, হাসিয়া বলিল—"গাঙ্গুলি মহাশয়, প্রণাম হই ; আপনার গাজিয়াবাদের বাটীর কুশল ত ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন ? মিথ্যা পরিচয় দেওয়াটা কি ভাল হয় নি ?"

সে। কার্ত্তিকচন্দ্র আর অনিলকৃষ্ণ,—এই দুই নামই ওদের কাছে সমান অপরিচিত, কাযেই অনিলকৃষ্ণ না বলে' কার্ত্তিকচন্দ্র বল্লে কোনও ক্ষতি হত না। বরং মিথ্যা পরিচয় জন্য, কোনও না কোন ক্ষতির আশঙ্কা রইল।

আমি। ঐ দেখ, আসল কথাটাই তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। আমার আসল নাম কার্ত্তিকচন্দ্র নয় ; ওটা আমার জাল নাম।

সে। তবে তোমার আসল নাম কি অনিলকৃষ্ণ ?

আমি। না, ওটাও নকল নাম। আমার আসল নাম, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; আমার পিতার নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তা ত তোমাকে বলেছি ; আমার ঠাকুরদাদার নাম গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ; আমার প্রপিতামহের নাম, শান্তিরাম-স্মার্ত্তবাগীশ।

সে। তোমার সেই কালীঘাটওয়ালীর নাম কি ?

আমি। সে অশ্রাব্য নাম তোমার শুনে কায নেই।

সে। কি নাম?

আমি। মেনি।

সে। না, তোমার মিছে কথা। মানুষের নাম কি মেনি হয়? ও ত বিড়ালের নাম। লালমুখো বাঁদরগুলোকেও মেনি-বাঁদর বলে।

আমি। সত্যিই তার ঐ নাম।

সে। আর তোমার মিথ্যা কথা বলতে হবে না। এস, জল-খাবার খাও!

এই বলিয়া, সদানন্দ সয়গালের প্রদত্ত হাঁড়ীটির মুখে যে সরা-খানি ছিল, তাহা আমার হাতে দিয়া, হাঁড়ির ভিতর হইতে উৎকৃষ্ট কচুরি ও ক্ষীরের মিঠাই বাহির করিয়া আমাকে খাইতে দিল। আমি তাহা আহার করিয়া, মুরাদাবাদের দুগ্ধ পান করিলাম। তাহার পর অপরাজিতা আহার করিল।

তাহার পর, গল্প করিতে করিতে আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। ভোর রাত্রে, লক্ষ্ণৌ আসিয়া, আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শিবাজীর তসবীর ও গুণ্ডার ভয়।

লক্ষ্ণৌয়ে গাড়ী চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করিবে।

আমরা হাত মুখ ধুইয়া, স্নান করিয়া লইলাম। আজ আর্সি ও বুরুষ হইয়া, গন্ধতৈল মাখিয়া নিজেই কেশবিন্যাস করিলাম।

কিছু খাদ্যদ্রব্য লইব কিনা অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"অমরা বেলা আটটার আগে রায়বেরিলিতে পৌছব। সেখানে গরম গরম ভাল লুচি পাওয়া যায়; সেইখানেই খাবার কিনলে চলবে।"

চামেলীর আতরের তীব্র গন্ধযুক্ত একটি অর্দ্ধ মলিন চাপকান পরিয়া, এবং মস্তকে একটি তৈলনিষিক্ত রঙ্গীন টুপি ধারণ করিয়া, এক মুসলমান ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবুজী, তসবীর কিনবেন? ভাল ভাল পুরাতন তস্‌বীর! আক্‌বর বাদশাহের তসবীর, জাহাঁগীর বাদশাহের তসবীর, নূরজাহাঁ বেগমের তস্‌বীর।" এই বলিয়া, সে আমাকে কতকগুলি চিত্র দেখাইল। চিত্রগুলি ছোট ছোট এবং দেশীয় চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত। আমি সেগুলি তাহার নিকট হইতে লইয়া, অপরাজিতাকে দেখাইলাম। অপরাজিতা একখানি চিত্র পছন্দ করিল সেখানি মহারাষ্ট্রপতি মহাবীর শিবাজীর চিত্র। আমি একটাকা মূল্যে ছবিখানি ক্রয় করিয়া কোটের পকেটে রাখিলাম।

তাহার পর ঠিক উপরি-উক্ত প্রকার চাপকান আদি পরিধান করিয়া, এক পুতুলওয়ালা আসিল। এক টাকায় ষোলটা পুতুল —ভিস্তি, সহিস্, চাপরাসী প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। অমরা পুতুল কিনিলাম না ;—অপরাজিতা বলিল যে পুতুল খেলার বয়স আর তাহার নাই। না কিনিলেও, পুতুলওয়ালা আমাদের সহিত কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাদের কি বাঙ্গলা দেশে বাড়ী ?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, আমার বাঙ্গালাদেশে বাড়ী।"

সে। বুঝি তীর্থভ্রমণে এসেছেন ?

আমি। হ্যাঁ।

সে। লক্ষ্ণৌ থেকে বোধ হয় কাশী যাবেন ?

আমি। হ্যাঁ।

সে। অনেক বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী, এই লক্ষ্ণৌ থেকে ফায়জাবাদ হয়ে অযোধ্যায় যায় ; পরে কাশী যায়। আপনারা বোধ হয় বোধ হয় অযোধ্যায় যাবেন না ?

আমি। না।

আমার সহিত আরও কিছু বাক্যালাপ করিয়া,সে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে, বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া, রায়বেরিলীর দিকে ছুটিল। সৌভাগ্যক্রমে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনেও আমাদের কামরাতে অন্য আরোহী আরোহণ করে নাই। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় নানারূপ প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। সে প্রেম আলাপের কতকটা তোমরা শুনিয়া লও।

অপরাজিতা জিজ্ঞাসা করিল—"ওগো গাজিয়াবাদনিবাসী, গাঙ্গুলী মশায়! তোমার সেই কালীঘাটওয়ালী মেনিটি দেখতে কেমন?"

আমি। অনেক বছর তাকে দেখিনি; এখন তার কি রকম শ্রী হয়েছে বলতে পারব না।

অপরাজিতা। যখন দেখেছিলে, তখন তার কেমন রূপ ছিল?

আমি। তখন তার বয়স মোটে সাত বছর। সাত বছরের মেয়ের আবার রূপ কি? তখন তার নতুন দাঁতও ওঠেনি।

অপরাজিতা। দন্তহীন রূপ রূপই নয়; সে রূপের কামড় নেই। এখন বোধ হয় তার দাঁত উঠেছে, আর সে কামড়াতেও শিখেছে। এখন তার বয়স কত?

আমি। এখন বোধ হয় তার আঠার কি উনিশ বছর বয়স হয়েছে। তোমার বয়স কত?

অপরাজিতা। ছি ছি! এমন কথা আর কখনও কোন কুলকামিনীকে জিজ্ঞাসা করো না। ভদ্রসমাজে স্ত্রীলোকের বয়স জিজ্ঞাসার প্রথা প্রচলিত নেই। তোমার এ প্রশ্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও মর্ম্মভেদী। আমাদের বয়স জানবার কারও অধিকার নেই।

আমি। আমি দু' দিন পরে তোমার দখলিকার হব, অতএব আমার সকল কথা জানবারই অধিকার আছে।

অপরাজিতা। কেবল বয়সটি জানবার অধিকার নেই।

আমি। তবু বল না, তোমার বয়স কত?

অপরাজিতা। আচ্ছা, তুমি একটা আন্দাজ কর।

আমি। আমার মনে হয়, তোমার বয়স কুড়ি বছর হয়েছে।

অপরাজিতা। ছি! ও কথা বলতে আছে? মেয়েমানুষ কুড়িতে পড়লেই যে বুড়ি হয়ে যায়। এ জন্যে মেয়েমানুষের বয়স কখনও কুড়ি বছর হয় না; উনিশ বছরের পর তাদের বয়স আর বাড়ে না।

আমি। আর যে মেয়ের বিয়ে না হয়, হিন্দুসমাজে তাদের বয়স বার বছর অতিক্রম করে না। কেবল তারা 'বাড়ন্ত' মেয়ে বলে', অল্প বয়সে বেশী হৃষ্টপুষ্ট হয়ে পড়ে।

অপরাজিতা। অতএব যতদিন আমার বিয়ে না হয়, ততদিন আমিও দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী; পশ্চিমের জল হাওয়া, আর আটা ঘিয়ে একটু বাড়ন্ত হয়ে পড়েছি। কেমন? আচ্ছা, তুমি বল্লে, তোমার মেনির বয়স উনিশ বছর। তার পর বল, তোমার সেই ফোকলা মেনির গায়ের রং কি রকম ছিল।

আমি। গৌর বর্ণ। কিন্তু তোমার মত সুন্দর নয়। তার গৌরবর্ণ শাদা ফুলের মত; তোমার গৌরবর্ণ বিদ্যুতের আলোর মত। তার চক্ষু বড় ছিল।

অপরাজিত। আমার চেয়ে?

আমি। বোধ হয় তোমার চেয়ে বড় ছিল। তার চোখ ভয় পাওয়া হরিণটির মত; তোমার চোখে হাসিখুসী দুষ্টামি ভরা; —ঐ চোখের কটাক্ষ বাণে আমি জর্জ্জরিত হয়েছি।

অপরাজিতা। আমাকেও তুমি কম জর্জ্জরিত কর নি।

আমি। পুরুষ কটাক্ষ হানে না।

অপরাজিতা। খুব হানে। গঙ্গাতীরে গাছতলায় বসে', যে গৃহস্থ মেয়ে স্নান করছে তাকে কটাক্ষ বাণে জর্জ্জরিত করে', শিব-পূজোর মন্ত্র ভুলিয়ে দেয়।

এইরূপ মধুর প্রেমালাপে সময়াতিবাহিত করিয়া, অতিসুখে আমরা বেলা আটটার সময় রায়বেরিলীতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া, খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ কালে, আমি চারজন আরোহীকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলাম। তাহারা আমাদেরই পার্শ্বের কামরা হইতে নামিয়া, আমার মত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, আবার গাড়ীতে উঠিল। লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত, ঐ কামরাতে চারিটা মুসলমান রমণী ও একটা প্রবীণ মুসলমান ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা লক্ষ্ণৌয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর এই চারি ব্যক্তি কখন ঐ কামরায় উঠিয়াছিল, তাহা আমি বা অপরাজিতা কেহই জানিতে পারি নাই। এই চারি ব্যক্তিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কারণ এই যে, তাহাদের চারিজনেরই পরিচ্ছদ ঠিক একরূপ। তাহাদের সকলেরই পরিধানে সাদা মোটা ধুতি; সকলেরই গাত্রে, মোটা সাদা জিন কাপড়ের লম্বা কোট, এবং সকলেই উত্তরীয়-বিহীন। তাহাদের দেহাকৃতিও প্রায় একরূপ। আরও দেখিলাম, লোকগুলির সহিত কোন প্রকার

মোট-পুটালি নাই। লোকগুলি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাইতেছে বুঝিতে পারিলাম না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, আহার করিতে করিতে আমার মনে সন্দেহের উদয় হইল। ঐ লোকগুলি একদল চোর নহে ত? অপরাজিতার অর্থ ও অলঙ্কারের সন্ধান পাইয়া, কৌশলে বা বলে তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদের সঙ্গ লইয়াছে না কি?

প্রতাপগড় ষ্টেশনে আসিয়া আমার ঐ সন্দেহটা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। দেখিলাম, গাড়ী হইতে নামিয়া, আমাদের কামরার দিকে তাকাইয়া, তাহারা চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতেছে। একবার একজন আমাদের কামরার খুব নিকটবর্ত্তী হইয়া, চকিত-নেত্রে কামরার ভিতরটা দেখিয়া লইল। অপরাজিতার কথা মত, প্রতাপগড়ের উৎকৃষ্ট পাণ কিনিবার জন্য, আমি একবার প্লাটফরমে অবতরণ করিলে, উহাদের একজন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাণওয়ালার নিকটে গেল; এবং আমার পাণ কেনা হইলে, আমারই সঙ্গে গাড়ীর দিকে আসিল। আমার একবার ইচ্ছা হইল যে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলাম এরূপ জিজ্ঞাসায় সত্য পরিচয় পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; বরং আমার সহিত আলাপ করিবার একটা সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

হরিদ্বারে আমার এক সহাধ্যায়ীর নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কাশীতে একদল দুষ্ট লোক বাস করে; ইহারা চুরি প্রবঞ্চনা ও শঠতা দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কখনও কখনও ইহারা

নরহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সংসারানভিজ্ঞ সরল তীর্থ-যাত্রিগণ ইহাদের উৎকৃষ্ট শিকার; নানারূপ কৌশলে ইহারা তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করে; কখন কখন তীব্র মাদক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্য আহার করিতে দিয়া, তাহাদিগকে জ্ঞানহীন করিয়া, তাহাদের ধনরত্ন নির্ব্বিঘ্নে অপহরণ করে। কখন কখন ইহারা বহুদূর হইতে, তীর্থযাত্রিগণের সঙ্গ লইয়া থাকে; এবং অত্যদ্ভুত চাতুরীজালে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া, তাহাদের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লয়; পরে ঐ সকল সংবাদের সহায়তায় তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। লোকে এই দুষ্টগণকে কাশীর গুণ্ডা বলে। গুণ্ডাগণের কীর্ত্তিকথা, কাশীধামে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

আমার আশঙ্কা হইল, এই চারিজন বুঝি বা কাশীর গুণ্ডা; উহারা অমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, লক্ষ্ণৌ হইতে আমাদের সঙ্গ লইয়াছে। কাশীতে যাইয়া, এই দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে কি প্রকারে আত্মরক্ষা করিব, তাহা ভাবিয়া আমি বিশেষ ভীত হইয়া পড়িলাম। আমি আমার ভয়ের কথা অপরাজিতাকে বলিলাম।

সে বলিল—“আমিও ওদের লক্ষ্য করেছি। আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। কাশীতে আমার অনেক আত্মীয় আছেন। এই ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনেই আমার এক কাকা কায করেন; তিনি অত্যন্ত চতুর;—কেউ তাঁকে ঠকাতে পারে না।”

আমি। তোমার এই সুচতুর কাকা যদি তোমার সঙ্গে

আমাকে দেখে ফেলেন, তাহলে, তিনি আমার পক্ষে কাশীর গুণ্ডার চেয়ে কম ভয়ঙ্কর হবেন না! লাঠি দিয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্কন্যা অপহরণের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবেন।

অপরাজিতা। তোমার কোন ভয় নেই; কাকা বা গুণ্ডা কেউই তোমার অনিষ্ট করবে না। কাকাকে তুমি জান না; তিনি ভারি মজার লোক। হয়ত, তুমি আমাকে নিয়ে এসেছ বলে, কত আহ্লাদ করবেন। আর, তিনি থাকতে গুণ্ডারা তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।

আমি। আমার কেশাগ্রের জন্যে আমার চিন্তা নেই। আমি ভাবছি, তোমার টাকাকড়ি তোমার অলঙ্কার কি করে' রক্ষা করব, কি করে এই নরঘাতকদের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করব! এদের পাল্লায় পড়লে তোমার কাকা কি একলা আমাদিকে রক্ষা করতে পারবেন?

অপরাজিতা আমার প্রশ্নের কি উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু আমার আর সে উত্তর শুনা হইল না।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আমি রাজদ্রোহের আসামী।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিত আমার শেষ প্রশ্ন আমি যখন অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, গাড়ী তখন বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী থামিবামাত্র, দুইজন কনেষ্টেবল আমাদের কামরার নিকটে আসিয়া, দরজার হাতল ঘুরাইয়া, হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি ?"

কনেষ্টেবল্‌দের দেখিয়া, অপরাজিতার মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল। সে ভয়চকিতনেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সেই চারজন গুণ্ডাকৃতি ব্যক্তিও কনষ্টেবল্‌দের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, তাহার কোটের পকেট হইতে একটি টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া, তাহা পাঠ করিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"পুরুষোত্তম সান্যাল ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পিতার নিকট তুমি তোমার কি নাম বলেছিলে ?"

বুঝিলাম সেই চারি ব্যক্তি কাশীর গুণ্ডা নহে, পুলিসের লোক। আরও বুঝিলাম, আমার অনিলকৃষ্ণ নামে পুলিশ নিশ্চয় কিছু মধুর-সন্ধান পাইয়াছে। বলিলাম—"নাম বলেছিলাম, অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি।"

"তুমি কাশী আসছ ;—অথচ, তাঁর কাছে বলেছিলে, ফায়জাবাদে যাচ্ছ। তোমার আসল বাড়ী কোথায় ?"

আমি স্থির করিলাম, আর মিথ্যা বলিব না। বলিলাম—"কলিকাতা, শ্যামবাজারে।"

"শ্যামবাজার, না শ্যামপুর ? ?"

"শ্যামবাজার।"

"ও একই কথা ; শ্যামবাজারও যা, শ্যামপুরও তাই।—তুমি রাজদ্রোহের আসামী ; তোমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে।"

আমি সহসা রাজদ্রোহের আসামী হইয়া, হতভম্ব হইয়া পড়িলাম ; এবং অপরাজিতার কাতর দৃষ্টি অবলোকন করিয়া, মনোমধ্যে বিলক্ষণ ব্যথা অনুভব করিলাম। কি বলিব, কি করিব, ঠিক করিতে না পারিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

উহারা গাড়ীর দরজা খুলিয়া আমাকে বলপূর্ব্বক গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। এবং দুইজন, দুই দিক হইতে আমার হস্তধারণ করিলে, অপর দুইজন আমার জামার পকেট ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিল ;—দেখিল কোথাও কোন দ্রব্য লুক্কায়িত আছে কি না। বলাবাহুল্য, উহারা কোন দ্রব্যই প্রাপ্ত হইল না। কেবল, আমার পকেট হইতে, শিবাজীর ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ও সেই ন্যাসপাতি কাটা ছুরিখানা গ্রহণ করিল। তাহার পর, উহারা আমার নিকট ট্রাঙ্কের চাবি চাহিল। আমি বলিলাম—"ওর চাবি আমার কাছে নেই ; বাক্স আমার নয়।"

যেখানে দাঁড়াইয়া পুলিসের লোক আমাকে উপরি-উক্ত প্রকারে

লাঞ্ছিত করিতেছিল, তাহার চারিদিকে একটি দুইটি করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহারা আমাকে ও পুলিসের লোককে এরূপভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অপরাজিতা গাড়ীর যে কামরায় বসিয়া ছিল, তাহা আমাদের দৃষ্টিপথের সম্পূর্ণ অন্তরালে পড়িয়াছিল। সেখানে আমার আকস্মিক বিপদ ও অযথা লাঞ্ছনা দেখিয়া অপরাজিতা কি করিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই; বুঝিতেও পারি নাই।

ট্রাঙ্কের চাবি সম্বন্ধে আমার উত্তর শুনিয়া, পুলিসের লোক বলিল—"ট্রাঙ্কের ভিতর কি আছে, তাহা আমাদের দেখিতেই হইবে। চাবি না পাইলে, অগত্যা উহা ভাঙ্গিয়া দেখিব।"

সমবেতগণের মধ্যে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক সাহস পূর্ব্বক বলিলেন—"ট্রাঙ্ক অন্য লোকের,—স্ত্রীলোকের; তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নাই; তাহার জিনিষ তোমরা কেন ভাঙ্গিয়া খানাতল্লাসী করিবে?"

পুলিস চোখ ঘুরাইয়া বলিল—"তুমি কে? সন্দেহ হইলে, আমরা যে কোনও লোককে গ্রেপ্তার করিতে পারি, যে কোনও লোকের বাক্স খুলিয়া দেখিতে পারি। তুমি আমাদের উপর কথা চালাইবার কে? তুমি আমাদের কাযে বাধা দিলে, আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিব।"

ভদ্রলোকটির সুবুদ্ধি বোধ হইল,—আত্মানং সততং রক্ষেৎ—এই অতিবৃদ্ধ, বিজ্ঞ সংস্কৃত উপদেশটি তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ ছিল। তিনি আর উচ্চবাচ্য না করিয়া, নিম্নস্বরে আর একজন বাঙ্গালী

ভদ্রলোককে বলিলেন—"এই পুলিশের অত্যাচারে দেশের সর্ব্বনাশ হবে।" এই বলিয়া, তিনি অদৃশ্য হইলেন।

তখন পুলিস বীরদর্পে জনতাভেদ করিয়া, অপরাজিতার ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু কামরার নিকটে যাইয়া, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহারা অপরাজিতা বা ট্রাঙ্ক কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহারা অন্য কামরা অনুসন্ধান করিল; আমাকে সঙ্গে লইয়া, গাড়ীর প্রত্যেক কামরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, এবং প্ল্যাট্‌ফরমের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইল; কিন্তু অপরাজিতা বা তাহার ট্রাঙ্কের কোন সন্ধানই পাইল না।

অপরাজিতা ও ট্রাঙ্কের অনুসন্ধানে পুলিশ ব্যর্থমনোরথ হইলে, প্রথমটা আমার মনে একটু আহ্লাদের সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু অনুসন্ধানের উত্তেজনা একটু প্রশমিত হইবার পরেই আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাকে বিপদে ফেলিয়া সে আপন ইচ্ছায় কখনই পলায়ন করে নাই। নিশ্চয় সে অর্থ ও অলঙ্কারসহ, কোন দুষ্ট কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে; কাশীতে এরূপ দুষ্টের অভাব নাই! মহা আশঙ্কায়, বাত্যাবিতাড়িত সাগরোর্ম্মির ন্যায়, আমার হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল; সে আন্দোলনের আঘাতে, আমার বক্ষপঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। চিন্তায় মস্তক মধ্যে যেন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। হায় হায়, এতদূরে আসিয়া, তাহাকে হারাইলাম! কূলে আসিয়া আমার সুখতরী ডুবিয়া গেল!

অপরাজিতার ভাবনায়, আমি নিজের বিপদের ভাবনা ভুলিয়া গেলাম। কে তাহাকে হরণ করিল? কোথায় সে? তাহাকে না দেখিয়া, আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। যদি পুলিসের অত্যাচারিগণ দৃঢ়বলে আমার হস্তধারণ করিয়া না থাকিত, তাহা হইলে, আমি পথে পথে ছুটিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতাম; তাহার অন্বেষণে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতাম; সাগর মথিত করিয়া দেখিতাম, কোথায় আমার সেই সাগরছেঁচা মাণিক লুক্কাইত আছে।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যখন পুলিস অপরাজিতার ট্রাঙ্কের সন্ধান পাইল না, তখন তাহারা আমাকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানাখানি দেখাইয়া বলিল—"চল, তোমাকে থানায় যাইতে হইবে।"

আমি পরওয়ানাখানি দেখিলাম। চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঐ পরওয়নাতে সহি করিয়াছেন। উহাতে শ্যামপুর নিবাসী অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম আছে। মজ্জমান ব্যক্তির নিকট তৃণ যেমন, তেমনই ক্ষুদ্র একটু আশাবলম্বন করিয়া, আমি বলিলাম—"আমার বাড়ী শ্যামপুর নয়,—শ্যামবাজার।"

পুলিশ পূর্ব্বের ন্যায় বলিল—"তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; শ্যামপুর শ্যামবাজার একই কথা। চল, থানায় চল।"

আমি বলিলাম—"আমার সহিত একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, আমি তোমাদের সহিত যাইব না।"

আমার কথার প্রত্যুত্তরে, সেই গুণ্ডাকৃতি চারিজনের মধ্যে একজন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া, কি একটা অশ্লীল কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথা, তাহার বর্ব্বর মুখবিবর হইতে সম্পূর্ণ নির্গত হইবার পূর্ব্বেই, আমি তাহার বাক্য-রোধ করিলাম। আমাকে যাহারা ধরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের কবল হইতে এক উন্মত্ত উত্তেজনায় মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাকে মুক্ত করিয়া, আমি সবেগে তাহার মুখে চপটাঘাত করিলাম। বাবাজীর মল্লক্রীড়া-ক্ষেত্রে আমার করতল যে বললাভ করিয়ছিল, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, বর্ব্বর ধূলিবিলুণ্ঠিত হইল।

ইহার ফল যাহা হইবার, তাহাই হইল। পরক্ষণেই আমি ছয়জন কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম এবং প্রহৃত হইলাম। পুনরায় আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া, সমবেত অনেক বাঙ্গালী সবেগে অগ্রসর হইয়া, পুলিশকে তিরস্কৃত করিলেন এবং মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কেহ লগুড়, কেহ বেত্র, কেহ ছত্র উদ্যত করিয়া পুলিশের দিকে ধাবিত হইলেন। একটা মারামারি ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া পড়িল।

সে জনসংখ্যার সম্মুখে, পুলিস আপনাদের অক্ষমতা বুঝিয়া, আমাকে লইয়া ত্বরিতপদে প্লাটফরমের বাহির হইয়া পড়িল। তথায় তাহারা গাড়ীভাড়া করিল; এবং আমাকে নিগড়বন্ধনে নিপীড়িত করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া থানার দিকে ধাবিত হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মাতাল নয়,—খুড়শ্বশুর।

থানাবাড়ীর বারান্দায়, আরাম চৌকিতে বসিয়া, সটকার দীর্ঘ নলের রজত-নির্ম্মিত মুখনলটিতে মুখ লাগাইয়া, নিমীলিত নেত্রে দারোগা বাবু ধূমপান করিতেছিলেন। দেখিলাম, তিনি দা-রোগা বটেন, কিন্তু রোগা নহেন। তাঁহার দেহের আয়তন অতি বিপুল। এতদ্দেশীয় মাতঙ্গগণ সে বিপুলাঙ্গের তুলনা নহে; সে দেহের তুলনা করিতে হইলে, উত্তর মহাসাগর হইতে তিমি নামক মৎস্যের আমদানি করিতে হয়। থাক,—এখন এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। অপরাজিতার বিরহে, পুলিসের প্রহারে, আমি এখন বড়ই জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

নাসিকারন্ধ্র হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি ধীরে ধীরে উদ্গিরণ করিয়া স্তিমিতনেত্রে দারোগা বাবু আমার প্রহরিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কলিকাতা আলিপুরের আসামী?"

তাহারা বলিল—"হাঁ।"

তখন দারোগা বাবু আমাকে রাত্রের জন্য হাজত ঘরে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ দিলেন। ইহা জেলখানার হাজত নহে; থানাগৃহেরই একটি ঘর।

আমি হাজত ঘরে প্রবেশ করিলে প্রহরীরা আমার নিগড়-

বন্ধন খুলিয়া লইল। মুক্ত হইয়া, সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে আমি দেখিলাম, হাজত ঘরের ভিত্তিগুলি আলকাৎরার দ্বারা কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত; এবং ঐ ঘরে কয়েকখানি লৌহনির্ম্মিত খট্টায় কৃষ্ণবর্ণ কম্বলের বিছানা বিস্তৃত রহিয়াছে। আমার জন্য একটি বিছানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রহরীরা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, ষ্টেশনে সেই মারামারির কথাটা প্রহরীরা যুক্তিপূর্ব্বক গোপন করিয়াছিল।

আমি বিছানায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কিরূপে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাইব; উদ্ধার পাইয়া কিরূপে অপরাজিতার সন্ধান পাইব; অপরাজিতার সন্ধান না পাইলে, কিরূপে জীবন-ধারণ করিব! মহা দুঃখে আমার চোখ ফাটিয়া জলধারার পর জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মানুষ যখন নিরুপায় হইয়া পড়ে, তখন সে ভগবানকে মনে করে। মনে করে, তাঁহাকে কাতরকণ্ঠে ডাকিলে, তিনি নিরুপায়ের সহায় হন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে ডাকিলাম—"হে ভগবান! হে দয়াময়! আমাকে অনন্ত বিপদে নিক্ষেপ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কেবল আমার অপরাজিতাকে অনাহত রাখিও। কেবল বলিয়া দাও, কোথায় অপরাজিতা। অপরাজিতা কোথায়? হরি, মধুসূদন, তোমার দয়াময় নাম সার্থক কর; বল, কোথায় অপরাজিতা?" কাঁদিতে কাঁদিতে, ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে অবসন্ন হইয়া কম্বলশয্যায় শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম, স্মরণ নাই। কারাগারের দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ শুনিয়া, উঠিয়া বসিলাম। ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে আশা জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, ভগবান সত্যই দয়াময়; তিনি আমার কাতর প্রার্থনা অবহেলা করিতে পারেন নাই; আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য দেবদূত পাঠাইয়া দিয়াছেন। দেখিলাম, দেবদূতের হাতে হারিকেন লণ্ঠন এবং তাহার পশ্চাতে অন্য এক ব্রহ্মদূত গলায় উপবীত ঝুলাইয়া, হস্তে একটা পাত্র বহন করিয়া আনিয়াছে। আমি যে উদ্ধারের আশায় অভিভূত হইয়াছিলাম, তাহার নেশা কাটিয়া গেলে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে ব্যাপার আর কিছুই নয়;—ব্রাহ্মণ পাচক আমার জন্য রাত্রের আহার লইয়া আসিয়াছে—হালুয়া, রুটি!

বিছানা হইতে উঠিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলাম, এবং অতি পিপাসা নিবারণার্থ, যথেষ্ট জলপান করিয়া বিছানায় আসিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। দ্বাররক্ষক দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। কক্ষে পুনরায় ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে বিছানায় পড়িয়া,—আশ্চর্য্যের বিষয়—এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। বোধ হয়, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আমি নিদ্রিত ছিলাম।

তাহার পর, আবার দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে আমার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম, মুক্তদ্বারে তিনজন প্রহরী, একজন ভদ্রবেশী শ্মশ্রুমুখ বাঙ্গালীকে ধরিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালী বাবুটি টলিয়া পড়িতেছেন। প্রহরীরা অতিকষ্টে তাঁহাকে

সংযত রাখিয়াছে। দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনি মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে সংজ্ঞাশূন্য হওয়ায় প্রহরীরা তাঁহাকে রাজপথ হইতে ধরিয়া আনিয়াছে। অনেক চেষ্টার পর, প্রহরীরা কোনক্রমে তাঁহাকে আমার খট্টার নিকটবর্ত্তী অন্য এক খট্টায় শায়িত করিল; পরে নানারূপ হাস্য কৌতুক করিতে করিতে, কারাদ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর, কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত থানাগৃহ নিঝুম অন্ধকারে নীরবে ঘুমাইয়া পড়িল। পৃথিবী জনকোলাহলমুক্ত হইয়া, অত্যন্ত নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। আমি কিন্তু বিনিদ্র থাকিয়া চারিদিকে নিরাশার ঘোর অন্ধকার অবলোকন করিতে লাগিলাম!

কিয়ৎকাল এই ভাবে অতীত হইবার পর, সহসা আমার শায়িত দেহের উপর একটা গুরুভার দ্রব্য পতিত হওয়ায়, আমি চমকাইয়া উঠিলাম। হস্তচালনা করিয়া অনুমনে বুঝিলাম, একটা লোক আমাকে ঘেঁষিয়া আমার শয্যায় আসিয়া শুইয়াছে। লোকটার গাত্র হইতে সুরার তীব্র গন্ধ নির্গত হওয়ায়, আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে পার্শ্ববর্ত্তী শয্যা হইতে নেশার ঘোরে, মাতালটা আমার বিছানায় আসিয়া শুইয়াছে। আমি তাহাকে ঠেলিয়া, আমার শয্যা হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু লোকটা নড়িল না; আমার শয্যায় শুইয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি বলছ?"

মাতাল বলিল—"খ—খব্—খবদার।"

আমি। কি?

মাতাল। আমি, আমি; খবরদার আমাকে অপমান কর না। আমাকে খাতির করবে; আপনি মহাশয় বলবে। আমি কে জান?

আমি। না, কে তুমি?

মাতাল। আবার 'তুমি'?—বল, 'কে আপনি?'

আমি। কে আপনি?

মাতাল। তোমার বাবা।

আমি। কেন অকারণ গালি দিচ্ছেন? আপন বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকুন।

মাতাল। আমার নাম কি জান?

আমি। কি?

মাতাল। মহাদেব।. শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়, আসিণ্টাট ষ্টেশন মাষ্টার, বেনারস্ ক্যাণ্টমেণ্ট ষ্টেশন। মহাদেব কার্ত্তিকের কে?

আমি। বাবা।

মাতাল। তা হলে আমি তোমার বাবা হলাম কি না?

আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, লোকটা সত্যই মাতাল কি না। ঠিক, ইহার কথায় ত আর কোন প্রকার জড়তা নাই। এ ব্যক্তি আমার হরিদ্বারের নামটি কিরূপে জানিল? বিস্ময়ে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কে?"

মাতাল। আমার যথার্থ পরিচয় এই যে, আমি মাতাল নই; মাতলামী আমার ভান মাত্র। আমি মহাদেব; আমি কার্ত্তিকের সন্ধানে বেরিয়েছি।

আমি। সন্ধান পেয়েছেন?

তিনি। এই যে কার্ত্তিক বাবাজী আমার পাশেই শুয়ে রয়েছেন।

আমি। আমার নাম আপনি কি করে' জানলেন?

তিনি। বাবাজীর নাম, ধাম, গুণপণা,—মহাদেবের কিছুই অবিদিত নেই।

আমি। আমার কি গুণপণা জানেন?

তিনি। সমস্ত।

আমি। আমি হঠাৎ কি করে' রাজদ্রোহী হলাম, বলতে পারেন?

তিনি। শোন। আমি দু' তিন ঘণ্টাকাল অনুসন্ধান করে' যা জানতে পেরেছি, তা সমস্তই তোমাকে বলব। তা বলবার জন্যেই, আমি মাতাল সেজে ধরা দিয়ে, কৌশলে এই হাজত ঘরে এসেছি। নতুবা আমার চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনও মাতাল হয় নি। যদি পারতাম, আজ রাত্রেই তোমার উদ্ধার করতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এজন্য সেই অসম্ভব কাযের চেষ্টা করব না। সোজা পথেই তোমাকে উদ্ধার করব।

আমি। কেন আমার জন্য এত করবেন? আপনি আমার কে?

তিনি। আমি তোমার পিতা না হলেও, পিতৃস্থানীয়। কিন্তু আমার পরিচয় পরে দেব। এখন, তোমার বিপদটা কি রকম তাই আগে বলব।

আমি। যদি তা জানতে পেরে থাকেন, আমাকে বুঝিয়ে দিন।

তিনি। কলকাতার পূর্ব্বদিকে, মুঁড়োর দক্ষিণে, শ্যামপুর গ্রাম। সেই গ্রামে, একটি বাড়ীতে কয়েকটি দরিদ্র বালক বাস করে' শিয়ালদহের এক স্কুলে পড়ত। এই দরিদ্র বালকদের উপর পুলিসের একটু নজর পড়লো ;—কলকাতায় এত বাড়ী থাকতে, এরা এই নির্জ্জন পল্লীতে এসে বাস করছে কেন? পুলিস উপরিওয়ালাকে রিপোর্ট কল্লে যে একদল রাজদ্রোহী বালক ঐ বাড়ীতে বাস করছে ; সংবাদ পাওয়া গেছে যে তারা গীতা পড়ে, যুগান্তর পড়ে ; তাদের কাছে অনেক অস্ত্র শস্ত্রও আছে। পুলিস যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নয়, তা প্রমাণ করা ছাড়া ঐ রকম রিপোর্ট দেবার আর অন্য কারণ ছিল না। রিপোর্ট পড়ে উপরিওয়ালারা হুকুম দিলেন, পাকড়াও। কিন্তু সেই ছেলেরা সুচতুর ; তারা পুলিসের গুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝলে। তার পর, তাদিকে পাকড়াও করা সম্ভব হল না। সে বাড়ীতে তের জন লোক বাস করত ; পুলিস কোঁমর বাঁধতে না বাঁধতে, তারা সকলেই পালাল ; পুলিসের লোক একটি লোককেও ধরতে পারলে না। যে যে জমাদর আর পাহারাওয়ালাদের উপর এ কর্ম্মের ভার ছিল, তারা ভাবলে, তাদের এই অকর্ম্মণ্যতার জন্যে তাদের

কর্ম্ম যাবে, তাই তারা পল্লীবাসী তিনজন নিরীহ লোককে, আর তাদের পরিচিত এক পাণওয়ালাকে রাজসাক্ষী করে' চালান দিল; আর রিপোর্ট করলে যে ঐ বাড়ীতে মোট পাঁচজন লোক বাস করত, তাদের মধ্যে ঐ চারজন ধরা পড়েছে; আর বাকী একজন পালিয়েছে, রাজসাক্ষীর কাছে জানতে পারা গেছে যে তার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, আর তার বাপের নাম অজানিত। এই কাল্পনিক অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলিকে ধরবার জন্যে, হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে' দেশে দেশে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

আমি। কাল মুরাদাবাদ ষ্টেশনে একখানি খবরের কাগজ কিনেছিলাম, তাতে আলিপুর আদালতের সংবাদে, ঐ রকম এক মোকর্দ্দমার কথা পড়েছিলাম। কিন্তু তাতে পলাতক আসামীর নাম লেখা ছিল না। তা লেখা থাকলে, আমি ঐ নাম গ্রহণ করতাম না, আর অকারণ আমার এই কষ্টভোগ ঘটত না।

তিনি। শুনলাম, তুমি শাহজাহান্‌পুরের ডেপুটী বাবুর বাপের কাছে ঐ নাম বলেছিলে। কেন বলেছিলে, জানি নে;—একেই বোধ হয়, লোকে বিধিলিপি বলে। ডেপুটী বাবু তোমার ঐ নাম শুনে, গাড়ী থেকে নেমেই নানাস্থানে তার করেছিলেন। তার ফলে, পুলিস তোমাকে লক্ষ্ণৌ থেকে নজরবন্দিতে এনেছিল।

আমি। পুলিসের লোক কি করে' বুঝল যে ঐ নাম আমিই বলেছি?

তিনি। অতি সহজে। প্রথমতঃ ডেপুটী বাবু যে তার করেছিলেন, তাতে লেখা ছিল যে তোমার সঙ্গে একটা বড়

ট্রাঙ্ক আছে, একজন স্ত্রীলোক আছে। পরে লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে, এক পুতুলওয়ালাকে দিয়ে, পুলিস তোমার কোন কোন সংবাদ সংগ্রহ করেছিল। ঐ সংবাদে, ঐ ট্রাঙ্কে, আর ঐ স্ত্রীলোকে পুলিস তোমাকে চিনে ফেলেছিল।

আমি। ঐ স্ত্রীলোক কোথায়? আপনি যখন এত খবর জানেন, তখন অবশ্য তার খবরও জানেন। সে কোথায়? আমি তার জন্যে বড়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।

তিনি। ব্যাকুল হবারই কথা। তোমার ব্যাকুলতা নিবারণের জন্যেই, ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে শুঁড়ীর দোকানে ঢুকে, আধ বোতল মদ নিয়ে কাপড়ে চোপড়ে মেখেছিলাম; আর ধরা পড়বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে, বোতলটি মাথায় দিয়ে রাস্তার ধূলায় শুয়ে ছিলাম। সেও তোমার জন্যে কেঁদে আকুল হয়েছে।

আমি। তাকে আপনি দেখেছেন? বলুন, কোথায় সে?

তিনি। সে আমার ষ্টেশনের কোয়ার্টারে, তার খুড়ীর কাছে শুয়ে আছে।

আমি মনে মনে ডাকিলাম, "জয় জগন্নাথ! তুমি যথার্থ পতিত-পাবন। তুমি যথার্থই বিপন্নের কাতর প্রার্থনা শুনিতে পাও; শুনিয়া তোমার অচিন্তনীয় উপায়ে, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তোমার জয় হউক! আমি যেন আর কখনও তোমার করুণায় অবিশ্বাস না করি।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাজিতার সংবাদ।

অন্ধকারে, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, অবনত মস্তকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে মহাদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি করে' তার সন্ধান পেলেন?"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া, কি জানি কেন, মহাদেব বাবু সহসা কিছু উত্তর প্রদান করলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বোধ হয়, কিছু ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি অপরাজিতার কে, তা কি তুমি কখন তার মুখে শুনেছ?"

আমি বলিলাম—"আজ গাড়ীতে সে আমাকে বলেছিল যে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে তার এক কাকা কায করেন।"

মহাদেব। আমিই সেই কাকা।

আমি। আপনি কি করে' জানলেন যে আজ সে কাশীতে আসবে?

মহাদেব বাবু। আমার স্ত্রী, অর্থাৎ তোমার ভাবী খুড়শ্বাশুড়ী, মাঝে মাঝে অপরাজিতার পত্র পেতেন। ইতিপূর্ব্বে অপরাজিতা তাঁকে লিখেছিল যে, সে শীঘ্র কাশীতে আসবে। কিন্তু সে যে ঠিক আজই আসবে তা জানতাম না।

আমি। তবে আপনি কি করে' তার সন্ধান পেলেন?

মহাদেব বাবু। আমি ষ্টেশনে ডিউটিতে ছিলাম। প্লাটফরমে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম, একস্থানে জনতা। এই জনতার মধ্যে তোমাকে দেখলাম। কিন্তু তখন ত তোমাকে আমার ভাবী জামাতা বলে' চিনতাম না। মনে করলাম, তুমি কোন ফেরারী আসামী, পুলিস তোমাকে পাকড়াও করেছে। এ রকম ব্যাপার নতুন নয়; মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কাযেই মনোযোগ না দিয়ে, অগ্রসর হলাম। দু' পা অগ্রসর হতে না হতে দেখলাম, গাড়ীর একটা কামরার দরজা খোলা; আর তার মধ্যে অপরাজিতা বসে কাঁদছে। আমাকে দেখে সে আরও কেঁদে উঠল। আমি তাকে সান্ত্বনা করে' তার মুখে ঘটনাটা মোটামুটি বুঝে নিলাম।

আমি। সে আপনাকে কি বল্লে?

মহাদেব বাবু। সে বল্লে, তুমি তাকে বিয়ে করবে বলে, হরিদ্বার থেকে হরণ করে এনেছ। বুঝলাম, বাবাজীর চরিত্রটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়।

আমি। কেন?

মহাদেব বাবু। অন্ততঃ একটা বিষয়ে ঠিক মিল আছে।

আমি। কিসে?

মহাদেব বাবু। রুক্মিণীহরণে।

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম, আমার খুড়শ্বশুরটি মন্দ হইবেন না, বেশ রসিক লোক। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হরণ করায়, আমার প্রতি বিরক্ত না হইয়া, বরং তাহা লইয়া আমার সহিত কৌতুক করিতেছেন। আবার মাতাল সাজিয়া হাজতে

আমার সহিত সাক্ষাৎ করায়, তাঁহার চতুরতাও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। অল্পকাল নীরব থাকিয়া আমি তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম—"সে আর কি বল্লে?"

মহাদেব বাবু। সে আর বেশী কিছু বলে নি। কেবল তোমার এই আকস্মিক বিপদে ব্যাকুল হয়ে, কাঁদতে লাগল; আর আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'কাকা, কি হবে?' তাহার কাতরতা দেখে বুঝলাম, মার আমার পতিভক্তিটা বিয়ের আগেই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত হয়েছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লাম, মা, তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, দিনকতক বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখ; আমরা সহজেই বাবাজীকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে' আনব; তখন এখানে এনে, আমি নিজেই তার থেকে তোমাকে সম্প্রদান করব। তুমি কেঁদো না।

আমি। তার পর?

মহাদেব বাবু। তার পর আর কি? একটা খালাসীকে ডেকে, ট্রাঙ্কটা তার মাথায় তুলে দিয়ে বল্লাম, "যা, গাড়ীর উল্টো দিকের দরজা খুলে, একে আমার বাসায় পৌঁছে দে।" আরও এ ব্যাপারটা অপ্রকাশ রাখবার জন্যে, তাকে বিশেষ সতর্ক করে দিলাম। তারা চলে' গেলে, উল্টো দিকের দরজাটা বন্ধ করে, গাড়ী থেকে নেমে প্লাটফরমে আবার পায়চারি করতে লাগলাম।

আমি। সে আপনার বাড়ীতে গিয়ে আর কাঁদে নি ত?

মহাদেব বাবু। না, তবে, তোমার সংবাদ পাবার জন্যে, আর তার সংবাদ তোমাকে দেবার জন্যে, আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। আমি তার কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, কাল প্রাতঃকালের মধ্যে আমি তাকে সমস্ত সংবাদ দেবো।

আমি। তা কি করে' দেবেন? মাতাল হওয়ার জন্যে, কাল দশটার পরে ত আপনাকে আদালতে হাজির করবে।

মহাদেব বাবু। না, সে রকম কিছু ঘটবে না। আমার এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক আছে, তিনি কাল সকালেই এসে, জামীন হয়ে আমকে নিয়ে যাবেন। যে দিন মকর্দ্দমা উঠবে, সেই দিন আদালতে হাজির হয়ে, অপরাধ স্বীকার করে, দু' টাকা জরিমানা দিয়ে এলেই চলবে।

আমি। আমাদের জন্যে আপনি অকারণ লাঞ্ছনা ভোগ করছেন।

মহাদেব বাবু। চুপ কর; তুমি কি শুনলে না যে অপরাজিতা আমর ভাইঝী? আমাদের আর ছেলেমেয়ে নেই; অপরাজিতাই অমাদের সব। তার জন্যে, তোমার জন্যে, আমি বেশী আর কি করলাম? তুমি জান না, এ কাযে আমি এতটুকু লাঞ্ছনা ভোগ করব না; বরং পরম সুখ উপভোগ করব।

আমি। অপরাজিতা যে কাশীতে এসেছে, আর নির্ব্বিঘ্নে আপনার বাসাতে আছে, এ কথা কি আপনি তার করে' তার বাবাকে জানিয়েছেন?

মহাদেব বাবু। তার জন্যে কোন চিন্তা নেই; সে সব আমি ঠিক করে নিয়েছি।

আমি। তাঁর অনুমতি না নিয়ে তাঁদের মেয়েকে গোপনে এনে আমি কি অন্যায় কাযই করেছি!

মহাদেব বাবু। বাবাজী, তুমি দুঃখ করো না। তুমি বেশ কায করেছ। তাঁরা অত বড় মেয়েকে আইবুড় রেখেছিলেন কেন? এরূপ স্থলে, হরণে কোন পাপ নেই। আর দেখ বাবাজী, এই হরণ প্রথাটা অতি সনাতন প্রথা। রাবণ রাক্ষস, সীতাহরণ না করলে, বাল্মীকি মুনি রামায়ণ লিখতেন না;—পৃথিবী রামায়ণ পাঠে বঞ্চিত হত। আর দেখ, মহাভারতেও রুক্মিণীহরণ, সুভদ্রাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি ভাল ভাল হরণের কথা মহামুনি ব্যাসদেব লিখে গিয়েছেন। এ তুমি বেশ কায করেছ। এখন এই ক্ষণিক বিপদ থেকে তোমাকে কোনও গতিকে উদ্ধার করতে পারলেই, আমি নিজেই কন্যাকর্ত্তা হয়ে এই খানেই তোমার বিয়ে দেব। জেনে রেখ বাবাজী, অপরাজিতার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবই দেব; তবে দু' দিন এ দিক্ বা দু'দিন ও দিক।

ভাবী খুড়শ্বশুরের প্রতি পূর্ব্বেই আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল; এক্ষণে তাঁহার শেষোক্ত সুমিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া, তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা হইল। আমি গাড়ীতে বসিয়া ভাবিয়াছিলাম, ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ইনি আমাকে লগুড়-লাঞ্ছিত করিবেন। কৈ, ইনি ত আমাকে সামান্য একটি রূঢ়

কথাও বলিলেন না; বরং বলিলেন বেশ করিয়াছ! তাঁহার মধুর কথায় আমি সমস্ত বিপদ ভুলিয়া গেলাম।

তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"এখন বাবাজী, তোমার এই বিপদটুকু থেকে যাতে সহজে তোমাকে মুক্ত করতে পারা যায়, তারই উপায় ভাবতে হবে। তা', সে কাযটা আমরা সকলে মিলে, অতি সহজেই করতে পারব। সে বিষয়ে তোমার কোন ভাবনা নেই।"

আমি বলিলাম—"অপরাজিতা নিরাপদে আছে, এ সংবাদ যখন পেয়েছি, তখন আমার নিজের জন্যে কোন ভাবনা নেই। আর শ্যামপুরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যখন আমার কোন সম্বন্ধই নেই, তখন বিচারক কি করে' দণ্ডবিধান করবেন?"

মহাদেব বাবু কহিলেন—"বিচারক সাক্ষীর মুখে যা শোনেন, তাই থেকেই তাঁর মতামত নির্দ্ধারিত হয়। কাযেই আমাদের কতকগুলি এমন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে, যাদের কথায় বিচারক সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন। এই রকম সাক্ষী, আর একটি সুবুদ্ধি উকীল—ব্যস—তা হলেই একবারে কেল্লা ফতে। ইংরেজ বিচারকের কাছে যদি একটা ইংরেজ সাক্ষী হাজির করতে পারা যায়, তা হলে সোণায় সোহাগা হবে।"

আমি। কোথায় আমার বিচার হবে?

মহাদেব বাবু। আলিপুরে বা কলকাতার কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে।

আমি। কবে?

মহাদেব বাবু। আসছে কাল এরা তোমাকে নিয়ে মোগল-সরাই যাবে ; সেখানে একটার গাড়ী ধরবে। পরদিন সকালবেলা হাওড়া পৌছবে ; আর সেইদিনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তোমাকে হাজির করবে। ম্যাজিষ্ট্রেট তোমাকে হাজতে রাখবার হুকুম দিলে, ওরা তোমাকে জেলখানার হাজতে রাখবে। পরে যেদিন মোকর্দ্দমার দিনস্থির হবে, সেইদিন তোমাকে আবার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির করবে। তখন তোমার দোষাদোষ সম্বন্ধে বিচার হবে।

আমি। আমার পক্ষে কোন্ ইংরাজ সাক্ষী দেবে ? সেখানে কোনও ইংরাজের সঙ্গে ত আমার পরিচয় নেই।

মহাদেব বাবু। সে আমরা ঠিক করে নেব। সে তোমার কিছু ভাবনা নেই। এখন ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে কাল তোমায় একটা কায করতে হবে।

আমি। আমার হাতে হাতকড়া থাকবে বলে বোধ হয়। বাঁধা হাত নিয়ে আমি কি কায করতে পারব ?

মহাদেব বাবু। অপরাজিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

আমি। তা কি করে' সম্ভব হবে ?

মহাদেব বাবু। আমি মহাদেব, আমি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি। কাল আমার খেলাটা দেখতে পাবে।

আমি। কি খেলা খেলবেন ? সেখানে পুলিসের লোক আপনাকে এই রাত্রের মাতাল বলে যে সহজেই চিনতে পারবে।

মহাদেব বাবু। রামচন্দ্র ! একেবারেই নয়। এখানে আমি

গোঁপদাড়িওয়ালা, ধুতিচাদর পরা রামলাল দত্ত; জাতি সুবর্ণ বণিক; তীর্থদর্শনে এসেছি; সেই উকীল বন্ধুর বাড়িতে অতিথি। ষ্টেশনে আমি গোঁপদাড়ি শূন্য, কোট প্যাণ্টালুন পরা মহাদেব; তার উপর মাথায় ষ্টেশন মাষ্টারের টুপি, চোখে চশমা;—কার বাবার সাধ্য যে আমাকে চিনতে পারে? তার পর, যারা রাত্রে আমাকে ধরেছিল, তারাই যে তোমাকে নিয়ে ষ্টেশনে আসবে, এমন বিবেচনা করবার কোন কারণ নেই। না বাবাজী, এখানকার কোন লোক সেখানে আমাকে চিনবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও। আমিও আমার বিছানায় গিয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখি।

এই বলিয়া, মহাদেব বাবু উঠিয়া আপন বিছানায় গেলেন। আমিও অপরাজিতার পুনর্দ্দর্শন পাইবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

শিউগোলাপ সিং, রামভরত লুনিয়া ও আলুলায়িত কুন্তলা অপরাজিতা।

পরদিন সকালবেলা ছয়টার সময়, প্রহরীরা আসিয়া মহাদেব বাবু ও আমাকে মুখ হাত ধুইবার স্থানে লইয়া গেল। সেই স্থান হইতে আনীত হইয়া, আমি আবার কারারুদ্ধ হইলাম। কিন্তু মহাদেব বাবু আর কারাকক্ষে ফিরিলেন না। তাঁহার বন্ধু আসিয়া তাঁহার কল্পিত নাম ধাম লেখাইয়া এবং নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া, তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। আমি কারাকক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই এই ঘটনা দেখিয়া গিয়াছিলাম।

বেলা নয়টার সময় পূর্ব্বরাত্রের ব্রাহ্মণ আমার আহার সামগ্রী লইয়া আসিল। আমি বিলক্ষণ ক্ষুধিত ছিলাম, যথেষ্ট আহার করিলাম।

বেলা দশটার সময়, একজন প্রহরী আসিয়া আমার হাতে হাতকড়া লাগাইয়া, আমাকে লইয়া একটা গাড়ীতে তুলিয়া দিল। কতকগুলি মোট পুটালি লইয়া, সে গাড়ীতে পূর্ব্ব হইতে দুইজন প্রহরী বসিয়া ছিল। তাহারাই আমাকে কলিকাতায় পৌছাইয়া দিবে। গাড়ীতে আমার বসিবার জন্য যে সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল, তাহাতে আমি কষ্টে উপবেশন করিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া তাহারা প্রথমে তাহাদের পুটালি গুলি নামা-

ইয়া দিল, পরে নিজেরা নামিল, এবং আরও পরে আমাকে নামাইয়া গাড়োয়ানকে কোনও ভাড়া না দিয়া বিদায় করিল। সে সেলাম করিয়া যুক্তকরে ভাড়া প্রার্থনা করিলে বলিল—"এ কি আমাদের বাপ দাদার ঘরের কায ? এ সরকার বাহাদুরের কায; আমরা ভাড়া দেব কেন ?" প্রহরীদের যুক্তিটা গাড়োয়ান বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছিল ; কেন না সে আর বাক্যব্যয় না করিয়া চলিয়া গেল।

তাহাদের মোট পুটালিগুলি ও আমাকে লইয়া, তাহারা প্লাটফরমের একস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, আসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের পোষাক পরিয়া, পাদ-চারণা করিতেছিলেন। তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল নয়ন দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে তিনিই আমার অপরাজিতার খেলোয়াড় খুল্লতাত ; নতুবা তাঁহাকে পূর্ব্বরাত্রের ব্যক্তি বলিয়া কখনই চিনিতে পারিতাম না।

তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া, হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন —"কি জমাদার সাহেব, কেমন আছ ; এই আসামী বুঝ ? একে নিয়ে কোথায় যাবে ?"

এ প্রশ্নের মাধুর্য্য আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তাহার মৃদু মধুর রসে প্রহরিদ্বয় চিনির পুতুলের ন্যায় গলিয়া গেল। বোধ হয় মনে করিল, এই সুসজ্জিত ষ্টেশন মাষ্টারটি সত্যই বুঝি তাহাদের চিরপরিচিত বন্ধু, পরন্তু তাহাদের আকৃতির জৌলস দেখিয়া তাহা-দিগকে বার টাকা বেতনের পাহারাওয়ালা না ভাবিয়া, একবারে

বাইশ টাকা বেতনের জমাদার মনে করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন মহানন্দে মুখচর্ম্ম অবর্ণনীয়রূপে আকুঞ্চিত করিয়া মহাদেব বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অন্যজন শুভ্র দন্তগুলি আকর্ণ বিকশিত করিয়া কহিল—"বাবুজী, আপনার মত সমজদার লোক কি আমাদের পুলিসে আছে?"

তিনি কহিলেন—"থাকলে কি হত?"

সে। আপনার মত লোক থাকলে, আমরা নিশ্চয় এতদিন জমাদার হয়ে যেতাম।

তিনি। বল কি? তোমরা এমন ভাল লোক, এমন হুঁসিয়ার লোক, তোমরা এখনও জমাদার হও নি? এ বড় অবিচার ত!

সে। বড় অবিচার, বাবুজী, বড় অবিচার।

তিনি। কিন্তু এর ত একটা কিছু বিহিত করতে হবে। আচ্ছা, আমার মনে একটা মতলব আছে, তোমরা একটা কায কর।

সে। কি?

তিনি। এস, আমার আফিসে এস। আমি তোমাদের নাম লিখে নেব। তার পর, তা আমাদের বড় সাহেবকে জানিয়ে অনুরোধ করব যে, তিনি যেন তোমাদের জন্যে পুলিস সাহেবের নিকট সুপারিস করেন। জান ত, আমাদের বড় সাহেব, তোমাদের পুলিস সাহেবের ফুপুর ছেলে। দুজনে ভারি ভাব—যেন হরিহরাত্মা; এক সঙ্গে শিকারে যায়, এক সঙ্গে মদ খায়; কি বলব—একেবারে গলায় গলায়! এস এস, আমার আফিস ঘরে

এস, আমি এখনই তোমাদের নাম লিখে নেব। লিখে না নিলে আমার মনে থাকবে না।

এই বলিয়া, তিনি একজন খালাসীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—"এই জমাদার সাহেবদের মালপত্র আমার আফিসঘরে নিয়ে চল।"

প্রহরিদ্বয় আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"আসামী ?"

মহাদেব বাবু চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—"ওঃ আসামী! আসামীকেও আফিসঘরে নিয়ে চল। ওকে এখানে ছেড়ে গেলে কি আর রক্ষে আছে ; এখনই পালাবে।"

অতএব তাহারা আমাকে লইয়া, অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবুর আফিস ঘরে প্রবেশ করিল।

এই আফিস ঘরের একটু বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। ঘরটি বেশ প্রশস্ত। প্লাটফরমের দিকে তাহার তিনটি বড় বড় দরজা ছিল। তদ্বিপরীত দিকে একটি দরজা ও দুইটি জানালা ; ঐ দরজার বাহিরে, গৃহভিত্তির ধারে ধারে অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়াটারে যাইবার একটি অপ্রশস্ত পথ, দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল। আফিস ঘরের উত্তর দিকে একটি জানালা, এবং দক্ষিণ দিকে লৌহ-দণ্ডগঠিত এক সুদৃঢ় দ্বার ছিল। ঐ দ্বার পিতলের একটা বৃহৎ তালার দ্বারা বন্ধ ছিল। ঐ দ্বার খুলিলে পার্শেলগুদামে যাওয়া যায়। আমি দ্বারের লৌহদণ্ডের ব্যবধানের মধ্য দিয়া দেখিলাম, যে, ঐ গুদাম ঘরে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের ও ভিন্ন ভিন্ন গঠনের অনেকগুলি পার্শ্বেলের বাক্স গৃহতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

এই গুদাম ঘরে অন্ত কোন দ্বার বা গবাক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল আলোক প্রবেশ জন্ম ছাদের উপর একটা বড় রকম আলোঘর ছিল। আফিস-ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিলের উপর কয়েকখানা বড় খাতা ও পুস্তক ছিল, এবং লিখনের উপকরণ সকল সজ্জিত ছিল। টেবিলের তিন দিকে কয়েকখানা চেয়ার ও একদিকে বড় বেঞ্চ ছিল।

প্রহরিদ্বয় আমাকে তাহাদের উভয়ের মধ্যে লইয়া, ঐ বেঞ্চে উপবেশন করিল। অ্যাসিষ্টাণ্ট মাষ্টার বাবু ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজ ও একটি লেখনী লইয়া তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

একজন বলিল—"লিখুন, আমার নাম শিউগোলাম সিং।"

অন্যজন বলিল—"লিখুন, আমার নাম রামভরত লুনিয়া। আমরা দুজনই কাণ্টনমেণ্ট ফাড়িতে থাকি।"

অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু তাঁহার হস্তধৃত কাগজখণ্ডে সত্তাই তাহাদের মধুর নাম দুইটি লিখিয়া লইলেন। তাহার পর, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এই ফেরারী আসামীকে নিয়ে কোথায় যাবে?"

রামভরত বলিল—"আমরা মোগলসরাই হয়ে, কলকাতায় যাব।"

আঃ-ষ্টে-বাবু। ওঃ! মোগলসরাই যাবার গাড়ী আসতে এখনও দু' ঘণ্টা দেরী আছে; তোমরা এত আগে এলে কেন?

অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবুর প্রশ্নের উত্তরে শিউগোলাম হাই তুলিল। অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু তিনটি তুড়ি দিয়া, পকেট হইতে

পাণের ডিবা বাহির করিয়া নিজে একটি পাণ গ্রহণ করিলেন ; পরে আর দুইটি শিউগোলাম ও রামভরতকে প্রদান করিলেন ; এবং একটি ক্ষুদ্র শিশি হইতে কয়েকটি স্ফূর্ত্তির দানা হাতের তালুতে লইয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য উহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তাহারা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, তাহাদের বিকশিত দন্তের রক্তশোভা সম্যক প্রকটিত করিয়া তাহা গ্রহণ করিল। সুযোগ বুঝিয়া অ্যাসিষ্টাণ্ট বাবু বলিলেন—"দেখ, এতটা সময় চুপ করে বসে থাকবে ?"

শিউগোলাম। আর কি করব হুজুর ! সঙ্গে আসামী, নড়বার ত যো নেই।

আঃ বাবু। তা' বটে। তা' না হ'লে—এতটা সময় রয়েছে —আমি একবার তোমাদিকে বড় সাহেবের কাছে নিয়ে যেতাম। তোমরা সেলাম করতে, আর সাহেব তোমাদিগকে চিনে রাখতেন। তাতে ভারি কায হত ; কলকাতা থেকে ফিরতে না ফিরতে তোমরা জমাদার হয়ে যেতে।

রামভরত। বড় সাহেব সমঝদার লোক ; আমাদের দেখলে আর আমরা তাঁকে সেলাম করলে নিশ্চয় খুসী হতেন ; আমাদের বড় সাহেবের কাছে সুপারিস করতেন। এই আসামীই সব বিগড়ে দিয়েছে হুজুর।

শিউগোলাম। ওকে ছেড়ে গেলে এখনই পালিয়ে যাবে।

আঃ বাবু। না না, ওকে ছাড়ে যাওয়া হবে না। কিন্তু না ;—আচ্ছা আচ্ছা, একটা কায কর না।

রামভরত। কি ?

আঃ বাবু। এই পার্শেল গুদাম দেখছ,—ভাল করে দেখ ; এই পার্শেল গুদামে, ওকে চাবি বন্ধ রাখাল কি হয় ?

শিউগোলাম। গুদামের চাবি ?

আঃ বাবু। এই আমার পকেটে ; এই নাও।

এই বলিয়া, অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু তাঁহার কোটের পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া উহা শিউগোলামের হাতে দিলেন। শিউগোলাম চাবি লইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত লৌহদণ্ড গঠিত দরজাটি খুলিল ; এবং সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় গুদাম ঘরের মধ্যে সুচতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে, আসামী পলাইতে পারে এরূপ অন্য দরজা উহাতে নাই। সে তখন হৃষ্টচিত্তে বলিল—“এই খুব ঠিক হবে। আসামীকে এর মধ্যে রেখে আমরা নিশ্চিন্ত মনে বড় সাহেবকে সেলাম করবার জন্যে যেতে পারব। হুজুর আমাদের হয়ে একটু ভাল করে বল্লেই, আমরা এই মাসের মধ্যেই জমাদারী পাব। আসল কথা, বড়সাহেবকে একটু ভাল করে বলা চাই।”

অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু বলিলেন—“সে তোমাদের কোন ভাবনা নেই। আমি খুব ভাল করে বলব। বলব, তোমরা জমীদারের ছেলে ; দেশে তোমাদের ক্ষেত আছে, বাগিচা আছে, তালাও আছে, মহিষ গরু আছে, পাকা ইমারৎ আছে, আর খুব খাতির আছে। সামান্য পাহারাওয়ালার কায করতে তোমাদের লজ্জা বোধ হয় ; দেশের লোকের কাছে মান থাকে না। বলব,

সাহেব, এরা আমার পুরাণো দোস্ত, এদের জমাদারী দিতেই দিতেই হবে। আমার এই সকল কথা শুনলে, আর তোমাদের এই বাবুয়ানা চেহারা দেখলে সাহেব একেবারে গলে' জল হয়ে যাবে; আজই পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করে' তোমাদের নাম তুটি লিখে দিয়ে আসবে। এখন চল, সাহেবকে সেলাম করবে চল।"

প্রহরিদ্বয় আমাকে লইয়া পার্শেল গুদামে পূরিল; এবং চাবি বন্ধ করিয়া, উহা আপনাদের নিকট রাখিল। পরে অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত ত্বরিত পদে কোথায় প্রস্থান করিল।

আমি গুদাম ঘরে ঢুকিয়া মনে মনে ভাবিলাম, মহাদেব বাবু আমাকে পার্শেল গুদামে নিক্ষেপ করিলেন কেন? অকারণ তিনি এ কার্য্য করেন নাই। কাল রাত্রে তিনি বলিয়াছিলেন, ষ্টেশনে অপরাজিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তবে গুদাম ঘরেরই কোন স্থানে অপরাজিতা লুকাইত আছে কি?

আমি বলিয়াছি যে, এই ঘরের এক কোণে চারিটি বড় বড় বাক্স উপর্য্যুপরি স্থাপিত ছিল। এই বাক্সগুলির পশ্চাতে অনু-সন্ধান করিয়া দেখিলাম, সেখানে গৃহকোণে একটা দ্বার আছে।

আমি বাক্সগুলির পার্শ্ব দিয়া সহজেই দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দ্বারে একটা তালা ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ তালা উহার চাবি সহ দ্বারসংলগ্ন একটা গজালে ঝুলিতেছে। নিগড়বদ্ধ হস্ত দ্বারা আমি সেই দ্বারটির ভিতর দিকে ঠেলিলাম। উহা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, ভিতরে এক সূর্য্যালোকিত কক্ষে দাঁড়াইয়া—সদ্যস্নাতা আলুলায়িত কুন্তলা অপরাজিতা।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অপরাজিতার স্বপ্ন।

অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়াটারে দুইটি শয়নকক্ষ এবং ঐ দুইটি শয়ন-কক্ষের সম্মুখে ছোট একটি বারান্দা ছিল। বারান্দার বাহিরে ছোট একটি অঙ্গন। অঙ্গনের এক পার্শ্বে স্নানাদি করিবার জন্য একটি ঘেরা স্থান। তদ্বিপরীত দিকে কোয়ার্টারের বাহিরে যাইবার দ্বার। শয়ন কক্ষের বারান্দার বিপরীত দিকে আরও দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল—তাহার একটিতে ভাণ্ডারের দ্রব্য সংগৃহীত থাকিত।

যে কক্ষে অপরাজিতা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা উপরি-উক্ত শয়ন কক্ষদ্বয়ের অন্যতম। তাহাতে গৃহসজ্জা প্রায় কিছু ছিল না। কেবল এক পার্শ্বে একখানি বড় তক্তপোষ, এবং তদুপরি বিস্তৃত একটি বিছানা। আর, তক্তপোষের নিম্নে অপরাজিতার সেই ট্রাঙ্কটি ছিল। পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে যখন আমার ছয়জন প্রহরী মহাদম্ভে এই ট্রঙ্ক ভগ্ন করিতে গিয়াছিল, তখন উহা ঐ নিরাপদ স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিতান্ত নিঃশঙ্ক ছিল। আমি সেই নিঃশঙ্ক ট্রাঙ্কের দিকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিলাম।

অপরাজিতা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পাণ্ডুর গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি

বলিলাম—"কেঁদ না। তোমার কোন ভয় নেই। আমি সকল কথা বুঝিয়ে বল্লে, সকল গোল মিটে যাবে। তার পর, তোমার কাকা বলেছেন যে তিনি আমাকে সহজে উদ্ধার করে', কাশীতে এনে, নিজেই তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। তিনি যা আশ্বাস দিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করি তিনি তা অক্লেশে সম্পন্ন করতে পারবেন। কাল রাত্রে যে কৌশলে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, আর আজ এখানে যে কৌশলে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন, তাতে আমার বিশ্বাস হচ্চে যে, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। তাঁর অদ্ভুত বুদ্ধি কৌশল দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।"

অপরাজিতা বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল—"কাকা ছেলে-বেলা থেকে ভারি সেয়ানা; উনি ভাল করে লেখাপড়া শিখলে অদ্বিতীয় লোক হতেন।"

আমি। এই কাকা কি তোমার বাবার সহোদর ভাই?

অপরাজিতা। হ্যাঁ, কাকা বাবার আপনার ছোট ভাই। কাকা বলেছেন যে এক ঘণ্টা তুমি এই ঘরে থাকতে পার। তার পর পার্শেল গুদামে গিয়ে একটা পার্শেলের বাক্সের উপর বসতে বলেছেন। তুমি ততক্ষণ এই বিছানাটায় বস, আমি তোমার জন্যে কিছু জল খাবার নিয়ে আসি।

আমি। আমি সকালে খেয়েছি; এখন আর কিছু খাব না।

অপরাজিতা। কিছু খেতে হবে। না খেলে খুড়ীমা দুঃখ করবেন। তুমি আসবে জেনে তিনি বাড়ীতে ক্ষীরের বরফি

নিজে তৈয়ারী করেছেন ; আর এখন রান্নাঘরে বসে, হিং দিয়ে কলায়ের ডালের কচুরি ভাজছেন। তাঁর যত্নের প্রস্তুত খাবার না খেলে, তাঁর আর দুঃখের সীমা থাকবে না।

আমি। কিছু পরে, সেই পার্শেল গুদামে যাবার আগে, খাব। এখন তুমি আমার কাছে বস। আমি তোমার সঙ্গে দু একটা কথা কয়ে নিই।

এই বলিয়া, আমি শয্যার উপর উপবেশন করিলাম। অপরাজিতাও আমার পাশে উপবেশন করিল।

উপবেশন করিয়া অপরাজিতা বলিল—"কত দিন যে তোমায় এই দুঃখ ভোগ করতে হবে তা ভগবান জানেন। কি কুক্ষণে তুমি বলেছিলে যে তোমার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী! বোধ হয়, ঐ রকম বলা তোমার ভাল কায হয়নি। বুড়ো সদানন্দ সয়গাল, তোমার আকৃতি তার পৌত্রের আকৃতির মত দেখে হয়ত স্নেহ করে', তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে, খাবার জন্য তোমাকে কত মিষ্টান্ন দিলে। তার কাছে, অকারণ মিথ্যা পরিচয় দেওয়া ভাল হয় নি।"

আমি। আমি জীবনে অনেক মিথ্যা বলেছি। দেখেছি, যে মিথ্যা নিতান্ত নিরীহ, তার জন্যেও দণ্ডভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু সদানন্দ সয়গালের কাছে যে মিথ্যা বলেছি, দেখছি তার জন্য দণ্ডটা কিছু বেশী পেতে হবে।

অপরাজিতা। তুমি আর কখন অকারণ এ রকম মিথ্যা বোলো না।

আমি। না অপরাজিতা, আর কখনো আমি মিথ্যা বলব না। একবার এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেই, আগে যে সকল মিথ্যা বলেছি, তাহার সংশোধন করব। বাবাজীকে, তোমার বাবা আর অন্যান্য সকলকে আমার সত্য পরিচয় দিয়ে চিঠি লিখব; আর মিথ্যা বলার জন্যে তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইব। আজ থেকে এ জীবন সত্যের পথে চালিত হবে। কিন্তু জেন মিথ্যাই আমার জীবনের একমাত্র পাপ নয়। আমি অন্য অপরাধে বিশেষ অপরাধী। আমার যোগধর্ম্মের অন্বেষণে বেরিয়ে আমি এক প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্যের অবহেলা করেছি। —আমার মাকে অসহায় নিঃস্ব অবস্থায় ফেলে, তাঁর সর্ব্বস্ব হরণ করে, আমি হরিদ্বারে গিয়েছিলাম ;—যোগধর্ম্মের অনিশ্চিত শক্তি লাভের প্রত্যাশায়, ভগবানের মুর্ত্তিমতী করুণা—মাতৃস্নেহে —আঘাত দিয়েছিলাম।

অপরাজিতা। তুমি দুঃখ করো না। আমি বলছি; নিশ্চয় আবার তুমি তোমার মার সাক্ষাৎ পাবে; আর তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে', আমাকে বধূরূপে গ্রহণ করবেন। তখন দুজনে একত্রে তাঁর সেবা করে' সমস্ত পাপ থেকে মুক্তিলাভ করব। এখন ও সকল কথা আর ভেব না। এখন কেবল ভাববে যে আমাদের মাথার উপর একজন আছেন, যিনি অহরহ আমাদের কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন,—তিনি তোমাকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

আমি। বিপদ থেকে উদ্ধার পাব; তোমাকেও লাভ করব।

কিন্তু বোধ হয় এ জীবনে মার সঙ্গে আর দেখা হবে না। মহা মনকষ্টে, অর্থাভাবে তিনি কি এত দিন বেঁচে আছেন?

অপরাজিতা। তিনি নিশ্চয় বেঁচে আছেন।

আমি। তুমি কি করে' তা জানলে?

অপরাজিতা। তিনি নিশ্চয় বেঁচে আছেন।

আমি। তুমি কি করে' জানলে?

অপরাজিতা। শোন বলি। মানুষের মনটা বড় মজার জিনিষ, আর্সির মত তাতে ভবিষ্যৎ ভালমন্দের ছায়া পড়ে। কি জানি কেন, আমার মন যেন আমায় বলে দিচ্ছে যে, তোমার মা নিশ্চয় বেঁচে আছেন। তোমার মনে আছে, পণ্ডিত সদানন্দ সন্নগালের কাছে যখন তুমি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলে, তখন আমার ভয় হয়েছিল যে, তাতে তোমার অনিষ্ট হবে, আমি সে কথা তোমাকে বলেছিলাম। এখন বুঝতে পারছ, মানুষের মন যা বলে দেয় তাহা প্রায় মিথ্যা হয় না।

আমি। মন্দের বেলা মিথ্যা হয় না বটে, কিন্তু ভালর বেলা মিথ্যা হয়।

অপরাজিতা। তা ছাড়া, কাল রাত্রে একটা স্বপ্নে আমি তাঁর দর্শন পেয়েছি।

আমি। সে স্বপ্নটা কি আমায় বল।

অপরাজিতা। কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে, আমার ঘুম এল না। তোমার ভাবনায় বারবার চোখে জল আসতে লাগল। কতক্ষণ এই রকমে কেটে গেল, তা মনে নেই। তার পর, ক্লান্ত

হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম,—তোমার সঙ্গে যেন কোথায়, কোন এক মজার দেশে গিয়ে পড়েছি। কোন একটা রাস্তা দিয়ে, তোমার পাছু পাছু চলতে লাগলাম। রাস্তাটা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা, তার উত্তর দক্ষিণ ধারে সারি সারি বাড়ী। রাস্তার উত্তর ধারে, এক জায়গায় একটা উচু পাঁচীল; সেই পাচীলের মাঝখানে, পিতলের কড়া লাগান একটা সবুজ রঙের বড় দরজা ছিল। সেই দরজা খুলে, আমাকে নিয়ে তুমি ভিতরে ঢুকলে। দেখলাম, ভিতরে একটি ছোট উঠান; উঠানের পশ্চিম দিকে, দু'টি পূর্ব্বমুখী একতলা ঘর; আর ঐ দুই ঘরের সমুখে সরু বারান্দা। ঐ উঠানের উত্তর দিকে, নীচেতলে আর দোতালায় আরও ছ'টি ঘর ছিল; কিন্তু ঐ উঠান থেকে ঐ উত্তর দিকের ঘরগুলিতে ঢোকবার কোনও দরজা ছিল না; কেবল দক্ষিণ-বাতাস আসবার জন্যে কতকগুলি জানালা ছিল। ঐ ঘরগুলি ভিতর বাড়ীর ঘর। ভিতর বাড়ীতে ঢোকবার জন্যে, উঠানের উত্তর পশ্চিম কোণে একটা গলি পথ ছিল।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এ ত আমাদেরই শ্যাম-বাজারের বাটী!—সেই সবুজ দরজা; তাহাতে পিতলের কড়া; ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিবার সেই গলিপথ। দেখিতেছি, অপরাজিতা স্বপ্নে আমাদেরই শ্যামবাজারের বাটী দেখিয়াছে।—কি অদ্ভুত স্বপ্ন! পূর্ব্বে এইরূপ অদ্ভুত স্বপ্নের কথা দুই একবার শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু ইহা যেন আরও অদ্ভুত, আরও আশ্চর্য্য! আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম—"তুমি ত আমাদেরই শ্যাম-

বাজারের বাড়ীর স্বপ্ন দেখছ। তুমি স্বপ্নে যেমন দেখেছ, আমা-দের বাড়ী ঠিক সেই রকম।”

অপরাজিতা। আমিও সকালে উঠে ভেবেছিলাম যে, রাত্রে স্বপ্নে যে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিলাম, তা বোধ হয় তোমাদেরই বাড়ী।

আমি। তোমার স্বপ্ন বড়ই অদ্ভুত। তার পর, স্বপ্নে আর কি দেখলে বল।

অপরাজিতা। তার পর সেই গলিপথ দিয়ে তোমার সঙ্গে ভিতর বাড়ীতে ঢুকলাম। দেখলাম, ঘর গুলির সমুখে, উত্তর দিকে একটি লম্বা বারান্দা; বারান্দার পূর্ব্বদিকে উপরে ওঠবার সিঁড়ি; পশ্চিমদিকে স্নান টান করবার জায়গা; বারান্দার বাইরে পাকা উঠান; উঠানের অপর পারে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, কাঠকয়লা রাখবার ঘর। দেখলাম যে বাড়ীর মধ্যে আর কেউ নেই, কেবল তোমার মা রান্নাঘরের দরজার কাছে, খালি মেঝের উপর চুপ করে' বসে রয়েছেন। আমি কাছে গিয়ে তাঁর পায় ধূলো নিলে, তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। বল্লেন—“আয়ুষ্মতী হও, পুত্রবতী হয়ে, চিরকাল চিরসুখে স্বামীর সঙ্গে বাস কর।”

আমি। আচ্ছা, স্বপ্নে তুমি মার আকৃতি কি রকম দেখলে বল দেখি।

অপরাজিতা। দেখলাম, তিনি আমার চেয়ে কিছু উঁচু, আর আমার চেয়ে কিছু রোগা। তাঁর গায়ের রং প্রায় তোমার

মত ফর্সা। তাঁর কপাল তোমার মত চৌড়া আর উঁচু, তাঁর বড় বড় চোথ, কিন্তু কিছু কোটরগত। তাঁর নাক লম্বা আর বেশ টিকাল, আর নাকের ফুটো দুটি বড়। তাঁর হাঁ-মুখ কিছু বড়, আর মুখের মধ্যে দাঁতগুলি অসমান। তাঁর বাঁ গালে একটা ক্ষতের লম্বা চিহ্ন আছে।—বল, আমি সত্যিই তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি কি না।

আমি। তুমি সত্যিই ঠিক আমার মাকে দেখেছ।—তোমার কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! স্বপ্নে তিনি তোমার সঙ্গে কি কিছু কথা বল্লেন?

অপরাজিতা। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—'তুমি আমার গৃহত্যাগী বিবাগী ছেলেকে, সংসারী করে' দেশে ফিরিয়ে এনে আমাকে চিরসুখী করেছ, তাই আমার আশীর্ব্বাদে তুমি চিরসুখিনী হবে, দুঃখ কাকে বলে তা জীবনে কখনও জানতে পারবে না।

আমি। আমার মা তোমাকে যে আশীর্ব্বাদ করেছেন, তা যাতে সফল হয়, এ জীবনে তাই আমার সাধনা হবে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে তোমাকে সুখী করবার চেষ্টা করব; প্রাণপণ শক্তিতে তোমার সমস্ত দুঃখ নিবারণ করব।

অপরাজিতা। নিত্য তোমাকে কাছে পেলেই আমি সকল সুখে সুখিনী হব। বোধ হয়, তোমার এই বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করতে আরও পনের দিন সময় লাগবে। তার পর, আমি তোমার সঙ্গে সারাজীবন সুখে থাকতে পারব।

কক্ষের বাহিরে বারান্দায় চুড়ি ও বালার মৃদু টুন্ টুন্ শব্দ হইল। অপরাজিতা চকিত নেত্রে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—"খুড়িমা তোমার জলখাবার নিয়ে এসেছেন।" এই বলিয়া সে ত্বরিত পদে কক্ষের বাহিরে যাইয়া, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে সজ্জিত একটি কাংস্য স্থালী লইয়া আসিল; এবং উহা কক্ষতলে রাখিয়া পুনরায় বাহিরে যাইয়া ছোট একটি কম্বলাসন ও এক গ্লাস জল আনয়ন করিল। তাহার পর, আমার নিগড়বদ্ধ হস্তের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"কেমন করে খাবে? এস, আমি তোমাকে খাইয়ে দিই।"

সেটা স্বপ্নে নহে;—সত্যই অপরাজিতা আমাকে খাওয়াইয়া দিয়াছিল। তাহার নবনীত হস্ত হইতে আহার গ্রহণ কালে, কে জানে আমি কতবার তাহা চুম্বন করিয়াছিলাম। কে জানে তাহাতে কতবার অপরাজিতার চক্ষু দুইটি অনুরাগ ভরে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কতবার তাহার অমল কপোলতল অনুরাগের রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল।

আমার আহার ও আচমন শেষ হইলে, অপরাজিতা আঁপন বসনাঞ্চলে আমার মুখ মুছাইয়া দিল। পরে একটি ডিবা হইতে একটি পাণ লইয়া আমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"পাণ খাও।"

আমি বলিলাম—"না। তোমার কাকার উপদেশ, এখনই পার্শেল গুদামে গিয়ে বসতে হবে। মুখে পাণের রাঙ্গা চিহ্ন

দেখলে, পাহারাওয়ালাদের মনে সন্দেহ হবে, আর ধরা পড়ে যাব।”

দুই চারিটা মশলা মুখে দিয়া, অপরাজিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, আমি আবার পার্শেল গুদামে ঢুকিয়া নিরীহ ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিলাম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বেনারস হইতে কলিকাতা।

আমি দশ বা বার মিনিটকাল পার্শ্বেল গুদামে অপেক্ষা করিলে, অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু ওরফে খুড়শ্বশুর মহাশয়, হৃষ্ট প্রহরিদ্বয়কে লইয়া তাঁহার আফিসঘরে প্রত্যাগমন করিলেন। আরও প্রায় দশমিনিট পরে, ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিলে, প্রহরীরা আমাকে নিতান্ত নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বাহির করিয়া, গাড়ীর একটি খালি কামরায় উঠাইল; এবং পাছে আমি পলায়ন করি, তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক দুইজনে আমার দুই পার্শ্বে গম্ভীর মুখে উপবেশন করিল।

যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িল।

গাড়ী গঙ্গার সেতুর উপর আসিলে, আমি সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল গঙ্গাস্রোতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিলাম; দূরে বহু প্রস্তর-মন্দির ও প্রস্তর অবতরণিকাতে লোকসমারোহ দেখিলাম; আকাশপটে অসংখ্য মন্দিরের উজ্জ্বল চূড়া সকল চিত্রিত রহিয়াছে দেখিলাম। দেখিয়া নয়ন মুদিত করিয়া মনে মনে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিলাম। প্রণত হইয়া ভক্তিপূর্ণ চিত্তে পুণ্যা বারাণসীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। অপরাজিতাকে বিবাহ করিবার আনন্দময় আশায় এই বারাণসীতে আসিয়াছিলাম; নিগড়বদ্ধ হস্তে বন্দীরূপে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। বিদায় গ্রহণ কালে, কাশীশ্বরী

অন্নপূর্ণাকে মনে মনে ডাকিয়া বলিলাম—"দেবি! তুমি আমার অপরাজিতাকে নিরাপদে রাখিও।" অসংখ্য মন্দির-মধ্যস্থ অসংখ্য দেবতাকে ডাকিয়া বলিলাম—"তোমরা মঙ্গলময়! তোমরা আমার অপরাজিতার মঙ্গল করিও।" দেবমন্দিরচিত্রিত সূর্য্যালোকিত মধ্যাহ্ন আকাশকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"হে নীলাকাশ! তুমি অপরাজিতার মাথায় স্বর্গের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও।"

সেতু অতিক্রম করিয়া, গাড়ী ক্রমে মোগলসরাই ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে, আমরা কলিকাতা-অভিমুখী অন্য গাড়ীতে চড়িলাম।

তথায় অনেক বাঙ্গালী রেলযাত্রী কৌতূহলনেত্রে আমার নিগড়-বদ্ধ হস্ত লক্ষ্য করিতে লাগিল। আমি লজ্জায় অধোবদন রহিলাম। তথায় শালপত্র-বিরচিত ক্ষুদ্র পাত্রে ছোলার ঘুগনি ভাজা এক একটি রক্তবর্ণ লঙ্কার সহিত বিক্রীত হইতেছিল,—দুইটি পয়সা দিয়া, তাহার দুই পাত্র ক্রয় করিয়া, প্রহরিদ্বয় তাহা মহানন্দে চর্ব্বণ করিতে করিতে লঙ্কার ঝালে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল; তথায় এলুমিনিয়ম ধাতুর নির্ম্মিত বাসনের এক বিক্রেতা, একটি করঙ্কের জন্য এক বাঙ্গালী যাত্রীর নিকট অসম্ভব মূল্য প্রার্থনা করায়, তিনি অপূর্ব্ব মুখভঙ্গিমা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তথায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্লাটফরমে নামিয়া, জুতা খুলিয়া, মৃত্তিকাভাণ্ডে বরফযুক্ত লেমনেড পান করিয়া আপনার তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন, অপিচ আপনার হিন্দুয়ানী অক্ষুন্ন রাখিলেন; তথায় পাণওয়ালা তানসেনের অজানিত এক অপূর্ব্ব রাগিণীতে গাহিল—'পান বিড়ি

সিগারেট, পাণ বিড়ি সিগারেট' ; তথায় বালক চীৎকার করিল ; যুবক সিগারেট খাইল ; প্রবীণ হালুয়াপুরী কিনিল ; এবং বৃদ্ধ লোটা ভরিয়া জল লইল ; তথায় এক অবগুণ্ঠনবতী, অবগুণ্ঠন তুলিয়া দ্রব্য বিক্রেতার সহিত দ্রব্যগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইল, অপরা মুখের কাছে শালপত্রের পাত্র রাখিয়া কচুরি খাইল এবং আরও একজন বিগত-যৌবনা, এক যুবক-যাত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিল ; তথায় রৌদ্রতপ্ত বালুকণা, উত্তপ্ত বায়ুতে উড়িল ; তথায় হরিদ্বর্ণ পতাকাসঞ্চালনকে বৃক্ষপল্লবের সঙ্কেত মনে করিয়া, এঞ্জিন-কোকিল কুহরিয়া উঠিল।

আমি কলিকাতা অভিমুখে চলিলাম।

আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাঙ্গালার স্নিগ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাইব, ইহা মনে করিয়া, সেই দুর্দ্দশাতেও আমি আনন্দিত হইলাম। আমার সেই আনন্দে, জন্মভূমি কি আদরের জিনিষ, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। হায়! এই আদরের সামগ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, কি রত্নের আশায়, আমি কোথায় গিয়াছিলাম ; কোন্ স্বর্গলাভের আশায় 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী ও জন্মভূমিকে ত্যাগ করিয়াছিলাম !

সন্ধ্যার পর আমরা দানাপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখানে প্লাটফরমে ও ষ্টেশনের কক্ষগুলিতে উজ্জ্বল আলোক সকল জ্বলিতে-ছিল। সেখানে সাহেব যাত্রীদিগের সান্ধ্যভোজের বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিয়া আহার করিতে লাগিলেন ; আমরা বাহির হইতে কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

তাঁহাদের আহারের সুবিধার জন্য গাড়ী সেখানে চল্লিশ মিনিট দাঁড়াইল।

গাড়ী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে প্রহরীদের মধ্যে একজন কি জানি কি ভাবিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু খাবে ?"

অপরাজিতা নিজহস্তে আমাকে যাহা খাওয়াইয়া দিয়াছিল, তাহাতে আমার উদর পূর্ণ ছিল ; সুতরাং আমি বলিলাম—"না, আমার খিদে নেই ; আমি কিছুই খাব না।"

প্রহরী বলিল—"না খাওয়াই ভাল। এই সব :ষ্টেশনে বড় খারাপ জিনিষ বিক্রী হয়। পচা আটা, ভেজাল ঘি, খারাপ তেল ;—এ সকল জিনিষ না খাওয়াই ভাল। খেলে ব্যারাম হয়। আমি একবার মতিহারী গিয়েছিলাম, পথে—"

কিন্তু এই সময়, একটা জলখাবারওয়ালা, তাহার পুরী হালুয়া ও মিষ্টান্নাদি একটা পিতলের বড় পরাতে সজ্জিত করিয়া, এবং তাহাতে মসীউদ্গিরণকারী আলোক জ্বালাইয়া, গাড়ীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাওয়ায়, প্রহরিপ্রবরের আরব্ধ বক্তৃতা বন্ধ হইয়া গেল। সে খাদ্যপাত্রের প্রতি তাহার ক্ষুধাতুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, খাদ্য বিক্রেতাকে অপেক্ষা করিতে বলিল, এবং সঙ্গীকে ডাকিয়া কোন্ কোন্ খাদ্য ক্রয়যোগ্য, তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বিচার ও মূল্যনির্দ্ধারণে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া, তাহারা অবশেষে কিছু হালুয়া ও পুরী ক্রয় করিল, এবং পয়সা বহুবার গণনা করিয়া হালুয়া ও পুরীর মূল্য প্রদান করিল। তৎপরে তাহারা আহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আহারের মহানন্দ

দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম না যে, ঐ আহারদ্রব্য পচা আটা ও ভেজাল ঘিয়ে প্রস্তুত এবং উহা না খাওয়াই ভাল।

আহারান্তে তাহারা তাম্বুল চর্ব্বণ করিল; এবং পিতলের ক্ষুদ্র কৌটা হইতে চূণ এবং কাপড়ের থলি হইতে তামাকের পাতা বাহির করিয়া, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও বাম করতালুর সংঘর্ষণে 'খৈনি' প্রস্তুত করিয়া, তাহা তাম্বুলরক্ত বিকট অধর মধ্যে স্থাপিত করিয়া, প্রভূত নিষ্ঠীবনে গাড়ীর তলদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল।

সাহেবদিগের আহার সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা মন্থর গমনে আসিয়া গাড়ীতে চড়িলেন। সকলের আহার সমাপ্ত হইয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান লইয়া গার্ড গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত আলোক দেখাইল।

আবার গাড়ী পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল। কত মাঠ, কত বন, কত অন্ধকার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। দূরে গগন প্রান্তে কত তারা, কত নাচিল; পৃথিবীতে বৃক্ষোপরে বসিয়া কত খদ্যোৎ তাহার অনুকরণ করিল। দূরে দূরে, দ্রুতগামী এক একটা আলো, মনুষ্য নিবাসের সন্ধান বলিয়া দিল। আমি গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কতক্ষণ তাহা দেখিলাম। তাহার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিদ্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। আমি নিদ্রিত হইয়া, বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ শুইয়া ছিলাম জানি না।

যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলাম ভোর হইয়াছে;—তারাদল সারারাত জ্বলিয়া ক্লান্ত হইয়া মিট্‌মিট্‌ করিতেছে। পূর্ব্বদিক, দিবাকরের পদক্ষেপ জন্য গগনপ্রান্তে সম্মানজনক লাল আবরণ

বিছাইয়া দিয়াছে। গাড়ী তখন একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ছিল। দীপাধারে লিখিত ষ্টেশনের নাম পড়িয়া বুঝিলাম, আমরা আসানসোলে আসিয়াছি।

দেখিলাম, আমার পার্শ্বে প্রহরিদ্বয় গভীর নিদ্রায় অভিভূত। দেখিয়া আমার মনে একবার একটা দুষ্ট অভিসন্ধি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম, এখন আমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে গাড়ী হইতে নামিয়া পলায়ন করিতে পারি। কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আমার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, এরূপ পলায়নের দ্বারা আমি নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব না; বরং সহজেই পুনর্ধৃত হইয়া অধিক দণ্ডার্হ হইব। অল্পকাল মধ্যে সূর্য্য উদিত হইবেন; তখন এই নিগড়বদ্ধ হস্ত লইয়া, লোকালয়ে দুইপদ অগ্রসর হইতে না হইতে, লোকে আমাকে পলাতক অপরাধী বুঝিয়া, পুনরায় পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবে। বধিরের সঙ্গীত শুনিবার আশার ন্যায়, আমার পলায়নের আশা মনেই বিলীন হইল।

সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, গাড়ী বর্দ্ধমানে পৌছিল। তথায় প্রহরীদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাহারা চকিত নেত্রে আমাকে দেখিয়া যেন নিশ্চিন্ত হইল। তাহারা আমাকে লইয়া মুখ হাত ধুইতে নামিল। আমার মুখ হাত ধুইবার সুবিধার জন্য, তাহারা কৃপা করিয়া ক্ষণকালের জন্য, আমার নিগড় বন্ধন খুলিয়া লইল। অল্পক্ষণ মধ্যে মুখ হাত ধুইয়া, আমরা গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। গাড়ীতে ফিরিয়া, প্রহরীরা দয়া করিয়া বলিল—"বর্দ্ধমানের জলখাবার ভাল; এখানে তুমি কিছু খেয়ে নাও।"

আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, পরন্তু কলিকাতায় পৌছিয়া, হঠাৎ কিছু আহার প্রাপ্ত হইব কি না তদ্বিষয়ে মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সুতরাং আমি বলিলাম—"খাব।"

তাহারা দুইজনে কিয়ৎকাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, আমার আহার জন্য তাহারা মোট দশ পয়সা খরচ করিবে। পরে আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, তাহারা আমার রাস্তার খাদ্য সরবরাহ জন্য মোট দেড় টাকা খরচের একখানি ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছিল। সেই ফর্দ্দ তাহাদের কথামত লিখিয়া দিয়াছিল কাশী ক্যাণ্টনমেণ্ট আউট পোষ্টের বাঙ্গালী রাইটর কনেষ্টবল; সে এই রহস্যটুকু জনসমাজে প্রচার করায়, পরে তাহা আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল।

দশ পয়সা খরচ করিয়া, তাহারা আমার জন্য ক্রয় করিল ছয়খানি পুরী, একটি মিহিদানা, এবং চারিখানি জিলাপী। তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জলখাবার ক্রয় করিলে, আমি জিলাবীর পরিবর্ত্তে সীতাভোগ ক্রয় করিতে বলিতাম। এই সুস্বাদু খাদ্যটা যে কতকাল খাই নাই, তাহা, হে আমার পাঠকবর্গ, তোমরা সকলেই জান। আমার পানাহার শেষ হইলে, প্রহরীরা পুনরায় হস্ত নিগড়বদ্ধ করিল। এই বর্দ্ধমানে কবি ভারতচন্দ্রের সুন্দর, বিদ্যালাভ করিতে আসিয়া, রাজা বীরসিংহের আদেশে আমারই মত নিগড়বদ্ধ হইয়াছিল। মা কালীর কৃপায় পরে বিদ্যালাভও হয়। দেবতার কৃপায় আমিও একদিন নিগড়মুক্ত হইয়া অপরাজিতা লাভ করিব। এই মধুর ভবিষ্যৎ-আশায় বুক বাঁধিয়া আমি বর্দ্ধমান ত্যাগ করিলাম।

আমাদের গাড়ী ধান্যক্ষেত্র ও আম্রকুঞ্জের পার্শ্ব দিয়া, কলা-বাগান ও নারিকেল বাগান পার হইয়া, ভগ্ন বাড়ী ও বৃক্ষাক্রান্ত দেবমন্দির অতিক্রম করিয়া, খাল ও অপরিষ্কার ডোবার ধার দিয়া, নদীর উপর ঝন্ ঝন্ শব্দে নৃত্য করিয়া বেলা নয়টার পর হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

সেখানে আমার শুভাগমন প্রতীক্ষায় পুলিশের দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছিল। বোধ হয় তাহারা পূর্ব্বাহ্নে তারযোগে খবর পাইয়াছিল যে, ঐ দিন ঐ সময় ঐ গাড়ীতে আমার শুভা-গমন ঘটিবে। প্লাটফরমের ধারে রাস্তায়, একখানা বড় জুড়িগাড়ীও আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। উহা জেলখানার গাড়ী। সেই গাড়ীতে চড়িয়া, আমরা জেলে আসিয়া পৌঁছিলাম।

জেলখানার দরজায় জেলদারোগা বাবু আমার অভ্যর্থনা করি-লেন; হাসিয়া বলিলেন—"এস হে! আমাদের এখানে দিন কতক থেকে যাও।" এই বলিয়া তিনি আমাকে এক কক্ষে লইয়া একখানা বেঞ্চে বসাইলেন। তৎপরে আমার প্রহরিদ্বয়ের নিকট হইতে কতকগুলি কাগজপত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

জেল দারোগা।

সে দিনই ডাক্তার আসিয়া আমার দেহ পরীক্ষা করিলেন। আমাকে তুলামঞ্চে চড়াইয়া স্থির করিলেন যে আমার বরবপুর গুরুত্ব এক মণ আটাইশ সের। মাপ দণ্ডের সাহায্যে স্থির হইল যে, আমার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। চক্ষু জিহ্বা বক্ষ এবং অঙ্গের বহু পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইল যে, আমার দেহ সম্পূর্ণ নীরোগ। বাল্যকালে অসাবধানতাবশতঃ আমি একটা ভগ্ন বোতলের উপর পতিত হইয়াছিলাম; তাহাতে আমার বামহস্তের তলে একটা ক্ষত হইয়াছিল; ঐ ক্ষতের একটা বিশ্রী চিহ্ন আমার হস্তে বরাবর থাকিয়া গিয়াছিল। আমার করপল্লবের শ্রীহানিকর সেই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমি চিরকাল মনে করিতাম যে তৎস্থানে স্থায়িভাবে থাকিবার উহার কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ দেখিলাম যে, এই অনাবশুক চিহ্নটা ডাক্তারের মস্ত একটা কাযে লাগিয়া গেল। তিনি উহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার রিপোর্টে লিখিলেন—"আসামীর বাম করতলে একটা ক্ষত চিহ্ন আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। আমার অনুমান হয় যে এই ক্ষত, বারুদ বা অন্য কোন বিস্ফোরক দ্রব্যের বিদারণে প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে এই ক্ষত সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছে।"

আমার নয়ন-গোচরে ঐ রিপোর্ট লিখিত হওয়ায়, আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম—"না মশায়, এই ক্ষত চিহ্ন ও রকমে উৎপন্ন হয় নি। প্রায় আঠার বছর আগে আমি খেলা করতে করতে পড়ে গিয়েছিলাম; তাতে আমার হাতের তেলো কেটে যাওয়ায়, বিলক্ষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। সেই ক্ষতের এই চিহ্ন এখনও আমার তেলোতে রয়েছে।"

ডাক্তার বিজ্ঞতায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"আমি পরীক্ষা করে যা অনুমান করেছি, তা লিখলাম। আমি তোমার কথা শুনতে বাধ্য নই। তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে, তা আদালতে বলো।"

কাযেই আমি নীরব হইলাম।

ডাক্তার আমার করতল পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কয়েকটি কিণাঙ্ক লক্ষ্য করিলেন। ঐ কিণাঙ্কগুলি বাবাজীর কুস্তির আখড়ায় মুদগর-সঞ্চালনের ফলে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া ডাক্তার তাঁহার ভ্রূদয় সঙ্কুচিত করিয়া লিখিলেন—"আসামীর উভয় করতলেই কড়া আছে। সর্ব্বদা পিস্তল-চালনে এরূপ কড়া উৎপন্ন হইতে পারে। সর্ব্বদা বংশযষ্টির চালনদ্বারাও এরূপ কড়া পড়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, উহা পিস্তল চালনেই উৎপন্ন হইয়াছে।"

ডাক্তার তাঁহার রিপোর্ট সমাধা করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলে, একজন ফটোগ্রাফার আসিয়া, আমাকে এক বারান্দায় লইয়া, আমার মোহন মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিল।

অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া, আমাকে এক কক্ষমধ্যস্থ এক টেবিলের পার্শ্বে লইয়া গেল। দেখিলাম, ঐ টেবিলের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা বড় বহি রহিয়াছে; এবং একটা কাষ্ঠফলকে কতকটা কজ্জল অনুলিপ্ত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া লেখনী ও মস্যাধার প্রভৃতি লিখন-উপকরণও ছিল। দেখিয়া আমি আমার পরিচালককে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে আমাকে কেন আনলে? আমায় কি করতে হবে?"

সে বলিল—"টিপ সই নেব।"

বাঙ্গলা উপন্যাসে আমি 'সই'এর কথা পড়িয়াছি। আলেখ্য লেখনরতা সই মণিমালিনীকে দেখিয়াছি। পঞ্চদশবর্ষীয়া প্রখর-নয়না চঞ্চলহৃদয়া সই অমলার চিমটির স্বাদ গ্রহণ করিয়াছি। শুনিয়াছি, একদিন চন্দ্রকরোজ্জল গঙ্গার অগাধ জলে প্রতাপ শৈবলিনীকে "শৈ" বলিয়াছিল। কিন্তু এরূপ অদ্ভুত 'সই'এর কথা কখন শুনি নাই। মসীচিত্রিত কাষ্ঠফলকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার মনে একবার সন্দেহ জন্মিল যে, লোকটা বুঝি কাষ্ঠফলক হইতে কজ্জল লইয়া, আমার কপালে টিপ দিয়া আমার সহিত 'টিপসই' পাতাইবে। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "টিপ সই কি?"

সে সেই চামড়া বাঁধা বইখানি খুলিয়া বলিল—"এতে তোমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ নেব; এস।" এই বলিয়া সে আমার বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি আপন কবল মধ্যে সবলে গ্রহণ করিয়া, তাহা কাষ্ঠফলকে সংলিপ্ত ও মসীমণ্ডিত করিল। এই

বিস্ময়জনক কার্য্য সমাধান্তে, সে বহি খানির উন্মুক্ত পৃষ্ঠার এক অংশে আমার মসীমণ্ডিত বৃদ্ধাঙ্গুলি মুদ্রিত করিল; এবং ঐ মুদ্রণের পার্শ্বে আমার নাম লিখিবার জন্য, আমাকে অনুরোধ করিল।

আমি আমার বাল্যকালের নাম লিখিলাম—"শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

লোকটি ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—"তোমার নিজের নাম লেখ।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—"আমার নিজের নাম সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি সেই নামই লিখেছি।"

সে বলিল—"রিপোর্টে দেখলাম যে তুমি একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে স্বীকার করেছ যে, তোমার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি। আমরা সেই নামই রেজিষ্টারি করেছি। এখানে তুমি সেই নামই লিখবে। নাম বদ্‌লে অন্য নাম লিখলে চলবে না।"

আমি গত কল্য অপরাজিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আর কখনও মিথ্যা পথে বিচরণ করিব না। হঠাৎ আমার মনে সেই প্রতিজ্ঞার কথা উদিত হওয়ায়, আমার মনে বিলক্ষণ বল সঞ্চারিত হইল। আমি গম্ভীর স্বরে বলিলাম, "আমি আমার যথার্থ নামই লিখেছি। অন্য নাম লিখব না।"

সে কর্কশ স্বরে বলিল, "তোমার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি; তা তুমি স্বীকারও করেছ। এখানে তোমাকে ঐ নামই লিখতে হবে। অন্য মিথ্যা নাম লিখলে চলবে না!"

আমি আরও গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"আমি যা লিখেছি, তার পরিবর্ত্তন করব না।"

সে আমাকে উপদেশ দিয়া বুঝাইল—"নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরো না। এই মিথ্যা নাম লেখায় তোমার কোন ইষ্টলাভ হবে না। সকলেই বুঝতে পারবে যে ধরা পড়ে' পরিত্রাণ লাভের চেষ্টায় তুমি তোমার যথার্থ নাম গোপন করেছ। এতে তোমার খুব অনিষ্ট হবে।"

আমি বলিলাম—"তা' হোক।"

তাহার সদুপদেশ গ্রহণে আমাকে বীতরাগ দেখিয়া, সে রাগিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিল—"চল, তোমাকে জেল দারোগা বাবুর কাছে যেতে হবে।" এই বলিয়া, সে আমায় হাত ধরিয়া দারোগা বাবুর নিকট লইয়া গেল; এবং উত্তেজিত কণ্ঠে আমার দুষ্টামীর কথা তাঁকে বলিল।

দেখিলাম, সেই সকল কথা শুনিয়া, তিনি বিচলিত হইলেন না। বলিলেন—"কি করব? কেউ মিথ্যা বল্লে তা নিবারণের ত কোনও উপায় নেই। প্রায় সকলেই আদালতে গিয়ে আপনাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। এ ব্যক্তি তার আগেই সেই অভিনয় আরম্ভ করে দিয়েছে। দেখ, একে দেখে অবধি আমার মনে হচ্ছে যে, পুলিশ একটা কিছু ভুল করেছে। কোনও পলাতক আসামীর এমন নধর দেহ হতে পারে না। শিকারী কুকুরের মত পুলিশ যার পাছে পাছে ঘুরছে, সে বিদেশে অপরিচিত স্থানে, অসময়ে আহারে, কখন বা অনাহারে, স্নান ও ঘুমের অনিয়মে আর তার উপর ধরা পড়বার ভয়ে, কখনও এ রকম সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব রাখতে পারে না। তার পর দেখ, এ ব্যক্তি কেমন যত্নে

দাড়ী কামিয়েছে, চুল ছেঁটেছে। আমি তখন এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, এর মাথায় একটা সুন্দর গন্ধতৈলের সৌরভ পেলাম। না না, পলাতক আসামীর ত এ সকল করবার অবসর নেই। তা, পুলিশ নিজের কায নিজে বুঝবে। আমাদের এ সকল বিষয়ে কথা না কওয়াই ভাল। আমরা হুকুমের চাকর; যেমন হুকুম পাব সেই মত কায করে যাব। ব্যস্ তা হলেই আমরা দায়ে খালাস। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম পেয়েছি হাজত ঘরে রাখতে, হাজত ঘরে রাখব। তারপর পুলিশ আপনার কায আপনি করবে। আমাদের পরচর্চ্চায় দরকার কি? তবে এ কথা বলতেই হবে যে, পুলিশ মস্ত একটা গলদ করেছে। আবার দেখ, পুলিশ রিপোর্টে লিখেছে যে এ ব্যক্তির সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড নূতন ট্রাঙ্ক ছিল। এটা ডাহা মিথ্যা। ট্রাঙ্ক ছিল ত সেটা গেল কোথায়? সেটা কর্পূর নয় যে উবে যাবে; তার ড়ানা নেই যে উড়ে যাবে। আর দেখ, একটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক নিয়ে কি কোন পলাতক আসামী রেলগাড়ীতে আনাগোনা করে? শুনলাম, আসল যে আসামী সে নাকি আপনার ছোট ষ্টিলের বাক্সটি আপনার মেসের বাসায় ফেলে পালিয়েছে।"

উপরি-উক্ত বাক্য প্রবাহে মুখ-কণ্ডূয়ন নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া দারোগা বাবু সেই ব্যক্তিকে একটা টুল দেখাইয়া বলিলেন—"বস হে হরেন, একটু কথা কওয়া যাক।"

সেই হরেন নামক লোকটির ক্রোধ দারোগা বাবুর কথায় একেবারে প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। সে দারোগা বাবুর নির্দ্দিষ্ট

টুলে উপবেশন করিলে, তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—“তুমিও না হয় ঐ টুলখানায় একটু বস। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?”

আমি উপবেশন করিলে দারোগা বাবু হরেনকে বলিলেন—“দেখ, একটা কথা—তোমায় ভাল—কি বলব মনে করছিলাম। হাঁ হাঁ, এই ডাক্তার সাহেবের কথা। এই ডাক্তার সাহেব আজ একজন রোগীর সুরুয়া দেওয়া বন্ধ করেছেন শুনেছ? আজ মোট সতের জন সুরুয়া পাবে। আমরা যেমন হুকুম পাব, তেমনই কায করব; ব্যস তা হলেই আমরা দায়ে খালাস। কিন্তু কাযটা কি ডাক্তার সাহেবের ভাল হল? সুরুয়ার এক পোয়া মাংস, ঔশীনর রাজার মত তাঁকে ত নিজের গা কেটে দিতে হত না; সরকার বাহাদুরই ত তা সরবরাহ করতেন! এক পোয়া মাংস বাঁচিয়ে কি লাভ হবে? আজ সন্ধ্যার পর জামাই বাবাজী আসবেন বলেছেন কি না; কি বলব বল—আমি উপরওয়ালার নিন্দা করতে পারিনে—কিন্তু ডাক্তার সাহেবের আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়েছি।”

হরেন। আপনার বাসায় রোজ যেমন দেড় সের মাংস যায়, আজও তাই গিয়েছে।

দারোগা। বেশ বেশ। আর দেখ, আমায় খেতে হয় কালিয়া, আমার কম হলে চলে না। রোগী কয়েদীরা খায় সুরুয়া, তা যত পাৎলা হবে ততই ভাল। তা, পাৎলা করতে মাংসের আবশ্যক কি? একটু বেশী জল দিলেই ত পাৎলা হয়ে যায়।

হরেন। চৌবে ঠাকুরকে আমিও তাই বলে দিয়েছি।

দারোগা। ভাল মনে করে দিয়েছ। রাঁধবার জন্যে সেই নূতন বামুন কয়েদীটাকে পাঠিয়েছ; বেটা রাঁধে ভাল। শুনলাম সে নাকি একটা বড়লোকের বাড়ীতে রাঁধুনি বামুন ছিল;—অনেক দিন ছিল। পোলাও, কাবাব, কোম্মা, কোপ্তা—আঃ নাম করতে করতে জিভে লাল এসে গেল—এই সব ভাল ভাল রান্না রাঁধত। তাহার পর বেটার দুর্ব্বুদ্ধি হল; বাড়ীর গিন্নীর গলার হার চুরি করলে, ওর বিছানার বালিশের তলায় তা পাওয়া গেল। বাড়ীর কর্ত্তা তাকে একেবারে পুলিশের হাতে স'পে দিলেন। পুলিশ, মায় বালিশ ও হার—বেচারাকে সোপকরণ নৈবেদ্যের মত আদালতে নিবেদন করে দিলে। আদালত, সাক্ষী সাবুত তলব করে স্থির করলেন যে, বেটা পুরাতন চোর। কেন-না বাড়ীর একজন নবীনা চাকরাণী সাক্ষিণী হয়ে, আদালতের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে' এবং মৃদু হেসে বললে যে, সে আগে আর একবার গিন্নীর পায়ের চুটকি চুরি করেছিল; তাও এর ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু গিন্নী সে বার ওকে মাপ করেছিলেন; কিন্তু এবার বাবু জান্‌তে পেরে ওকে চালান দিয়েছেন।

হরেন। একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি। আজ জামাই বাবু আসবেন, তাই ওয়ার্ডারকে বলে' বাগান থেকে বাসায় একটা ডালি পাঠিয়েছি। পটল, বেগুন, কুমড়ো, মূলো, মোচা, কাঁচকলা, অম্বল রাঁধবার জন্য বিলম্বী, কাঁচা তেতুল, আমরা এই সব পাঠিয়েছি। আর মালী কয়েদীটাকে দিয়ে,

হু' গাছা বেলফুলের গোড়ে মালা গাঁথিয়ে, আর একটা ফুলের পাখা তৈরী করে পাঠিয়েছি।

দারোগা। আর এক কথা, আজ বাসায় যেন চার সের দুধ যায়।

হরেন। বাড়ী থেকে খবর পেয়ে সে বন্দোবস্ত আমি আগেই করেছি।

দারোগা। সবই হল, কেবল ভাল চালের যোগাড় হল না। দেখ, তুমি ত সব জান,—চালের কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে আমার কি কথা ছিল। সে আমাকে মাসে মাসে দেড়মণ হিসাবে বাঁকতুলসী চাল, আর আধমণ হিসাবে বাদশাভোগ আলোচাল দেবে। বাঁকতুলসীর বদলে বালাম চালিয়েছে; আর বাদশাভোগ এ পর্য্যন্ত এক দানা দেয় নি। আচ্ছা দেখব বাবাজীকে,—এবার নূতন কণ্ট্রাক্টের সময় দেখে নেব।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বাদাম গাছে কাক নহে, কদমগাছে কোকিল।

দারোগা বাবু কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার অভাব ও অভিযোগ বিষয়ক বাক্যপ্রবাহ সংযত করিয়া, কি এক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

অল্পক্ষণ মৌনী থাকিয়া, দারোগা বাবু বলিলেন—"দেখ হরেন, এই ছোকরা রাজদ্রোহীকে কোন 'সেলে' রাখব আমি তাই ভাবছিলাম। আমাদের সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলছিলেন যে, অন্য আসামীদের সঙ্গে যাতে এর কোন মতে দেখাসাক্ষাৎ না ঘটে, এইরূপ ব্যবস্থা করতে হবে। উপরওয়ালাদের কি ? —তাঁরা হুকুম দিয়ে খালাস। কিন্তু সেই হুকুমটি তামিল করতে কতটা বুদ্ধি বিবেচনা চালনা করার দরকার, তা আমরাই জানি।"

হরেন। "তিন নম্বর 'ব্লকে' রাখলে ত বেশ হয়; সেখানে অন্য রাজদ্রোহী আসামী আর কেউ নেই; আর সেখানে পাহারার বন্দোবস্তও ভাল।

দারোগা। সেখানে দোতলায় কি কোন 'সেল' খালি আছে?

হরেন। আমি জানি, একাত্তর নম্বর 'সেল' খালি আছে। অন্য সেলও খালি থাকতে পারে।

দারোগা। চল, আমরা এই রাজদ্রোহী আসামীকে সেই সেলে রেখে আসি।

এই বলিয়া দারোগা বাবু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হরেন উঠিল এবং উঁহাদের আদেশে আমিও উঠিলাম। আমরা অগ্রসর হইয়া, জেলখানার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে অতি পরিচ্ছন্ন তৃণাচ্ছাদিত ভূমির মধ্যে কয়েকটি পরিচ্ছন্ন ও রক্তরজোময় সুন্দর রাস্তা ছিল, এবং কতকগুলি সুদৃশ্য ও সুগঠিত অট্টালিকা ছিল। সেই হরিদ্বর্ণ তৃণক্ষেত্র পার হইয়া, সেই রমণীয় পথ অতিক্রম করিয়া, সেই অট্টালিকাগুলির মধ্যে একটিতে আসিয়া আমরা পৌছিলাম। ঐ অট্টালিকাই তিন নম্বর ব্লক। আমরা তাহার দ্বিতলে উঠিলাম। সেখানে এক দীর্ঘ বারান্দার প্রান্তভাগে ছোট একটি কক্ষ ছিল। ঐ কক্ষ আমোর বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দারোগা বাবু বলিলেন— "ওহে রাজদ্রোহী! তুমি এই স্থানে স্বচ্ছন্দে পনের দিন বাস করবে; আর, নির্ভাবনায় নিয়মিত আহার করে' তোমার সুন্দর দেহের উন্নতি করবে। কিন্তু দেখো বাবাজী, এখানে যেন কোনও রকম বিদ্রোহ উপস্থিত করো না। আর, কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস যে, তোমরা এখানে বন্দুক গোলাগুলি ইত্যাদি আমদানী করে থাক; এ সকল কিছুই করো না।"

হরেন। বাস্তবিক, সেই ঘটনায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিল্যাম। এই কড়াকড় পাহারা! এর মধ্যে লোকটা কি

রকমে কোন পথ দিয়ে রিভলভার আনলে? লোকটা নিশ্চয় কোন রকম যাদুবিদ্যা জানে।”

দারোগা বাবু হরেনের কথার উত্তর না দিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় বলিলেন—“দেখ, এই দক্ষিণদিকে একটা জানালা আছে; ঝুরঝুর ফুরফুর করে বেশ হাওয়া আসবে; তুমি আরামে ঘুমাবে। কিন্তু ঐ জানালার গরাদে ভেঙ্গে যেন পালাবার চেষ্টা করো না; ওখান থেকে লাফালে তোমার সুন্দর শরীর চুরমার হয়ে যাবে।

আমি কারাগারে বাস করিতে লাগিলাম। সেখানে আহার বিহার ও শয়ন জন্য আমাকে কোনও প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। নিয়মিত স্বাস্থ্যকর আহার, প্রত্যহ নির্দ্ধারিত সময়ে বহির্ব্বিহার, নিত্য পরিষ্কৃত আবাস কক্ষ, সংস্কৃত শয্যা, কোন বিষয়েরই ত্রুটী ছিল না। ডাক্তার সাহেব আসিয়া হাত মুখ ও জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া, কাহারও পীড়া হইয়াছে কি না দেখিয়া যাইতেন; জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সর্ব্বদাই আমাদিগের খবর লইতেন; এবং দারোগা বাবু সেই হরেনকে লইয়া মাঝে মাঝে গল্প শুনাইতে আসিতেন। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন অতিবাহিত হইল।

পাঁচ ছয়দিন পরে, একদিন দারোগাবাবু, হরেনকে সমভিব্যাহারী করিয়া আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু উত্তেজিত স্বরে কহিলেন—“পুলিশ তোমাকে একজন পলাতক রাজদ্রোহী অনুমান করে নিশ্চয়ই একটা ভুল করেছে, এ আমি দিব্যি করে বলতে পারি। কি বল তুমি?”

আমি। আমি বলি যে পুলিশ সত্যিই ভুল করেছে।

দারোগা। বোধ হয় আদালতে তুমি প্রমাণাদি দিয়ে এই ভুলটা সংশোধন করতে পারবে?

আমি। আমার বন্ধুদের সহায়তা পেলে নিশ্চয় পারব।

দারোগা। তা হলে ভারি একটা মজা হবে। এদিকে কি হয়েছে শুনেছ?

আমি। এই ঘরে আপনারা আমাকে চাবিবন্ধ করে রেখে গেলে, আমি আর কিছুই শুনতে পাইনে। কেবল ঐ বাদাম গাছের ডালে বসে একটা কাক ডাকে, তারই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

দারোগা। আজ সকালে, খবরের কাগজ পড়ছিলাম। দেখলাম যে যারা তোমার মত একজন মহা দুর্দান্ত গোলাগুলি বারুদ-বন্দুক-কামান-প্রস্তুতকারী অস্ত্রধারী পলাতক রাজদ্রোহীকে ধৃত করে গুণপনা দেখিয়েছে, কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেছেন। এটা ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া হয়েছে। আদালতে যখন প্রমাণ হবে যে তুমি মোটেই সে পলাতক আসামী নও, তখন কি মজাটাই হবে! তখন ঐ পুরস্কারটা বাহাদুরীর পুরস্কার না হয়ে সুধু একটা ভুলের পুরস্কার হয়ে দাঁড়াবে। যাক্, উপরওয়ালা যা ভাল বুঝেছেন, তাই করেছেন। আমাদের সে বিষয়ে কথা না কওয়াই ভাল। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি বাপু! কিন্তু তাড়াতাড়ি পুরস্কারটা দিয়ে কর্তৃপক্ষ বেশ বিবেচনার কার্য্য করেন নি।

আদালতের নিষ্পত্তি দেখে কায করলে ভবিষ্যতে কোন গোল-মালেরই আশঙ্কা থাকত না।

কথা কহিতে কহিতে দারোগা বাবু ঘরের চারি দিক বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন; এবং মস্তক অবনত করিয়া, খট্টার তলদেশ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"না, গোলাগুলি বন্দুক কামান বোমা এখানে কিছুই নেই। ঐ সকল প্রস্তুত হবার কারখানাও এ ঘরে দেখতে পাওয়া গেল না। ছাদ ফুটো করে কিম্বা গরাদে ভেঙ্গে এ ঘরে কেউ প্রবেশ করে নি। চল হে হরেন, অপর ঘরগুলো দেখি। একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। বাগান থেকে একটা লাউ বাসায় পাঠিয়ে দিতে হবে। মাছের কণ্ট্রাক্টার সের দুই গল্‌দা চিংড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল, তাই দিয়ে লাউচিংড় রাঁধতে হবে।"

এই বলিয়া, কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া, বাক্যপ্রবাহে বারান্দা প্লাবিত করিয়া দারোগা বাবু সে দিনের মত প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু পরদিন বেলা দশটার পর, পুনরায় আমার কক্ষে একাকী দর্শন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আহারাদির কোন প্রকার অসুবিধা হচ্ছে না ত?"

'আপনি' সম্বোধনে আমি বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, হঠাৎ এ সৌজন্য কেন? যাহা হউক, আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। বলিলাম, "না মশায়, এখানে আমি কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করিনে।"

দারোগা। কোনও রকম নয় ?

আমি। না একটুও নয়।

দারোগা। Edwards সাহেব যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার কোন প্রকার অসুবিধা হচ্ছে কি না, তা হলেও আপনি ঐ উত্তর দেবেন ?

আমি। অন্য উত্তর কেন দেব ?

দারোগা। দেখবেন, আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবেন না।

আমি। Edwards সাহেব কে ?

দারোগা। বাবা ! Edwards সাহেব কে, জানেন না ? তাঁর নাম শোনেন নি ? বড় আশ্চর্য্য ত ! তিনি হাইকোর্টের একজন খুব বড় ব্যারিষ্টার। তিনি আপনার পক্ষে নিযুক্ত হয়েছেন ; আর, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি নিয়ে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বড় ভয়ানক ব্যারিষ্টার ! হয়কে নয় করতে পারেন। দেখবেন মশায়, আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবেন না। তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন, এখানে আপনার কোন রকম কষ্ট হচ্ছে কি না। দেখবেন, আপনার কথায় আমি যেন কোন ফ্যাসাদে না পড়ি। আপনি এত বড় লোক, আগে তা জানতাম না। তা জানলে, রোগীদের দুধে একটু জল মিশিয়ে, আপনার জন্যে আধ-সের দুধের বরাদ্দ করে দিতাম।

আমি। আমি অতি দরিদ্র, ধনী নই।

দারোগা। আর আমাকে ঠকাতে পারবেন না। শুনলাম এডওয়ার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করতে হলে, প্রত্যহ এক হাজার কুড়ি

টাকা হিসাবে ফী দিতে হয়। কুবেরের মত বড় লোক না হলে এ কায কি অন্য কেউ পারে ?

বুঝিলাম ইহা অপরাজিতার কার্য্য—সে তাহার সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া আমাকে রক্ষা করিবে। এই নারী, ইহাকেই ত্যাগ করিবার জন্য আমি বাল্যকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম! অজ্ঞ বালক আমি, তখন বুঝি নাই যে, এই নারীকে ত্যাগ করিতে হইলে করুণাময়ের সমস্ত করুণা ত্যাগ করিতে হয়; ধরণীর সমস্ত মাধুর্য্য মুছিয়া ফেলিতে হয়।

আমাকে নীরব দেখিয়া দারোগা বাবু বলিলেন, "চলুন, আপনাকে নিয়ে আমার সেই আফিস ঘরে যেতে হবে।"

আমি দারোগা বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। আফিস কক্ষের দ্বারে পৌঁছিয়া, দারোগা আমার দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "দেখবেন মশায়, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, যেন কোন ফ্যাসাদে না পড়ি।"

আমি বলিলাম—"আপনার কোন চিন্তা নেই। আমার দ্বারা আপনার কোনও প্রকার অনিষ্ট হবেনা।"

দারোগা বলিলেন—"দেখুন, কাল সেই যে বাদাম গাছে কাক ডাকার কথা বলছিলেন, সে কথাটা যেন সাহেবের কাছে বল্‌বেন না। সাহেব সে কথা শুনলে রেগে যেতে পারে। বলবেন, যে আপনার ঘরটির দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে, কদমগাছে কোকিল ডাকে।"

আমি হাসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এডোয়ার্ড সাহেব, এবং বাবাজীর বাল্য পরিচয়।

দারোগাবাবুর অফিস-কক্ষে, একখানি চেয়ারে কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এডোয়ার্ড সাহেব অন্যমনে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার মাথার প্যানামা টুপিটা তাঁহার আসনের সম্মুখে টেবিলের উপর স্থাপিত ছিল। বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায়, তাঁহার বিশাল ললাটের উপর, তাঁহার বিরল কেশ গুলি অল্প আন্দোলিত হইতেছিল; তাঁহার মস্তকমধ্যস্থ ইন্দ্রলুপ্তের উপর ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দুগুলি ক্রমে অদৃশ্য হইতেছিল। তাঁহার সম্পূর্ণ শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন বদন-মণ্ডলে, একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ক্রীড়া করিতেছিল;—পৃথিবী যেন তাঁহার কাছে একটা রঙ্গালয়। তাঁহার অতি সূক্ষ্ম নাসাগ্র, অস্ত্র-চিকিৎসকের তীক্ষ্ণাস্ত্রের ন্যায়, যেন একটা দুষ্টব্রণের উদ্দেশে উদ্যত হইয়া ছিল। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ অত্যন্ত নির্ম্মল পরিচ্ছেদে আবৃত ছিল।

আমাকে দেখিয়া, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আপনিই কি সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, আমার পিতামাতা আমাকে ঐ নামই প্রদান করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আত্মগোপন জন্যে আমি সকল সময় ঐ নাম ব্যবহার করি নি।"

সাহেব বলিলেন—"আপনি বসুন। আমি আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কইতে ইচ্ছা করি।"

দারোগা বাবু ব্যস্ততার সহিত স্বহস্তে একখানা চেয়ার আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন; দেখাইয়া দিলেন, বিচারাধীন আসামীদিগের প্রতি তাঁহার কিরূপ অসীম যত্ন! আমি সেই চেয়ারে উপবেশন করিয়া, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি কোন্ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা কইতে চান?"

সাহেব বলিলেন—"আপনার মকর্দ্দমায়, আমি আপনার পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হয়েছি। আপনার আত্মীয়গণ আমাকে নিযুক্ত করেছেন। আপনি কি রকম অবস্থায় এই মিথ্যা অভি-যোগে জড়িত হয়েছেন, আর আপনার সম্বন্ধে অন্য সমস্ত বিবরণ তাঁরা আমাকে বলেছেন। তবু আরও দু' একটা বিষয় আমি আপনার কাছ থেকে বিশেষ ভাবে জেনে নিতে ইচ্ছা করি। সেই জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

আমি। কি জানতে চান বলুন, আমার সম্বন্ধে সকল সংবাদই আপনাকে দেব।

সাহেব। আপনার স্মরণ আছে যে বেনারস ষ্টেশনে, আপনার পকেটে একটি ছুরী আর মহারাজ শিবাজীর একখানি ছোট ছবি পাওয়া গিয়েছিল। ওগুলি কি করে আপনি পেয়ে-ছিলেন?'

আমি। ছুরীখানি আমি আমার এক সহযাত্রীর কাছে পেয়েছিলাম। আর ছবিখানি, সেই সহযাত্রীর অনুরোধে লক্ষ্ণৌ

ষ্টেশনে কিনে, নিজের পকেটে রেখেছিলাম; মনে করেছিলাম, পরে সেটা তাঁকে ফেরত দেব।

সাহেব। আপনার সেই সহযাত্রীর আত্মীয়গণের এমন ইচ্ছা নয় যে, আদালতে আপনি তাঁর নাম প্রকাশ করেন; তাঁরা ভয় করেন যে, আদালতে সেই সহযাত্রীর নাম প্রকাশ হলে, পুলিশ তাঁকে আদালতে টেনে আনবার চেষ্টা করবে। অতএব ঐ দু'টি জিনিষ আপনার নিজের, একথা বলতে দোষ কি? তা মিথ্যা কথা হবে না। কারণ ঐ জিনিষ দু'টি তিনি আপনার জন্যে কিনে, আপনাকেই দিয়েছিলেন। সুতরাং তা আপনার। আমি আপনাকে আদালতে সেই কথা বলতেই উপদেশ দিচ্ছি,—কারণ সেই সত্য। আমি আমার মোয়াক্কেলকে, কখনও কোন রকম মিথ্যা কথা বলতে উপদেশ দিই নে।

আমি। জিনিষ দুটি আমার নিজের, আমি এই কথাই আদালতে বলব।

সাহেব। বেশ। আপনি জানবেন, যে, এই মকর্দ্দমায় ভাল ভাল সাক্ষী আপনার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন; সমস্ত সত্য কথা প্রকাশ পাবে; এবং আপনি সহজেই মুক্তিলাভ করতে পারবেন। আমার বন্ধু এবং আপনার গুরু, হরিদ্বারের বিখ্যাত সন্ন্যাসী বিঠুর বাবাজী আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। তিনি আজ হরিদ্বার ত্যাগ করে, কলিকাতা অভিমুখে আসছেন, তারে সংবাদ পেয়েছি।

আমি। বিঠুর বাবাজী আপনার বন্ধু হলেন, কি করে?

সাহেব। আমরা বিলাতে মিডল টেম্পলে একত্রে আইন পড়তাম। তার পর, এ দেশে এসে, কিছুদিন দুজনেই কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করেছি।

আমি। বাবাজী ব্যারিষ্টারি করেছিলেন?

সাহেব। নিশ্চয়। দেখছি, আপনি বাবাজীর পূর্ব্ব পরিচয় জানেন না।

আমি। না, আমি তাঁর পূর্ব্ব পরিচয় কিছুই জানি নে। আপনি যদি তা জানেন, আমাকে তা বল্লে কৃতার্থ হব।

সাহেব। আমি যা জানি, আনন্দের সহিত আপনাকে বলব। বিঠুর বাবাজীর পূর্ব্ব নাম ছিল,—তারানাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি পিতামাতার অষ্টম সন্তান। আপনাদের দেশে লোকে বিশ্বাস করে যে, কেউ মাতার অষ্টমগর্ভজাত হলে, সে কালক্রমে একজন অসাধারণ লোক হয়। এই বিশ্বাস নিয়ে তারানাথ বাল্যজীবন আরম্ভ করেছিলেন।

আমি। বাবাজী কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

সাহেব। নদীয়া জেলায়, শান্তিপুরের কাছে হরিপুর নামে এক পল্লীগ্রামে।

আমি চমকাইয়া উঠিলাম; বাবাজীর সহিত সেই প্রথম আলাপের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি উদ্গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঐ গ্রামে বাবাজীর কোনও আত্মীয় এখনও জীবিত আছেন কি? ঐ আত্মীয়ের নাম কি?"

সাহেব। হাঁ, জীবিত আছেন;—তাঁর নাম কাশীনাথ

মুখোপাধ্যায়। তিনি তারানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ঐ হরিপুর গ্রামে পুত্রপৌত্রাদি নিয়ে বাস করছেন।

আমি। ওঃ! তা হলে, অনাথ বাবু বাবাজীর কে?

সাহেব। অনাথ বাবুর সঙ্গে সম্প্রতি আমার পরিচয় হয়েছে। তারানাথের পর, তাঁর আরও দুই সহোদর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠের সঙ্গে বেনারসে আপনার পরিচয় ঘটেছে;—তাঁর নাম মহাদেব মুখোপাধ্যায়। অনাথ বাবু তারানাথের অন্য কনিষ্ঠ সহোদর। তারানাথ সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করেও, এই কনিষ্ঠের মমতা ত্যাগ করতে পারেন নি।—অনাথ বাবুর ভাবী জামাতার মুক্তিসাধনের জন্য, হরিদ্বার থেকে কলিকাতায় ছুটে আসছেন। তারানাথের আর এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; তাঁর নাম সীতানাথ মুখোপাধ্যায়। সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্র আছেন; তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্ণি; তাঁর সঙ্গে ভবিষ্যতে আপনার পরিচয় হবে।

আমি। এতদিন আমার কাছে যা দুর্ব্বোধ ছিল, আপনার মুখে বাবাজীর বংশপরিচয় পেয়ে, তাহা সমস্তই স্পষ্ট হল।

সাহেব। এখন আমি তাঁর বাল্যজীবনের ইতিহাস আপনাকে বলব। দেখবেন, অষ্টম সন্তান সম্বন্ধে আপনাদের সেই সংস্কার, তাঁকে কি জলন্ত উৎসাহে প্রজ্জ্বলিত করে তুলেছিল। বাল্যে তিনি শরীরকে এমন সুপটু করেছিলেন যে, বৃক্ষারোহণে, সন্তরণে, ভারবহনে, দ্রুতগমনে কোন লোকই তাঁকে অতিক্রম করতে পারত না।

আমি। এখনও তাঁর অসাধারণ শারীরিক বল আছে।

সাহেব। তা আমি জানি। এই শারীরিক বলের সঙ্গে, অধ্যবসায়ের গুণে, তিনি অসাধারণ মানসিক উন্নতিও লাভ করতে পেরেছিলেন; তিনি ভারতবর্ষে থেকে সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত, গ্রীক এই দু' ভাষাতে এম্-এ উপাধি গ্রহণ করে' আর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করে' ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে আইন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়ে, তিনি প্রায় একবৎসর ধরে ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থান পরিদর্শন করেছিলেন। পরে কলকাতায় এসে, প্রায় ছয় বৎসর কাল ব্যারিষ্টারি করেন। এই সময় তাঁর ভ্রাতারা তাঁকে এক প্রকার ত্যাগ করেছিলেন;—তাঁরা বলতেন, বিলাত-যাত্রায় তাঁর জাতিচ্যুতি ঘটেছে। ছয় বৎসর ব্যারিষ্টারি করার পর, তাঁর চৌত্রিশ বৎসর বয়সে, তিনি হঠাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করে', ভারত ও তিব্বতের বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে দশবৎসর কাল ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। পরে হরিদ্বারে এসে, শিষ্য গ্রহণ করে, তাদিকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

আমি। একটা বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করব?

সাহেব। কি?

আমি। বাবাজীর হরিদ্বারে যে আশ্রম আছে, তা একটি মস্ত বাড়ী! তাতে প্রায় ত্রিশজন ছাত্র বাস করে, তাঁর নিকট শিক্ষা পায়। ঐ বাড়ী প্রস্তুত জন্যে আর শিষ্যদের

আহার সংগ্রহ জন্যে অর্থের আবশ্যক। বাবাজী তা কোথায় পেলেন? আমি দেখেছি, বাবাজী অন্যান্য সন্ন্যাসীর মত কারও কাছে কখনও অর্থগ্রহণ করেন না।

সাহেব। অন্য কারও কাছে অর্থগ্রহণ করবার আবশ্যকতা তাঁর নেই। একবার আমার কাছ থেকে কিছু অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে আমাকে লিখেছিলেন যে, তাঁর অর্থাভাব নেই। বস্তুতঃ তিনি ব্যারিষ্টারি করে যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে-ছিলেন, তার অধিকাংশ সঞ্চিত ছিল। তাঁরা বনভ্রমণ কালে, ঐ অর্থ কোন ব্যাঙ্কে থাকায়, সেটা সুদে বেড়ে এক লক্ষ টাকার উপর হয়েছিল। ঐ টাকা বাৎসরিক শতকরা পাঁচ টাকা হিসাব সুদে কোন ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন। তাইতে বৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায়। ঐ পাঁচ হাজার টাকায়, তাঁর আশ্রমের সমুদয় ব্যয় অক্লেশে নির্ব্বাহিত হয়ে থাকে।

আমি। আমি আপনার কাছে বাবাজীর সকল কথা শুনে ধন্য হলাম।

সাহেব। আপনি ইচ্ছা করলে এ সকল কথা বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করে', বহুপূর্ব্বে জানতে পারতেন, তিনি তাঁর সম্বন্ধে কোনও কথা গোপন করেন না; জিজ্ঞাসা করলেই বলেন। তবে, আপনা হতে অত্মপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করা তাঁর স্বভাব নয়। এখন আমি আপনাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিদায় গ্রহণ করব।

আমি। কি প্রশ্ন ?

সাহেব। পুলিশ রিপোর্টে দেখলাম, আপনি স্বীকার করেছেন, যে আপনি শুঁড়োর এক বাগান বাড়ীতে যেতেন।

আমি। প্রায় চার বৎসর পূর্ব্বে, আমি দুই দিন এক বাগান বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

সাহেব। কেন গিয়েছিলেন ? এ সম্বন্ধে আপনার কোন আত্মীয়ই কোন প্রকার সংবাদ অবগত নন। তাই, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হল।

আমি। আমি লোকমুখে শুনেছিলাম যে, সেখানে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী এসেছেন। তাঁর অদ্ভুত কার্য্যকলাপের গল্পে বিশ্বাস করে, মুগ্ধ হয়ে আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তাঁরই উপদেশে আমি গৃহত্যাগ করে' হরিদ্বারে গিয়েছিলাম, আর বিঠুর বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলাম।

সাহেব। যে বাগানে ঐ সন্ন্যাসী পাঁচবৎসর পূর্ব্বে বাস করেছিলেন, সে বাগান কার, কোন রাস্তার ধারে, তা কি আপনার স্মরণ আছে ?

আমি। সে বাগান মুরলীধর রোডের ধারে, রায় মুরলীধর মল্লিকের বাগান-বাড়ী। এখন কোনও মারোয়াড়ী কিনেছে।

সাহেব। সেই সন্ন্যাসী এতদিন পরে আপনাকে দেখলে চিনতে পারবেন ?

আমি। খুব সম্ভব, পারবেন।

সাহেব। আমরা এই সন্ন্যাসীকে খুঁজে এনে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করব। এখন আমি কার্য্যান্তরে যাই।

আমি। আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে একটা সংবাদ নেব। পাছে কুসংবাদ পাই, এজন্য সংবাদটা নিতে আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হচ্ছে। আপনি বল্লেন যে আমার কোন আত্মীয়ই আমার শ্বঁড়োর বাগানবাড়ীতে যাওয়ার সংবাদ জানেন না। আপনি কি আমার সকল আত্মীয়েরই সংবাদ নিয়েছেন?

সাহেব। হাঁ, সকল আত্মীয়েরই সংবাদ নিয়েছি।

আমি। আমার মার?

সাহেব। হাঁ, তাঁরও সংবাদ নিয়েছি।

আমি। তিনি কি বেঁচে আছেন?

সাহেব। তিনি জীবিত ও সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

আমি। তিনি কোথায় আছেন?

সাহেব। শ্যামবাজারে আপনাদের বাড়ীতে।

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। অতি কষ্টে অশ্রু-প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া, সাহেবকে বিদায় দিলাম। তাহার পর, কক্ষ-তলে বসিয়া, অশ্রুধারার পর অশ্রুধারা ঢালিতে লাগিলাম। দারোগা বাবু দূরে দাঁড়াইয়া, আমার এই অশ্রুবিসর্জ্জন দেখিতে লাগিলেন, আমার সহিত কথা কহিতে সাহস করিলেন না। ইহা কি অশ্রুজল? না, আমার মাতার রক্ষাকর্ত্তার পাদপদ্মে, আমার হৃদয়-মথিত তরল কৃতজ্ঞতা!

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাজসাক্ষী ও সদানন্দ সায়গাল।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আমার বিচার আরম্ভ হইল। সেখানে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, একদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় পুলিশের লোক আমাকে হাজির করিল। কতকগুলি অপরিচিত লোকের সহিত একত্রে আমাকে দাঁড় করাইয়া, পুলিশ এক অপরিচিত লোকের দ্বারা আমার 'সেনাক্ত' করাইল।

যে সেনাক্ত করিল, সে রাজসাক্ষী; অর্থাৎ সে নিজে অপরাধীদিগের মধ্যে একজন হইলেও সে তাহার অপরাধ স্বীকার করায়, এবং তাহার সঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হওয়ায়, কর্তৃপক্ষ তাহাকে বন্ধুদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতক জানিয়া, তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন। সরকারী উকীলের প্রশ্নে সে যাহা বলিল, তাহাতে আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, হাঁ, ঐ ব্যক্তি রাজসাক্ষী হইবারই উপযুক্ত; সাধারণ সাক্ষীতে এমন নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতে পারে না।

সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল,--"আমার নাম, অহিভূষণ চক্রবর্ত্তী। আমার পিতার নাম, ৺মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী, আমার বাড়ী বরিশাল জেলায় জানবিবি গ্রামে। আমার বয়স তেইশ বৎসর। আমি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আমি ও এই অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী, অপর তিনটি

বালকের সহিত; সুঁড়োর নিকট শ্যামপুরে একটা বাড়ী ভাড়া লইয়া, কিঞ্চিদধিক সাত বৎসর কাল বাস করিয়াছিলাম। আমরা শেয়ালদহের স্কুলে পড়িতাম। বাসায় ফিরিয়া আমরা যুগান্তর ও গীতা পড়িতাম; এবং দেশে একটা রাজদ্রোহ সৃষ্টি করিবার জন্য আমরা নানারূপ উপায় চিন্তা করিতাম। সুঁড়োর বাগানে, আমাদের বোমা তৈয়ারীর কারখানা ছিল; সেখানে আমরা পিস্তল ছোড়াও অভ্যাস করিতাম। আমাদের চারিটা পিস্তল ছিল। ঐ পিস্তলগুলি এই অনিলকৃষ্ণের বাক্সে লুকাইত থাকিত। অনিল পলাইবার সময় পিস্তলগুলি লইয়া গিয়াছিল। উহা এক্ষণে কোথায় লুকাইয়াছে, বলিতে পারি না। আমাদের নিকট একখানি শিবাজীর ছবি ছিল; আমরা উহা পূজা করিতাম; উহাও পলাইবার সময় অনিলকৃষ্ণ লইয়া গিয়াছিল। অনিল আমার সহিত শেয়ালদহ স্কুলে ম্যাট্রিকুলেসন ক্লাশে পড়িত। উহারও বাড়ী বরিশাল জেলায়; কোন্ গ্রামে তাহা আমার মনে পড়িতেছে না। আমি ও অপর তিন জন আসামী চারি মাস পূর্ব্বে ধরা পড়ি; অনিল তখন ধরা পড়ে নাই। তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত অনিল কোথায় ছিল, তাহা আমি বলিতে পরি না।”

আমার পক্ষের ব্যারিষ্টার এডওয়ার্ডস্ সাহেব রাজসাক্ষীর জেরা করিলেন।—

প্রশ্ন। শেয়ালদহের কাছে, বউবাজার রাস্তার ফুটপাতের ধারে, মদের দোকানের পাশে চার মাস আগে তুমি কি পাণ ও বিড়ি বিক্রী করতে?

উত্তর। কেন? কে বল্লে? না, আমার বিড়ির দোকান ছিল না।

প্র। বউবাজারে, কোনও গলির ভিতর একখানা খোলার ঘরে কি তোমার মা বাস করে? সত্য কথা বল।

উ। মা? আমার মা? দাঁড়ান মনে করে দেখি। না, আমার মা খোলার ঘরে বাস করে না। সে অনেক দিন হল মারা গিয়েছে।

প্র। শেয়ালদহ স্কুলে, তুমি কি অনিলের সঙ্গে একত্রে পড়তে?

উ। হ্যাঁ।

প্র। ঐ স্কুলের রেজিষ্টারে তোমাদের নাম আছে?

উ। তা বলতে পরি না। আমরা রীতিমত স্কুলে যেতাম না বলে, হয়ত আমাদের নাম কেটে দিয়েছে।

প্র। কত দিন থেকে তোমরা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছ?

উ। ঠিক মনে নেই; বোধ হয় আমরা একবছর স্কুলে যাই নি।

প্র। তা হলে গত বৎসর, কিম্বা ১৯১৫ সালের রেজিষ্টারিতে তোমাদের নাম আছে?

উ। ঠিক বলতে পারি নে। থাকতে পারে, না থাকতেও পারে। না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী।

প্র। কেন?

উ। আমরা স্কুলে আমাদের যথার্থ নাম বলিনি।

প্র। স্কুলে তোমার কি নাম ছিল?

উ। স্কুলে? স্কুলে—স্কুলে আমার নাম? স্কুলে আমার, আমার নাম ছিল? আমার নাম ছিল,—এই—জ্যোতি, জ্যোতিষ-কুমার রায়।

প্র। তুমি স্কুলে মাসিক বেতন কত দিতে?

উ। মাসিক তিন টাকা; না না, আড়াই টাকা।

প্র। সেখানে কি কি পুস্তক পাঠ করতে?

উ। আমার মনে নেই। মনে পড়ছে না।

প্র। চেষ্টা করে মনে কর।

উ। কিছুতেই মনে পড়ছে না।

প্র। আচ্ছা, একখানা পুস্তকের নাম মনে করে বল।

উ। আমার একখানা পুস্তকের নামও মনে নেই।

প্র। তুমি কোনও ইংরাজি পুস্তক পড়েছ?

উ। পড়েছি।

প্র। একখানা পুস্তকের নাম কর।

উ। একটা নামও মনে পড়ছে না।

প্র। আচ্ছা, পুস্তকের নামে দরকার নেই। তুমি একটা ইংরাজি কথা বল।

উ। আমি ইংরাজি কথা কইতে জানি নে।

প্র। একটা কথাও নয়?

উ। একটাও জানি নে।

প্র। তুমি বলছ যে তোমরা গীতা পড়তে?

উ। পড়তাম।

প্র। তুমি গীতার কোনও শ্লোক আবৃত্তি করতে পার?

উ। না।

প্র। একটাও নয়?

উ। না, আমার একটা শ্লোকও মনে পড়ছে না।

প্র। আচ্ছা, শ্লোকে দরকার নেই। ঐ পুস্তকে কি লেখা আছে জান?

উ। জানি। তাতে ইংরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করবার উপদেশ আছে। আর বোমা তৈয়ারী করবার কথা আছে, আর বারুদ তৈয়ারী করবার উপদেশ আছে। আরও অন্যান্য অনেক কথা আছে, সব আমার মনে পড়ছে না।

প্র। ভাল, বোমা প্রস্তুত করতে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তুমি বলতে পার?

উ। এই বারুদ, এই গন্ধক—আর অন্যান্য সব জিনিষ।

প্র। অন্যান্য জিনিষগুলির নাম কি তাহা বোধ হয় তুমি বলতে পার না?

উ। না।

আরও দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, ব্যারিষ্টার সাহেব রাজসাক্ষীকে বিদায় দিলেন।

রাজসাক্ষী কাষ্ঠবেষ্টনী হইতে নির্গত হইলে, পুলিশপক্ষের অপর একজন সাক্ষী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

সরকারী উকীলের প্রশ্নে সে বলিল—"আমার নাম, বেনও-

য়ারীলাল কুণ্ডু। আমার পিতার নাম, অঘোরনাথ কুণ্ডু। নিবাস শ্যামপুর গ্রামে। পেশা, মুদিখানার দোকান। শ্যামপুরের এক বাসাবাড়ীতে আমি এই অনিল বাবুকে দেখেছি। বাসাখরচের চাল, ডাল, নুন, তেল ওঁরা আমার দোকান থেকে প্রায় সাত বছর ধরে অর্থাৎ ১৯১০ সাল থেকে এই ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত খরিদ করেছিলেন। তার দাম আদায়ের জন্যে আমি কখন কখন ওঁদের বাসায় যেতাম। এই রকমে এই মোকর্দ্দমায় আসামী সকলকে আমি সেই বাসাবাড়ীতে দেখেছি। ঐ সকল জিনিষ ছাড়া ওঁরা কখন কখন আমার দোকান থেকে কেরোসিন তেল, ধুনো, গন্ধক খরিদ করতেন।

বেনওয়ারীলাল সাক্ষ্য মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, আদালতের একজন চাপরাসী উহার মধ্যে একটী চেয়ার রাখিয়া গেল। সেই চেয়ারে আসিয়া, বিচারককে সেলাম করিয়া, বসিলেন— সাহজাহান্‌পুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেই পুরুষোত্তম সায়গাল। সরকারী উকীল তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"আমি কয়েকদিন পূর্ব্বে বেরেলি ষ্টেশন থেকে সাহ-জাহান্‌পুর ষ্টেশনে আসছিলাম। আমার সঙ্গে আমার পত্নী ও পিতা ছিলেন। আমরা যে গাড়ীতে উঠলাম, তাতে এই যুবক আসামী ও একটি বাঙ্গালী যুবতী পূর্ব্ব হ'তে বসে ছিলেন; এঁরা আরও পশ্চিমের কোনও ষ্টেশন থেকে আসছিলেন। এই যুবক, আমার পিতার সঙ্গে কথা কয়েছিল। আমার পিতা যুবকের নাম জিজ্ঞাসা করায়, যুবক অল্প ইতস্ততঃ করে' পরে

নাম বলেছিল—অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী। ঐ অনিলকৃষ্ণকে ধরবার জন্যে যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছিল, তা আমি দেখেছিলাম, সুতরাং আসামীর নাম শুনে আমি সাহজাহান্‌পুরের ষ্টেশন থেকে নানাস্থানে পুলিশকে সেই সংবাদ তারযোগে জ্ঞাপন করে-ছিলাম। এই ঘটনা, পনের দিন পূর্ব্বে, সেপ্‌টেম্বর মাসের সাত তারিখে ঘটেছিল। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই আসামী, আর যে ব্যক্তি অনিলকৃষ্ণ নাম বলেছিল, একই ব্যক্তি।”

পুরুষোত্তম সায়গাল, বাবুর পর, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা সেই সদানন্দ সায়গাল ধীরে ধীরে মঞ্চারোহণ করিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। তিনিও আমাকে দেখিয়া চিনিলেন। বৃদ্ধ, পুত্র-পরিত্যক্ত চেয়ার খানাতে উপবেশন করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মানিত আসনে পাছে একটা বাজে লোক বসিয়া পড়ে, এই ভয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া একজন চাপরাসী সহসা তাহা সরাইয়া লইল। উপবেশনোদ্যত বৃদ্ধ, আসনাপসরণের কথা অবিদিত থাকিয়া, তাহাতে উপবেশন করিতে গিয়া সহসা সজোরে মঞ্চকাষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। ইহাতে তাঁহার গুরুভার স্থূল দেহ ব্যথিত হইল, সন্দেহ নাই। ইহাতে আদালত, তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া সহসা উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বিহ্বল নয়নে চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোনক্রমে একত্র করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে সেখান হইতে ‘কুর্সী’ খানি অন্তর্হিত হইয়াছে।

হাস্যবেগ কোনমতে প্রশমিত করিয়া, সরকারী উকিল বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—"অ পনার নাম কি ?"

বৃদ্ধ সদানন্দ, আপনাকে সম্পূর্ণ আনত করিয়া বিচারক সাহেবকে দুইবার, এবং সরকারী উকিল বাবুকে একবার সেলাম করিলেন। পরে আবার পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া দেখিলেম যে পুনঃ পতনের আর কোন প্রকার আশঙ্কা বিদ্যমান আছে কি না। পরে নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন—"আমার নাম সদানন্দ সায়গাল, পিতার নাম ৺গুরুদিত্তা সায়গাল। নিবাস টারফেণি গাঁও, জিলা বেরিলি। পেশা জমিদারী। আমার পুত্রের নাম..."

"পুত্রের নামের দরকার নেই। আপনার পুত্রকে আমরা চিনি।"

"সাহজানপুরের ডেপুটী ; ছয় শত টাকা দরমাহ।"

"আপনি এই আসামীকে চেনেম ?"

"চিনি।"

"কিরূপে চিনলেন ?"

"টারফেণি গ্রামে আমার জিমিন্দারীতে আমি বাস করি। আমাদের পাকা বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে থাকি, আর খাজনা তহশীল করি, জিমিন্দারী দেখি। বেশ আরামে থাকি। কিন্তু এবার আমার কঠিন পীড়া হয়েছিল ;—বড় ভারি বেয়ারাম। ভারি পিপাসা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল খেতে লাগলাম। চাকরেরা ঘোড়ায় চড়ে' বেরিলি থেকে বরফ এনে দিলে ; বেরিলি থেকে ডাক্তার এসে বোতল বোতল ঔষধ খাওয়ালে ; কিন্তু কিছুতেই

পিপাসার শান্তি হল না। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাবার মত হল—”

“তার পর, আপনি এই আসামীকে কিরূপে চিনলেন?”

“তখন জ্বরে ও পিপাসাতে আমি এত কাতর হয়েছিলাম যে, আমি চোখে দুনিয়া সব অন্ধকার দেখছিলাম। তখন দেখলে আমি আসামীকে চিনতে পারতাম না।”

“পরে কিরূপে চিনলেন?”

“পরে আমার ভয় হল, পাছে মরে যাই। ভয়ে, ছেলেকে তার করলাম। আমার ছেলের নাম পুরুষোত্তম সায়গাল; সাহজাহানপুরের হাকিম। পুরুষোত্তম, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে সাত দিনের ছুটি নিয়ে, আমার পুত্রবধূর সঙ্গে বাড়ী এল। বড় ভাল ছেলে; তাকে দেখে, আমার অর্দ্ধেক ব্যারাম ভাল হয়ে গেল। তার পর তার সেবায় আমি ভাল হলাম। মরলাম না, ভাল হয়ে উঠলাম। তারপর আমার ছেলে পুরুষোত্তম, সাহজাহানপুরের হাকিম, আমাকে বল্লে, ‘চলুন, আপনাকে সাহজাহানপুরে নিয়ে যাই।’ সেখানে আমার তিনটি নাতি ছিল,—বড়টি বড় সুন্দর, ঠিক এই আসামীর মত। তাদের অনেক দিন দেখিনি। কাযেই আমি ছেলের সঙ্গে সাহজাহান-পুরে যেতে স্বীকৃত হলাম; এবং দ্রব্যসামগ্রী গুছিয়ে বেরিলি ষ্টেশনে এলাম। গাড়ীতে চড়ে এই আসামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।”

“এই আসামীই ঠিক সেই ব্যক্তি?”

"হ্যাঁ, ঐ চেহারা, আমার ভুল হবার নয়।"

"এই আসামী আপনাকে আপন নাম বলেছিল?"

"হ্যাঁ, বলেছিল।"

"কি নাম বলেছিল?"

"তা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম; আমি এই মকর্দ্দমায় সাক্ষী হয়েছি শুনে, আমার ছেলে পুরুষোত্তমকে জিজ্ঞাসা করে, তা জানলাম। এখন আবার তা বিলকুল ভুলে গিয়েছি। কি, কি গাঁ-ওয়াল? না, কোন মতেই মনে পড়ল না। বুড়ো হয়েছি, এখন আর স্মরণশক্তির তেমন জোর নেই।"

এই চারিজন সাক্ষীর উক্তিতে আমার মনে হইল, বিচারক বেশ বুঝিতে পারিলেন যে আমি অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী; আমিই শ্যামপুরের বাসাবাটীতে থাকিয়া, শেয়ালদহ স্কুলে পড়িতাম; আমি মুদীর দোকান হইতে গন্ধক কিনিয়া শুঁড়োর বাগান বাটীতে বারুদের কারখানা খুলিয়াছিলাম; এবং আমিই চারিমাস পূর্ব্বে, ধরা পড়িবার ভয়ে, চারিটা পিস্তল ও শিবাজীর ছবি লইয়া পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে বেড়াইতেছিলাম। সেইরূপ বুঝিয়া অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া, ও কিছু কাগজপত্র দেখিয়া, তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি জবাবে কিছু বলতে ইচ্ছা কর?"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার জবাব ও সাফাই সাক্ষিগণ।

আমি বললাম—"সাক্ষিগণ যে রকম বল্লে, সে রকম কায আমি কখনও করি নি। আমি শ্যামপুর গ্রামে কখনও বাস করি নি; এ গ্রামের অস্তিত্বও আমি কখনও জানতাম না। ঘুঁড়োর অন্য এক বাগান বাড়ীতে চার বছর আগে আমি দু'বার মাত্র গিয়েছিলাম—বারুদ তৈরি করতে নয়,—একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে। তার পর স্বদেশ ত্যাগ করে, আমি এতদিন হরিদ্বারে বিঠুর বাবাজীর আশ্রমে বাস করছিলাম। আমার নাম অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী নয়—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাকে পুলিস যখন বেনারস ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করেছিল, তখন আমার কোটের পকেটে একখানি ছুরি ও শিবাজীর একখানি ছবি ছিল; তা আমার নিজের সম্পত্তি। আমি হরিদ্বারে বিঠুর বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে লেখাপড়া করতাম। আমি ইংরাজী, উর্দ্দু, সংস্কৃত, হিন্দী ও বাঙ্গালা শিখেছি। আমি ঐ সকল ভাষাতেই কথা কইতে পারি; এবং ঐ সকল ভাষার বই পড়তে পারি।"

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যে সকল কথা বল্লে, তা যে সত্য, তা প্রমাণ করতে পারবে?"

ব্যারিষ্টার সাহেব উঠিয়া বলিলেন—"আমার মোয়াক্কেল

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কয়েকজন লোক সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাঁদের সকলের কথা থেকে আপনি বেশ বুঝতে পারবেন যে, পুলিশ একটা মহাভ্রমে পতিত হয়েছে।"

আমার প্রথম সাক্ষীর ডাক হইল। তিনি গায়ে চাপকান ও মাথায় গোল টুপি পরিয়া, এবং কতকগুলি বহি লইয়া, সাক্ষী-মঞ্চে উঠিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি শেয়ালদহ স্কুলের হেড-মাষ্টার। আমি এই আসামীকে চিনি না। এর নাম কি তাও বলতে পারি না। আমি আমাদের চার বছরের রেজিষ্টারি খুঁজে দেখেছি যে অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী নামক কোন ছেলেই, গত চার বৎসরের মধ্যে আমাদের স্কুলে পড়তে আসে নি। আদালতে দাখিল করবার জন্যে আমি আমাদের রেজিষ্টারিগুলি এনেছি। এতে জ্যোতিষকুমার রায় নামক কোন বালকেরও নাম নেই।"

তাহার পর মঞ্চে উঠিলেন, আমাদের শ্যামবাজার স্কুলের সেই পুরাতন হেডমাষ্টার বাবু নবীনকৃষ্ণ ঘোষ। সেই চাপকান, সেই চোগা, সেই গোঁফ, সেই চশমা, মাথায় সেই অসংস্কৃত কেশ-কলাপ!—দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলাম। তিনি পূরা তিন বৎসর ধরিয়া আমার কালামুখ দেখিয়াছিলেন; কাযেই তিনিও আমাকে সহজেই চিনিলেন। বলিলেন—"এই যুবককে আমি বিলক্ষণ চিনি। এ বাল্যকাল থেকে আমাদের স্কুলে পড়েছে। তিনবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল হয়ে, ইংরাজি ১৯১৩ সালের মে মাসে, অর্থাৎ চার বৎসর পূর্ব্বে এই যুবক কোন অজানিত

স্থানে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল। এর দেহ আরও বলিষ্ঠ হয়েছে বটে, কিন্তু এর মুখ ঠিক আগের মত আছে। আমি শপথ করে বলতে পারি, এই বালক সুশীলকুমার বন্দোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কেউ নয়।"

আমার পক্ষের তৃতীয় সাক্ষী আসিলেন, বাবার আপিসের বড় বাবু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি বলিলেন, "সুশীলকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। ওর পিতা পূর্ব্বে আমাদের আফিসের বড়বাবু ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, আমিই এখন আফিসের হেড অ্যাসিষ্টাণ্ট হয়েছি। এর পিতার সঙ্গে আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। এদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়ীতে আসতেন, আর আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ওদের বাড়ীতে যেতেন। আমরা প্রায়ই পরস্পরকে আহারে নিমন্ত্রণ করতাম। সুশীল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল হলে, আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে, চাকুরীর প্রার্থনায় আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছিলাম। বড়সাহেব ওকে অ্যাপ্রেন্টিস নিতে এবং হাতখরচ জন্য মাসিক পনের টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন; আর বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে ওকে ভাল চাকরী দেবেন। কিন্তু চার বছর পূর্ব্বে, কোনও অজানিত কারণে ও হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হল। ওর মা কেঁদে, পাড়ার প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে ঘুরে বেড়ালেন। আমরা চারিদিকে টেলিগ্রাফ করলাম, পুলিশে খবর দিলাম; কিন্তু কেউ কোন সংবাদ দিতে পারলে না। সুশীলের মার এই বিপদের কথা শুনে, আমাদের বড় সাহেব বড়ই দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি সুশীলের অনুসন্ধানের জন্যে অনেক

অর্থ ব্যয় করেছিলেন ; আর দু' হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি তার মার খোরাকীর জন্যে, আপন পকেট থেকে মাসিক পনের টাকা দিতে লাগলেন। সুশীল ১৯১০ ১৯১১, ১৯১২ সালে শ্যামবাজার স্কুলে পড়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল। ঐ পরীক্ষা দেবার জন্যে, সে ফী জমা দিয়েছিল। ইউনিভার্সিটি ঐ ফী পেয়ে যে রসিদ দিয়েছিলেন, সেই রসিদ ওর মার কাছে ছিল। অদোলতে দাখিল করবার জন্য, আমি তা নিয়ে এসেছি।—তা আদালতে দাখিল করলাম।"

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনাদের বড় সাহেব কে ?"

বড় বাবু বলিলেন—"মেসার্স টমাস্‌ রবিন্সন এণ্ড সন্সের বড় সাহেব—অনারেবল্‌ সার জেম্‌স রবিন্সন্‌। তিনিও এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষী দেবেন। তিনি বলেন, চার বৎসর পূর্ব্বে এই যুবককে একবার মাত্র দেখলেও, এর আকৃতি তাঁর বেশ মনে আছে ; একে একবার দেখলেই, তিনি নিশ্চয় চিনতে পারবেন।"

বিচারক বলিলেন—"সার জেম্‌স্‌ কি আদালতে উপস্থিত হয়েছেন।"

এডওয়ার্ডস্‌ সাহেব বলিলেন—"তিনি বেলা তিনটার সময় আসবেন বলেছিলেন ; এখনও তিনটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি আছে।"

বিচারক বলিলেন—"তিনি আসবামাত্র যেন আমি সংবাদ পাই।"

বড়বাবু সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত করিয়া মঞ্চ হইতে অবতরণ

করিলে, বিচারক অন্য সাক্ষীকে না ডাকিয়া, সার জেম্‌সের জন্য কয়েক মিনিটকাল অপেক্ষা করিলেন। বেলা ৩টা ১০ মিনিটের সময়, এডওয়ার্ডস্ সাহেব, একজন চাপরাসীর ইঙ্গিতে বাহিরে যাইয়া, সার জেম্‌সকে বিচারকক্ষে আনয়ন করিলেন।

তাঁহাকে সাক্ষ্যমঞ্চে উঠিতে হইল না। তিনি ব্যারিষ্টার সাহেবের পার্শ্বে বসিয়া, একাগ্র দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এই যুবক মৃত উমেশের পুত্র সুশীল। এই যুবক ১৯১৩ সালের জুন মাসে হঠাৎ অদৃশ্য হয়। সেই সংবাদ পেয়ে এই যুবকের স্মৃতি আমার মনে বারবার উদিত হয়। চার বৎসর পূর্ব্বে, ওকে আমি যেমন দেখেছিলাম, এখনও ওর মুখ ঠিক তেমনই আছে; কেবল ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছু বলিষ্ঠ হয়েছে।"

আমি মনে করিলাম, সার জেম্‌সের ন্যায় একজন সম্মানিত ইংরাজের এই সাক্ষ্যদানের ফলে, আমি তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিব। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না।

সরকারী উকীল, পাকা উকীল। তাঁহার মাথায় অনেক বুদ্ধি। তিনি সার জেম্‌সকে জেরা করিলেন—"আপনি ঠিক বলতে পারেন, এই যুবক অদৃশ্য হয়ে, এই পাঁচ ছ' বৎসর কাল কোথায়, কি ভাবে জীবন যাপন করছিল?"

সার জেমস বলিলেন—"না। শুনেছি—"

সরকারী উকীল বলিলেন—"থাক; শোনা কথা সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হবে না।"

বিচারক সরকারী উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় লাভ কি ? এই যুবক অনিল নয়, সুশীল,—তা ত এক প্রকার প্রমাণই হয়ে গেল।"

সরকারী উকীল মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন—"আমি প্রমাণ করব, এই সুশীল ও অনিল একই ব্যক্তি। এই সুশীলই ছদ্মনাম গ্রহণ করে, পাঁচ ছয় বৎসর কাল শ্যামপুর নামক গ্রামে বাস করে' সুঁড়োর বাগান বাড়ীতে বোমা প্রস্তত ও পিস্তল ছোড়া অভ্যাস করত। এই সুশীল, যদিও জনসমাজে প্রচার করেছিল যে সে শেয়ালদহ স্কুলে পাঠ করে, কিন্তু তার পক্ষের সাক্ষ্যেই জানতে পারা যাচ্ছে যে তা মিথ্যা। রাজদ্রোহ ছাড়া ওর অন্য কায ছিল না।"

সরকারী উকীলের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সার জেম্‌স বিষণ্ণ হইলেন ; এবং বিচারক এডওয়ার্ডস্ সাহেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

এডওয়ার্ডস্ সাহেব বলিলেন—"সুশীল কি ভাবে কোথায় এই চার বৎসর কাল অতিবাহিত করেছিল, তা আমরা অন্য সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করব।"

বিচারকের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া সার জেম্‌স রবিন্সন চলিয়া গেলে, আমি দেখিলাম, শান্ত ও স্থির পাদক্ষেপে সাক্ষ্যমঞ্চে উঠিতেছেন—স্বয়ং বিঠুর বাবাজী। তাঁহার পবিত্র ললাট প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে ; তাঁহার শান্ত নয়ন-কোণে শান্তি বিরাজ করিতেছে ; তাঁহার মধুরাধর চিরদিনের ন্যায়, সুখ-হাস্যে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। আদালত কক্ষের সমস্ত নেত্র, সেই

অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া, ভক্তিভরে আনত হইল; সমস্ত কক্ষ অত্যন্ত বিস্ময়ে নীরব হইয়া রহিল।

বাবাজী আমার দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"আমার নাম তারানাথ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু লোকে আমাকে বিঠ্‌ঠর বাবাজী বলে। আমি এক্ষণে হরিদ্বারে আপন বাটীতে বাস করে' কতকগুলি সহপাঠীর সহিত বিদ্যালোচনা করে' থাকি। আমি এই যুবকের বিপদের কথা শুনে, হরিদ্বার থেকে কল-কাতায় এসেছি। এই যুবক আমার কাছে বিলক্ষণ পরিচিত। প্রায় চারবৎসর চারিমাস পূর্ব্বে উনি হরিদ্বারে গিয়েছিলেন। তদবধি উনি বরাবর অর্থাৎ এই ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন; অন্য কোন স্থানে যান নি। উনি চৌদ্দ পনের দিন পূর্ব্বে, আপন প্রয়োজন-বশতঃ, হরিদ্বার ত্যাগ করেন। উনি পূর্ব্বে যোগধর্ম্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু যোগধর্ম্ম বিষয়ে আমার জ্ঞান না থাকায়, আমি ওঁর সহায়তা করিতে পারি নি; বরং সন্ন্যাস-ব্রত ত্যাগ করে' ওঁকে সংসারী হতে বলেছিলাম। ওঁর আসল নাম সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি জোর করে' বলছি, ইনি অপরাধী নন, নিরীহ ব্যক্তি। আমি এঁকে কখন পিস্তল বা বন্দুকাদি ব্যবহার করতে দেখি নি। এঁর করতলে কতকগুলি কড়া আছে'; তা ব্যায়ামকালে মুগুর ভাঁজার ফল; তা পিস্তলাদি ব্যবহারে উৎপন্ন হয় নি।"

উপরোক্ত কথাগুলি বাবাজীর ইংরাজি জবানবন্দীর অসম্পূর্ণ

বাঙ্গলা তর্জ্জমা।" বাবাজীর ইংরাজি-কথন প্রণালী ও তাহার বিশুদ্ধতা দেখিয়া বিচারক, সরকারী উকীল এবং তৎকক্ষমধ্যস্থিত যাবতীয় ব্যক্তি বিস্ময়বিষ্ফারিত নেত্রে নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিচারকক্ষ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ ত জানিত না যে, এই কাষায়বস্ত্রাবৃত সরল সন্ন্যাসী, একদিন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন! কেহ ত জানিত না যে নগ্নপদ এই সামান্য ব্যক্তি এক সময় সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া, অপরিমেয় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বাবাজী সাক্ষ্যমঞ্চ হইতে অবতরণ করিলে, তাহাতে কয়েদী-বেশে একব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎকাল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি তাহাকে চিনিলাম; সে সুঁড়োর সেই সন্ন্যাসী। তাহার সেই সুদীর্ঘ রেশমী আল্‌খাল্লা, আর বকম কাষ্ঠের সেই রক্তবর্ণ পাদুকা কোথায় গেল? তৎপরিবর্ত্তে এই অমর্য্যাদাকর অপরাধীর অপরিসর 'জাঙ্গিয়া' এবং লৌহময় পদ-বলয় কে পরাইল? আমি পরে অবগত হইয়াছিলাম যে, কোন কুলবধূকে সংসার ধর্ম্মের অসারতা বুঝাইতে গিয়া, সম্প্রতি তাহার এই বিপদ ঘটিয়াছিল; কুলবধূর অধিকারী তাহার এবং সংসার বিরাগিণী বধূর সন্ধান পাইয়া, রাজদ্বারে জানাইয়া, তাহাকে ছয়-মাসের জন্য রাজার অতিথি করিয়া দিয়াছিলেন।

সে আমার দিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল যে, রায় মুরলীধর মল্লিকের বাগান বাটীতে আমি তাহার সহিত প্রায় চারি-

বৎসর পূর্ব্বে দুইবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এবং সে আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য গৃহত্যাগ করিয়া বিঠুর বাবাজীর নিকট যাইবার উপদেশ দিয়াছিল। ইহা ছাড়া আমার সম্বন্ধে অন্য কোন বিশেষ পরিচয় তাহার জানা ছিল না। অধিক কি, সে আমার নামও অবগত ছিল না। আমি সুশীল কি অনিল, সে তাহার কিছুই জানিত না।

অতঃপর রক্ষিগণ কয়েদী সন্ন্যাসীকে বিচারমঞ্চ হইতে অপসারিত করিলে, বিচারক কিয়ৎকাল নীরবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর এডওয়ার্ডস্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে আমাদের পক্ষে আর কোনও সাক্ষী নাই। তখন তিনি ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আমি আজই এই মকর্দ্দমার শুনানি শেষ করতে চাই।" পরে সরকারী উকীলের দিকে নেত্রপাত করিয়া কহিলেন—"আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন। সেটা কি অত্যন্ত দীর্ঘ হবে?"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সরকারী উকীলের সামান্য বক্তৃতা।

সরকারী উকীল বলিলেন—"আমার বক্তব্য অতি সামান্য। আমি আদালতের মূল্যবান সময় অকারণ নষ্ট করিব না।

"আমার সাক্ষিগণ সকলেই পদস্থ। কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহারা ও রাজসাক্ষী সকলেই সত্য কথা বলিয়াছেন; কেহই একটি মিথ্যাকথা বলেন নাই। লোকে মিথ্যাকথা বলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য। আমার সাক্ষিগণ, আসামীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া, কি স্বার্থ লাভ করিতে পারে? কিছুই নহে।"

শুনিয়া, এডওয়ার্ড্স্ সাহেব আপন মনে বলিলেন—"দুষ্টলোকের পক্ষে, পুলিসের প্রেমলাভ করা বড় কম লাভ নয়।"

সরকারী উকীল সে কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহার সামান্য বক্তব্যগুলি জলদগম্ভীর নাদে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"কাযেই আমার সাক্ষিগণ মিথ্যা বলে নাই। অকারণ মিথ্যা বলিয়া, তাহাদের লাভ কি? আমার প্রথম সাক্ষী, শ্রীমান্ অহিভূষণ চক্রবর্ত্তী—আসামীর একজন বিশেষ বন্ধু ছিল; সে বন্ধুর বিপক্ষে মিথ্যা বলিবে কেন? সেনাক্তের সময়, প্রায় পঞ্চাশ জন লোকের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই যে তাহার বন্ধু অনিল, তাহা সে কিরূপে চিনিল? ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, অহিভূষণ

ও অনিল পরস্পর পরিচিত। অহিভূষণ অনিলকে অনিল নামেই জানিত; অনিল যে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া কাল্পনিক পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহা সরল অহিভূষণ বুঝিতে পারে নাই। আসামী এই কাল্পনিক নামেই যে শ্যামপুর গ্রামে পরিচিত ছিল, তাহা ঐ গ্রামের এক জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সাক্ষ্যে ও প্রমাণীকৃত হইয়াছে; আমার দ্বিতীয় সাক্ষী বেনওয়ারীলাল কুণ্ডু বলিয়াছে, সে বারবার শ্যামপুরের বাসা-বাটীতে এই অনিলকে দেখিয়াছে।

"আমার বিদ্বান্ বন্ধু এডওয়ার্ডস সাহেব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, অহিভূষণ বা অনিল শিয়ালদহ স্কুলে পড়িত না; ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একজন বৃদ্ধ হেডমাষ্টারকে বৃহদাকার রেজিষ্টারগুলির গুরুভার সহ, আদালতে টানিয়া আনিয়াছেন। ইহা না করিয়া যদি তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে, আমি আমার সহজ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বলিতাম যে না, উহারা কখন স্কুলে পড়ে নাই। তাহারা যে শিয়াদহ স্কুলে পড়ে, এই মিথ্যাকথা তাহারা জন সমাজে প্রচারিত রাখিয়াছিল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, তাহারা স্কুলে যাইতেছি বলিয়া, স্থানান্তরে যাইত। শুঁড়োর বাগান বাড়ীতে বোমা ইত্যাদি প্রস্তুতের যে কারখানা ছিল, উহারা সেইস্থানে যাইত! উহারা কোনও স্কুলের ছাত্র নহে, রাজদ্রোহী মাত্র।

"এই অনিল যে নিঃসংশয় একজন রাজদ্রোহী, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথম, তাহার বন্ধুই রাজসাক্ষী হইয়া বলি-

তেছে। যে, সুঁড়োর বাগানে সে পিস্তল ছোড়া অভ্যাস করিত ; ঐ পিস্তল ছোড়ার চিহ্ন এখনও উহার হাতে বর্ত্তমান আছে।

"আরও, আদালত একটা আশ্চর্য্য ব্যাপারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। আসামী স্বীকার করিয়াছে যে তাহার পকেটে শিবাজীর একটি প্রতিমূর্ত্তি এবং একখানি ছুরী ছিল। আদালত অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, এরূপ অদ্ভুত সামগ্রী সাধারণতঃ কোন নির্দ্দোষী বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের পকেটে থাকিতেই পারে না। একজন বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের পকেট খুঁজিলে আদালত উহাতে ছুরী বা শিবাজীর প্রতিকৃতি পাইবেন না ; উহাতে পাইবেন পাণের ডিবা, সিগারেটের কৌটা এবং দীপশলাকার বাক্স এবং কখন কখন একটা ফাউন্‌টেন পেন।"

কোন পুরাতন উকীল সরকারী উকীলের পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। তিনি টিপ্পনি কাটিলেন। বলিলেন—"কখন কখনও পকেটে ঘড়িও থাকে।"

সরকারী উকীল হাসিয়া বলিলেন—"আমার পার্শ্বস্থ এই বিদ্বান্ বন্ধু বলিতেছেন যে, আমাদের যুবকদিগের পকেটে কখন কখনও ঘড়িও থাকে। না হুজুর, ঘড়ি আর আমাদের যুবকদের পকেটে স্থান প্রাপ্ত হয় না ; তাহা হাতের কব্জীতেই বাঁধা থাকে। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাইতেছে যে, আসামীর পকেটে উপরিউক্ত ভদ্রযুবজনোচিত কোন দ্রব্যই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে পকেটে ছিল মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীর বর্ম্মাবৃত দুরন্ত প্রতিকৃতি, আর শাণিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকা।

উক্ত দুই দ্রব্যই অত্যন্ত ভয়ানক। শিবাজী, দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ছবির যে আদর করে ও পূজা করে, সে নিশ্চয়ই রাজ্যধ্বংসকারী রাজদ্রোহী। আর ছুরী!—উহা ত কসাইয়ের অস্ত্র। কে না জানে যে তাহাতে শত শত নরহত্যা সংসাধিত হইয়া থাকে;—কত ললনার কণ্ঠনালী ছিন্ন হইয়া থাকে? একজন বাঙ্গালী যুবকের পকেটে একজন রাজ্যধ্বংসকারীর ছবি, ও একটা নরহত্যার উপাদান ছাড়া আর কোন দ্রব্যই ছিল না, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়? আদালত এরূপ যুবককে রাজদ্রোহী ছাড়া আর কি বলিতে পারেন?

"আসামী পাঁচবৎসর কাল তাহার শ্যামবাজারের বাটীতে ছিল না। আমরা বলি, এই পাঁচ বৎসর বা তাহার অধিক কাল সে শ্যামপুরে ছিল। বিপক্ষ পক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ততদিন সে হরিদ্বারে ছিল। আসামীপক্ষ অনেকগুলি সাক্ষীকে আদালতে আনিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সম্মানিত সাক্ষী অনারেবল সার জেম্‌স। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, এই পাঁচ ছয় বৎসর কাল আসামী কোথায় ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন না। আসামী পক্ষের অন্য সাক্ষীও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। কেবল একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বলিয়াছে যে, আসামী তাহার কাছে হরিদ্বারে থাকিত। আমাদের পক্ষে, রাজসাক্ষী বলিতেছে যে সে শ্যামপুরে থাকিত। এবং এই রাজসাক্ষীর কথা একজন

বিশিষ্ট স্থানীয় ব্যবসায়ী সমর্থন করিতেছে। এক্ষণে আদালত বিচার করিয়া দেখুন যে, আমার সাক্ষীদের কথা বিশ্বাসযোগ্য, কিংবা একজন ভিক্ষুকের কথা গ্রাহ্য।"

বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কিরূপে জানিলেন যে, হরিদ্বারের ঐ সন্ন্যাসী একজন ভিক্ষুক মাত্র?"

সরকারী উকীল বলিলেন—"ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ভিক্ষাই উপজীবিকা। ভিক্ষা ব্যতীত অন্য উপায়ে ঐ ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জন করে এরূপ কোন কথা আমরা অবগত হইতে পারি নাই।"

এডওয়ার্ডস্ সাহেব বলিলেন—"কিন্তু এই সাক্ষী অসাধারণ সন্ন্যাসী; সাধারণ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ভিক্ষা ইঁহার উপজীবিকা নহে। তিনি একজন দেশপূজ্য, সুশিক্ষিত মান্য ব্যক্তি। তাঁহার নিজের যথেষ্ট অর্থ আছে; তিনি প্রত্যহ অনেকগুলি শিষ্যকে খাদ্যদান করিয়া থাকেন।"

বিচারক বলিলেন—"সাক্ষ্যদানকালে তিনি যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার বিশুদ্ধতা দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারে যে, তিনি বিশেষরূপ সুশিক্ষিত। ইহা ছাড়া তাঁহার অবয়বও ভদ্রজনোচিত। এইরূপ শিক্ষা ও এইরূপ অবয়ব কোন সামান্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া আমার মনে হয় না।"

সরকারী উকীল বলিলেন—"তিনি ভিক্ষুক না হইলেও, শিষ্যের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য হয়ত সত্য কথা গোপন করিয়াছেন। ধরা পড়িবার ভয়ে,

অনিল যে চারি মাস পলাইয়া বেড়াইতেছিল, আমার মনে হয়, সে সেই সময়েই এই সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। হুজুর বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ইহাই সম্ভব। ঐ একজন সাক্ষী ছাড়া, আর কোন সাক্ষীই জানিত না যে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি পাঁচ ছয় বৎসর কাল হরিদ্বারে অতিবাহিত করিয়াছে। সকল সাক্ষীই আসামীর বন্ধু; ইহা অত্যন্ত অসম্ভব যে এই সকল বন্ধুগণের মধ্যে আর একজনও জানিত না যে এই সুদীর্ঘকাল সে হরিদ্বারে বাস করিতেছিল। আমার বিশ্বাস, এবং আদালতও নিঃসন্দেহ তাহাই বিশ্বাস করিবেন যে, এই আসামী এই দীর্ঘকাল, জাল অনিলকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়া শ্যামপুরেই বাস করিতেছিল। আমার দুইজন বিশিষ্ট সাক্ষীও সেই কথাই বলিয়াছে; এই সাক্ষীদের একজন আসামীর সহিত বাস করিয়াছে, অন্যজন তাহাকে আহার সরবরাহ করিয়াছে; কাযেই তাহাদের ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আসামী যে শ্যামপুরে বাস করিত, ইহা নিশ্চিত।

"এখন আমরা দেখিব, আসামী কেন শ্যামপুরে বাস করিত। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার জন্য নহে,—ইহা আসামীর সাক্ষিগণের কথাতেই স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে; শেয়ালদহ স্কুলের হেডমাষ্টার স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার স্কুলের রেজিষ্টারে আসামীর নাম নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্যামপুরের বাটীতে থাকিয়া আসামী যদি পাঠাভ্যাস না করিত, তাহা হইলে, সে অন্য কি কার্য্য করিত? নিশ্চয় ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া, সে গৃহ ছাড়িয়া

শ্যামপুরে বাস করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটা কি? এই উদ্দেশ্যটা অনুসন্ধান করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। সে শুঁড়োর বাগানবাড়ীতে যাইত। আমার প্রথম সাক্ষী এ কথা বলিয়াছে; এবং আসামী নিজেও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে।

"এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, আসামী শুঁড়োর বাগান বাড়ীতে কেন যাইত? নথি হইতে প্রকাশ, এই বাগান এখন পতিত অবস্থায় আছে; উহাতে বাগানের বর্ত্তমান অধিকারিগণ বেড়াইতে বা বাস করিতে আসেন না; উহার সংস্কার জন্য উহাতে কোন মালী বাস করে না; এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য উহাতে কোন রক্ষক থাকে না। এই নির্জ্জন স্থানে আসামী তাহার সঙ্গীদের লইয়া কেন যাইত? রাজসাক্ষী বলিতেছে, তাহারা পিস্তল ছোড়া অভ্যাস করিতে যাইত। রাজসাক্ষীর কথা যে সত্য, তাহা আসামীর করতল পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারা যায়। উহার হাতে কতকগুলি কড়া আছে; ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে উহা পিস্তল ধারণ করায় উৎপন্ন হইয়াছে। আসামী নির্জ্জন স্থানে যাইয়া পিস্তল ছোড়া অভ্যাস করিত কেন? নিশ্চয়ই তাহার কোন কু-অভিসন্ধি ছিল।

"সেই কু-অভিসন্ধিটা কি, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিব। আসামী যে কেবল পিস্তল ছোড়া অভ্যাস করিত, এমত নহে। পুলিশ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছে যে, ঐ স্থানে বারুদ ও বোমা প্রস্তুতের কারখানা ছিল। পুলিশ ঐ কারখানায় প্রাপ্ত উপকরণ

আদালতে দাখিল করিয়াছে। ডাক্তার আসামীর শরীর পরীক্ষা করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে সপ্রমাণ হইবে যে, আসামী বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করিত। বিস্ফোরক দ্রব্যের বিদারণে তাহার হস্তে যে ক্ষত চিহ্ন হইয়াছিল, তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। আদালত পরীক্ষা করিলে তাহা চাক্ষুষ করিতে পারিবেন।

"যে ব্যক্তি শিবাজীর প্রতিকৃতির পূজা করে, যে ব্যক্তি জামার পকেটে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা রাখে, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে পিস্তল ছোড়া অভ্যাস করে, এবং গোপনে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করে, সে ভয়ানক রাজদ্রোহী ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। আসামীর প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে আসামী রাজদ্রোহী।

"আমি বিপক্ষ পক্ষের এক কয়েদী সাক্ষী সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। ঐ ব্যক্তি অপরাধী, সমাজের কলঙ্ক, মহাপাপী, উহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কাযেই তাহার সাক্ষ্যের আলোচনা করিয়া আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করি নাই।

"এখন আমার অনুরোধ যে, আদালত এই রাজদ্রোহীকে যথোপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নাগরিকগণের মন হইতে রাজ-দ্রোহের যথার্থ ভীতি বিদূরিত করুন; এবং অন্য পাপবুদ্ধি পাপিষ্ঠ-দিগের মন হইতে পাপচিন্তা নির্ম্মূলিত করুন। আর আদালত সমস্ত সাক্ষ্যের আলোচনা করিয়া যদি মনে করেন যে আসামী বাস্তবিক নির্দ্দোষী, তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে আসামীকে মুক্তি-

দান করিতে বলিব। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আদালত আসামীকে নির্দ্দোষী মনে করিবেন না।

"আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। এখন আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য আদালতের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, আসন গ্রহণ করিব।"

এইরূপে সরকারী উকীলের "সামান্য" বক্তব্যের উপসংহার হইল।

তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল যে, এই বক্তৃতাজাল ছিন্ন করিয়া আমার মুক্তিলাভের আর কোনও আশা নাই।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এডওয়ার্ড্স্ সাহেবের বক্তৃতা।

এডওয়ার্ড্স্ সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া, প্রথমে পুলিশপক্ষের রিপোর্ট ও সাক্ষ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন। পরে আমার পক্ষে যাহারা সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাগুলি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন-"এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমার মক্কেলের যথার্থ নাম সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সুশীলকুমার কিঞ্চিদধিক চারিবৎসর কাল আপন শ্যামবাজারের বাটীতে বাস করে নাই। আমার বন্ধু সরকারী উকীল মহাশয় বলিতেছেন যে, এই চারি বৎসর কাল সুশীলকুমার, অনিলকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়া শ্যামপুর নামক একটি পল্লীগ্রামে বাস করিত।

"তাঁহার দুই জন সাক্ষীর কথার উপর নির্ভর করিয়া তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন। তাহারা কি বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী? রাজসাক্ষী অহিভূষণই বলিয়াছে যে, সে ও সুশীলকুমার একত্রে শিয়ালদহে স্কুলে পড়িত; আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে উহা মিথ্যা কথা;— উহার ইংরাজি বর্ণপরিচয়ও হয় নাই। সে বলিয়াছে যে তাহারা গীতা পাঠ করিত; কিন্তু গীতার একটি শ্লোকও সে বলিতে পারে না। সুতরাং তাহাও মিথ্যা কথা। সে বলিয়াছে যে, তাহারা বারুদ প্রস্তুত করিত; কিন্তু কি উপাদানে বারুদ প্রস্তুত হয়, তাহা

সে জানে না। এখন সুশীলকুমার যদি বাস্তবিকই অহিভূষণের সঙ্গীরূপে একত্রে বাস করিয়া এক প্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সুশীলকুমারও বারুদ প্রস্তুত করে নাই। দুই সঙ্গীতে একত্রে বারুদ প্রস্তুত করিল; একজন উহার উপাদান কি তাহা জানিল না, ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং আমি বলিব, দুই জনেই বারুদ প্রস্তুত করে নাই। যে বারুদ প্রস্তুত করে না, তাহার বারুদের কারখানা থাকার আবশ্যকতা কি? অতএব শুঁড়োর বাগানবাড়ীতে পুলিশ যে বারুদের কারখানা দেখিয়াছে তাহা দিবাস্বপ্ন মাত্র। পুলিশ বারুদের কারখানার উপকরণ বলিয়া যে সকল দ্রব্য আদালতে দাখিল করিয়াছে, তাহা প্রায় সকল পরিত্যক্ত বাটী হইতেই সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

"তর্কের অনুরোধে বলা যাইতে পারে যে, সুশীলকুমার বারুদের কারখানায় কার্য্য না করিলেও, সে অন্য প্রকারে রাজদ্রোহ প্রচার করিত। পুলিশ বলিয়াছে যে সুশীলকুমার শ্যামপুরের একটা বাটীতে থাকিয়া রাজদ্রোহ প্রচার করিত; এবং তজ্জন্য সে প্রায় সাত বৎসরকাল এ বাটীতে বাস করিয়াছে। পুলিশপক্ষের সাক্ষ্য দ্বারাও জানা যায় যে, সুশীলকুমার ঐ বাটীতে সাতবৎসর বাস করিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছি, এই সাত বৎসরের মধ্যে তিন বৎসর কাল অর্থাৎ ১৯১০ হইতে ১৯১৩ সালের মে মাস পর্য্যন্ত সে শ্যামবাজারে তাহার নিজ বাটীতেই ছিল, এবং শ্যামবাজার স্কুলে পড়িয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। আমার বিপক্ষপক্ষ বলিতে পারেন যে, সে

শ্যামপুর হইতেই শ্যামবাজার স্কুলে পড়িতে যাইত; কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। শ্যামপুরের সেই বাটী হইতে শ্যামবাজারের সেই স্কুল প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত, এবং ঐ পথের অধিকাংশ স্থলেই ট্রাম গাড়ী যাতায়াত করে না। এই আট মাইল পথ প্রত্যহ পদব্রজে যাতায়াত করা, স্কুলে ছয় ঘণ্টাকাল আবদ্ধ থাকা, গোলাগুলি প্রস্তুত করা এবং পিস্তল ছোড়া অভ্যাস করা একটা মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত কার্য্য। সুতরাং ইহা নির্ব্বিবাদে বেলা যাইতে পারে যে, সাত বৎসরের মধ্যে, সে প্রথম তিন বৎসর কাল শ্যামপুরে বাস করে নাই। বাকি চারি বৎসর কাল, অর্থাৎ এই ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত সে কোথায় ছিল, এখন তাহা আমরা দেখাইব।

"কিন্তু উহা দেখাইবার পূর্ব্বে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার জন্য আমি মাননীয় বিচারককে অনুরোধ করিতেছি। যে বাটীতে ছাত্রগণ বাস করিত, সেই বাটীর সত্বাধিকারী পুলিশ পক্ষের একজন প্রধান সাক্ষী হইতে পারিত; কিন্তু পুলিশ এই প্রধান সাক্ষীকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেন? সম্ভবতঃ এই সাক্ষীকে আদালতে আনিলে, তাহার একটী কথায় পুলিশের প্রমাণের মন্দির, তাসের মন্দিরের ন্যায়, মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া যাইত।

"বাকি কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর কাল, ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সুশীলকুমার কোথায় ছিল? সে শ্যামপুরে অহিভূষণের সহিত বাস করিয়া, নিশ্চয়ই একই প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল

না। থাকিলে দুইজনেরই অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে কতকটা একই প্রকার শিক্ষালাভ হইত। তাহা কি হইয়াছে? সুশীল-কুমার সুশিক্ষিত; সরকারী উকীল মহাশয় আমার প্রতি অনু-গ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সুশীলকুমার ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছে। অন্য দিকে আমি প্রমাণ করিয়াছি যে, অহিভূষণ বর্ণজ্ঞানহীন মিথ্যুক। সুশীলকুমার যেখানে থাকুক, সে তাহার সুশিক্ষার জন্য কোন একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষক পাইয়াছিল। শিক্ষকের বিনা সাহায্যে এইরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ ঘটিতে পারে না। কে সে শিক্ষক?

অহিভূষণ বলিয়াছে যে, তাহারা শেয়ালদহ স্কুলে পড়িত। কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা। অতএব সেখানে সুশীলের এই সুশিক্ষা লাভ হয় নাই। তাহার পূর্ব্বে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত সে শ্যামবাজার স্কুলে পড়িত, সেখানে সে তিনবার চেষ্টা করিয়াও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। অতএব সেখানেও তাহার এই উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ ঘটে নাই। তবে কোথায় সে বিদ্যালাভ করিল?

"পুলিশ যদি বাস্তবিক জানিত যে এই চারি বৎসর কাল সে কোথায় ছিল, এবং তাহার এই অদ্ভুত শিক্ষক কে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই শিক্ষককে সাক্ষিরূপে আদালতে লইয়া আসিতে পারিত। পুলিশ যাহা পারে নাই, আমরা তাহা পারিয়াছি। আমরা সেই অদ্ভুত শিক্ষককে সাক্ষিরূপে আদালতে লইয়া আসি-য়াছি।—ইনিই সেই সন্ন্যাসী সাক্ষী বিঠুর বাবাজী।

"কিন্তু বিঠুর বাবাজী চিরকালই বিঠুর বাবাজী ছিলেন না। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল—টি, এন্, মুখার্জ্জি, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত ছাত্র। তিনি ইয়োরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ার নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া ভূয়োদর্শন লাভ করিয়াছেন। পরে লোকশিক্ষাব্রত ধারণ করিয়া হরিদ্বারে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেছেন। সন্ন্যাসী হইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি ভিক্ষুক নহেন; বরং তিনি অন্যকে প্রতিপালন করেন। এই সর্ব্বত্যাগী মহাধার্ম্মিক কখনও মিথ্যাবাদী হইতে পারেন না।

বিঠুর বাবাজী বলিয়াছেন যে, সুশীলকুমার কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর কাল তাঁহার নিকট থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে, এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম করিয়াছে। তাহার হাতে যে কড়া আছে, তাহা মুগ্দরাদি সঞ্চালনের ফল। আদালত কড়াগুলি পরীক্ষা করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, কেবলমাত্র কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির মূলেই কড়া পড়িয়াছে। যাহারা পিস্তল চালনা অভ্যাস করে, তাহাদের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্যভাগে কড়া পড়ে। আমার বিশ্বাস, আদালত এ সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত আছেন; এ জন্য অন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ করি নাই।

"পুলিশ প্রমাণ করিয়াছে যে সুশীলকুমার উৎকৃষ্ট বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন; কিন্তু প্রমাণ করিতে পারে নাই, কিরূপে কোন

শিক্ষকের নিকট এইরূপ বিদ্যার্জ্জন করিল। বিঠুর বাবাজীর সাক্ষ্যের দ্বারা আমরা তাহা প্রমাণ করিয়াছি।

"অতএব প্রমাণ হইল যে, সুশীলকুমার সাত বৎসরকাল অহিভূষণের সহিত শ্যামপুরে বাস করে নাই। ঐ সাতবৎসরের মধ্যে প্রথম তিন বৎসর কাল সে শ্যামবাজারে বাস করিত, এবং শেষ চারি বৎসর কাল হরিদ্বারে বিঠুর বাবাজীর নিকট বাস করিত।

"একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে হঠাৎ কিরূপে বিঠুর বাবাজীর সন্ধান পাইল? এই সন্দেহের নিরাকরণ জন্য আমরা এক কয়েদীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছি। কয়েদী কারাগারে আসিবার পূর্ব্বে একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী ছিল। ঘুঁড়োর এক পল্লীতে সে মুরলীধর মল্লিকের বাগানবাটীতে বাস করিত। সেইখানে থাকিয়া আপনার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নানারূপ মিথ্যাকথা প্রচার করিয়াছিল। এই মিথ্যায় প্রতারিত হইয়া সুশীলকুমার দুই একদিন ঐ বাগান বাড়ীতে ঐ ভণ্ড সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল; এবং তাহারই নিকট বিঠুর বাবাজীর সন্ধান ও গৃহত্যাগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

"একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, পুলিশ ঘুঁড়োর যে বাগানবাড়ীতে বারুদের কারখানা থাকার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, উহা মুরলীধর মল্লিকের বাগানবাটী নহে।

"এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে মকর্দ্দমাটি সম্পূর্ণরূপে পুলিশের কল্পনাপ্রসূত।

"এইরূপ মিথ্যা মোকর্দ্দমার সৃষ্টি করিয়া পুলিশের লাভ কি ? এ দেশের পুলিশ কিরূপ অকর্ম্মণ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। নগরের রাজপথে, অধিক কি ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে নরহত্যা হয়, কিন্তু নরঘাতী ধৃত হয় না। পল্লীতে পল্লীতে পল্লীবাসিগণ নির্জ্জিত হয়, তাহাদের সম্পদ অপহৃত হয়, পুলিশ তাহার কিছু প্রতিকার করিতে পারে না। জনসাধারণ অবাক হইয়া ভাবে, এই অকর্ম্মণ্য পুলিশের আবশ্যকতা কি ? তখন পুলিশ নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, কল্পিত অপরাধীর বিপক্ষে কৃত্রিম সাক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে বিচারে দণ্ডিত করিয়া নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা দেখাইয়া দেয়। তাহা দেখিয়া কর্তৃপক্ষ সুখী হন এবং পুলিশকে পুরস্কৃত করেন। কাল্পনিক মকর্দ্দমার সৃষ্টি করিয়া অকর্ম্মণ্য পুলিশ এইরূপে লাভবান হয়।

"আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আর একটিমাত্র কথা বলিয়া আমি উপবেশন করিব। এ কথা না বলিলেও চলিত। কিন্তু আমার বন্ধু সরকারী উকীল মহাশয় বিশেষভাবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমাকেও তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। আমার মক্কেলের জামার পকেটে একখানি কলমকাটা ছুরী ও মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর একটি প্রতিকৃতি ছিল। আমার বন্ধু বলিয়াছেন যে এই দুই দ্রব্যের দ্বারা আমার মক্কেলের অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে। পকেটে পেনকাটা ছুরী থাকা যদি অপরাধের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে এই আদালতের প্রত্যেক কপিইষ্ট এবং অধিকাংশ উকীলকেই অপরাধী হইতে হয়।"

এই সময় বিচারক তাঁহার পকেট হইতে একখানি ছুরী বাহির করিয়া তাহা এডওয়ার্ডস্ সাহেবকে দেখাইয়া কহিলেন— "এবং আমাকেও একজন রাজদ্রোহী হইতে হয়।"

বিচারকের কথা শুনিয়া আদালত-গৃহে মৃদু হাস্যরব উত্থিত হইল।

এডওয়ার্ডস্ সাহেব বলিলেন—"আর, শিবাজীর ছবি। শিবাজী একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই ঐতিহাসিক ব্যক্তির ছবি ক্রয় করায় আমার মক্কেল কোন প্রকার রাজদ্রোহ করে নাই। শিবাজী শক্তিশালী হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহার ছবির আদর করিলে হিন্দু রাজদ্রোহী হয় না। তর্কের অনুরোধে রাজবিদ্বেষী ধরিয়া লইলেও, তিনি মুসলমান সম্রাটের বিদ্বেষী ছিলেন, তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের শত্রু ছিলেন না। আবার তাঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরের শত্রু ধরিয়া লইলেও, তিনি এখনকার লোক নহেন; তিনি শত বৎসর পূর্ব্বের লোক। পুরাতন ক্রমওয়েল প্রভৃতির কি আমরা আদর করি না? তাহা কি এখন রাজদ্রোহ বলিয়া গণ্য হয়!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সঙ্গীত ও মুক্তি।

এডওয়ার্ডস্ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হইলে বিচারক বলিলেন,—"আমি আগামী কল্য সর্ব্ব কর্ম্মের পূর্ব্বে, এই মকর্দ্দমার রায় প্রকাশ করিব। আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আজ আদালতের কার্য্য স্থগিত হইল। আসামী হাজতে থাকিবে।" এই বলিয়া বিচারক আসন ত্যাগ করিলেম। তখন তাঁহার সম্মানার্থ বিচার কক্ষের কর্ম্মচারিগণ গাত্রোত্থান করিলেন। উকীল মোক্তারগণও গাত্রোত্থান করিলেন, এবং একে একে বিচারকক্ষ ত্যাগ করিলেন। আমার এই মোকর্দ্দমা দেখিবার জন্য যে সকল দর্শক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও উকীলগণের পন্থানুসরণ করিয়া, একে একে গৃহ-ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

আমার রক্ষিগণ আসিয়া, আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন সন্দেহদোলায় দুলিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম, Edwards সাহেবের বাক্যবাণে, সরকারী উকীলের বক্তৃতাজাল সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়াছে কি না।

রক্ষিগণ আমাকে লইয়া একখানি গাড়ীতে উঠাইয়া, উহার গবাক্ষ সকল সতর্কতার সহিত বন্ধ করিয়া দিল। নগরনিম্নবাহিনী গঙ্গার লোক-সমাকুল উপকূলে, যে সকল স্নাতা কুলকামিনীগণ, গঙ্গাভক্ত সাধু দর্শকগণের নয়ন সার্থক করিয়া প্রসাধন সম্পন্ন

করিয়া, পরে পাল্কীগাড়ীর প্রত্যেক ছিদ্র রুদ্ধ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করেন, আমি সারাদিন তাঁহাদিগের ন্যায় দর্শকগণের চক্ষু চরিতার্থ করিয়া, অন্তঃপুর সম জেলখানায় আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম।

আমি যে গাড়ীতে চড়িয়া কারাগারে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তাহাতে আর অন্য কোন আসামী আসে নাই; কিন্তু আমার গাড়ীর আগে আগে, আর এক খানি বন্ধ গাড়ী আসিতেছিল; তাহাতে কতকগুলি রাজনৈতিক আসামীকে আদালত হইতে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। আমি আপন গাড়ীর অন্ধকারে একাকী বসিয়া, ঐ অগ্রগামী গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শুনিতেছিলাম। আদালতের দ্বার হইতে গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর, ঐ গাড়ীর রাজনৈতিক আরোহীরা তারস্বরে গাহিতেছিল,—

বাঙ্গালীর জয়! বাঙ্গালার জয়! জয় দেব দেবী!
জয় ভগবান!
অধম পতিত বাঙ্গালী জাতির জগতে আবার
হইবে কল্যাণ।

আমাদের ছিল, পুণ্য যজ্ঞভূমে
মেঘমন্দ্র রবে বেদমন্ত্র গান;
আমাদের ছিল, শ্যামাঙ্গিনী ধরা,
তাহে, স্বর্ণবর্ণ ক্ষেত্র ভরা ধান;
আমাদের ছিল, বাহুভরা বল,
পুণ্য-পূত তনু, তনু ভরা প্রাণ;

আমাদের ছিল, কটিবিলম্বিত
পিধানেতে ভীম অসি খরশান।
ধরণীর মাঝে বীরজাতি যারা,
বাঙ্গালী হইবে তাদের সমান।
বাঙ্গালীর জয়! বাঙ্গালীর জয়!
জয় দেব দেবী! জয় ভগবান!

গায়কগণের তরুণকণ্ঠের আবেগপূর্ণ স্বর, তাহাদের তালে তালে করতালি, এবং দুইটি দ্রুতগামী অশ্বশকটের বিপুল শব্দ সব একত্র হইয়া, এমন একটা ঘাত-প্রতিঘাত-পূর্ণ সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, আমি কারাকক্ষে প্রত্যাগত হইয়াও সহজে তাহা ভুলিতে পারি নাই।—বহুক্ষণ আমার হৃদয়ের কোণে কোণে সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়াছিল; মনে হইতেছিল, এই অধঃপতিত জাতি সত্যই কি একদিন, জগতের অন্য বীর জাতির পার্শ্বে জয়মণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে? হাঁ, পারিবে। দেখ, আজ সত্যই বাঙ্গালী বীরগণ বিজয় মণ্ডিত হইয়া ফ্রান্সের রণক্ষেত্র হইতে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাঙ্গালীর পূর্ব্ব গৌরব ও আধুনিক দুর্দ্দশা, এবং দুর্দ্দশার মধ্যে মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তানের উজ্জ্বল মুখ ভাবিতে ভাবিতে কখন্ আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই।

প্রভাতালোক গৃহে প্রবেশ করিলে, আমি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলাম, গবাক্ষের বাহিরে বাদাম গাছের চূড়ায় যে

সূর্য্যরশ্মিটুকু আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা বিভাগ করিয়া লইবার জন্য বর্ষার বায়ুসগণ, জমীদারের মকর্দ্দমাপ্রিয় বংশধরগণের ন্যায় মহা বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। উঠিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া, রামগিরি পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত যক্ষের ন্যায় দেখিলাম, উত্তর দিকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মেঘসকল উদিত হইতেছে। হায়! ইহারা কি আমার কারাবাসকাহিনী আমার অপরাজিতার নিকট বহন করিবে?

আজ দশটার সময় মুক্তিলাভ করিয়া, আমি নিজে তাহার কাছে পৌঁছিয়া, আমার কারাকাহিনী তাহাকে বিদিত করিব। মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আজই রাত্রের গাড়ীতে বেনারস যাইব। তথায় তাহার কাকা তাহাকে আমার হাতে সম্প্রদান করিবেন; কিংবা হয়ত অপরাজিতার পিতা সেখানে আসিয়াছেন, তিনিই বিবাহ দিবেন; এখন তিনি আমার সত্য পরিচয় পাইয়া আর বিবাহে বাধা দিবেন না। এটা ভাদ্র মাস; ভাদ্রমাসে হিন্দুর বিবাহ হয় না। তা' কাশীতে এত পণ্ডিত আছেন কি করিতে? তাঁহারা কি একটা ব্যবস্থা দিতে পরিবেন না যে অরক্ষণীয়া কন্যার পক্ষে ভাদ্রমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় না? এরূপ ব্যবস্থা, আমার সুচতুর খুড়শ্বশুর মহাশয়, যথাসম্ভব কাঞ্চনমুল্য বিনিময়ে নিশ্চয় সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু...

আমার হৃদয়াভ্যন্তরে সহসা যেন এক যথার্থ রাজদ্রোহীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত বোমা, মহাশব্দে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া ফাটিয়া

গেল।—সহসা আমার মনে পড়িয়া গেল, যদি বিচারক ভাগ্যের বিড়ম্বনায়, আমার প্রতি বিরূপ হন, যদি আমাকে মুক্তিদান না করেন? হায় হায়! তাহা হইলে আমার দশায় কি হইবে? তখন অপরাজিতার সহিত বিবাহ স্বপ্নাতীত হইয়া পড়িবে।—ইহজন্মে, আর আমার অপরাজিতা-লাভ ঘটিবে না।

আমার অদৃষ্টে বিধাতা কি লিখিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। কখন বেলা দশটা বাজিবে? কখন আদালতে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, দণ্ড বা মুক্তির আজ্ঞা শ্রবণ করিব? আমার মনে হইতে লাগিল, সময় যেন অচল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—আজ আর দশটা বাজিবে না!

বাহিরে উত্তর দিকের সেই কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল ধীরে ধীরে সমস্ত গগন আচ্ছন্ন করিতেছিল। তাহারা আরও কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মুষলধারে বর্ষণ করিতে লাগিল।

বেলা প্রায় আটটার সময় দারোগাবাবু, সেই হরেন নামক পার্শ্বচরটিকে সঙ্গে লইয়া, আমার কক্ষে সমাগত হইলেন। বৃষ্টিপাতের ঘটা দেখিয়া বলিলেন—"এই—হাঁসের ডিমের ঝাল ঝাল বড়া, আর ইলিশ মাছ ভাজা, আর খিচুড়ি—আর তাতে গাওয়া ঘি। কর্ত্তৃপক্ষের এটা ভারি কুব্যবস্থা যে কয়েদীকে ইলিশ মাছ দেয় না; কেন, কয়েদীরা কি মানুষ নয়? আরে—কয়েদীদের ইলিশমাছ খাবার ব্যবস্থা থাকলে, আমরাও দুই একটা কোন না পেতাম?"

হরেন বলিল—"আজ্ঞে, মাছের কণ্ট্রাক্টার ত আজকে একটা ইলিশমাছ দিয়ে গেছে।"

দারোগা। এই বাদলে ইলিশমাছ না পেলে কি আমি তার রক্ষে রাখতাম! আর দেখ, আধসের টাটকা গাওয়া ঘিও যোগাড় করা গেছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। এখন সুশীল বাবুর সঙ্গে একটু কথা কওয়া যাক। আর ত ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

আমি। আমার মুক্তিলাভের আশা অতি কম। মুক্তি না পেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবার আপনার কাছে ফিরে আসব।

দারোগা। কে বল্লে যে আপনি দণ্ড পাবেন? আমি জেলের কায করে বুড়ো হয়ে গেলাম; কত হাজার হাজার আসামী দেখলাম। কে সাজা পাবে, আর কে সাজা পাবে না, তা কি আমি মুখ দেখে বলে দিতে পারব না? আমি বলছি, আপনি আজই মুক্তিলাভ করে বাড়ী ফিরে যাবেন। শুনলাম, অনারেবল্ সার জেম্‌স রবিন্সন সাহেব আপনার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন। একে এডওয়ার্ডস্ সাহেব ব্যারিষ্টার, তার উপর রবিন্সন সাহেব সাক্ষী!—বাবা! একি আর রক্ষে আছে? কথায় বলে 'একা রামের রক্ষে নেই সুগ্রীব তাঁর মিতে।' আপনি নিশ্চয় মুক্তিলাভ করবেন।

দারোগা বাবুর কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া, আমি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইলাম এবং আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলাম। তখন বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়াছিল।

যথাসময়ে পূর্ব্ববর্ণিত গাড়ীতে চড়িয়া আমি আদালতে আসিয়া পৌছিলাম। কিন্তু বিচারক তখনও আসেন নাই। বেলা এগারটার কয়েক মিনিট পরে, তিনি আসিয়া বিচার আসন গ্রহণ করিলেন; এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পেস্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এডওয়ার্ডস্ সাহেব এখনও আসেন নাই?" পেস্কার বিচারকের প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, এডওয়ার্ডস্ সাহেব বিচার কক্ষের দ্বারে দেখা দিলেন। জজসাহেব কহিলেন—"গতকল্যকার রাজদ্রোহ মোকর্দ্দমার রায় পাঠ করব বলে, আমি সরকারী উকীল বাবুকে এবং আপনাকে উভয়কেই খুঁজছিলাম। এখন আপনারা উপস্থিত হয়েছেন। আমি উহা পাঠ করব।"

বিচারকের কথা শুনিয়া, আমি উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অন্যান্য কথার পর বিচারক বলিলেন—"পুলিশ প্রথমে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে এই আসামীই তাহাদের পলাতক আসামী অনিলকৃষ্ণ। কিন্তু এ বিষয়ে পুলিশ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পুলিশ বলিতেছে, সে নিজের নাম বলিয়াছিল অনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলি। কিন্তু সদানন্দ সান্নগাল বলিতেছেন যে সে কি নাম বলিয়াছিল, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। অন্যপক্ষে, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলিতেছেন যে আসামীর নাম সুশীলকুমার।

"ইহা শুনিয়া, পুলিশ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, অনিলকৃষ্ণ ও সুশীলকুমার একই ব্যক্তি। কিন্তু ইহাতেও পুলিশ

কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, সুশীলকুমার শ্যামবাজারে ও হরিদ্বারে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে। এই সময় অনিলকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিয়া, তাহার শ্যামপুর নামক স্থানে অবস্থিতি করা সম্ভবপর নহে।

"ইহার পর পুলিশ মত পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে আসামী যেই হউক, সে রাজদ্রোহী। সে শিবাজীর সম্মান করে, পকেটে ছুরী রাখে, এবং তাহার হাতে পিস্তল ছোড়ার কড়া আছে। আমি উহার হাতের কড়াগুলি পরীক্ষা করিয়াছি; উহা পিস্তল ছোড়ার কড়া বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। আর, একটি ক্ষুদ্র ছবি ও একখানি কলমকাটা ছুরীকে আমি যুদ্ধোপকরণ মনে করি না।

"অতএব, আমি বলিব, পুলিশ তাহার মকর্দ্দমা প্রমাণ করিতে পারে নাই।

"এক পক্ষে প্রমাণাভাবে, এবং অন্যপক্ষে নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া, আমি আসামীকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মনে করি। তজ্জন্য আমি তাহাকে মুক্তিপ্রদান করিলাম।"

মুক্তির আদেশ শুনিয়া, আমি আনন্দাবেগে অধীর হইয়া পড়িলাম।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার মন-কম্পাসের কাঁটায় আন্দোলন।

মুক্তিলাভের পরমানন্দে, অবিলম্বে মাতার পুনর্দ্দর্শন লাভের আকুলতায়, এবং দুইদিন পরে অপরাজিতা লাভের আলোকময়ী আশায়, আমি এমত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মুক্তির পর দুইদণ্ডকাল আমি কি করিয়াছিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই। নিদ্রাভিভূতের ন্যায় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়া আমি জ্ঞানলাভ করিলে আমার প্রতীতি জন্মিল যে, আমি আমাদের শ্যামবাজারের বাটীতে আসিয়াছি। আমি কিরূপে সেখানে আসিলাম, বা কে আমাকে সেখানে পৌছিয়া দিল, এসকল কথা আমার কিছুই মনে ছিল না।

দেখিলাম আমাদের পুরাতন বাটীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং উহা নূতন অনুরাগে হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিতা, তৈল-লিপ্তা, উৎসবরতা প্রৌঢ়ার ন্যায় শোভা পাইতেছে; যেন সে গৃহ আমার অভ্যর্থনার জন্য উৎসব-বেশ ধারণ করিয়াছে, যেন সে গৃহস্বামীকে পাইয়া আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

অপরাজিতার স্বপ্নবৃত্তান্তে আমাদের বাটীর কিছু সংবাদ তোমরা পাইয়াছ। শুনিয়াছ যে, আমাদের বহির্ব্বাটীতে দুইটি ঘর ও তাহার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বারান্দা আছে। ঐ দুই ঘরের মধ্যে একটি বাবার বৈঠকখানা ঘর ছিল; অপরটিতে আমাদের উড়ে

চাকর বাস করিত। তোমাদের মনে আছে যে ঐ বৈঠকখানা ঘর একদিন আমার শ্বশুর মহাশয়ের শুভাগমনের জন্য সজ্জিত হইয়াছিল।—দেখিলাম, ঐ ঘরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গৃহ-তল মর্ম্মর-মণ্ডিত হইয়াছে; দেওয়াল পীতাভ রঙে এবং দেওয়াল ও ছাদের সন্ধিস্থল হরিদ্বর্ণ ও সুবর্ণবর্ণ পত্র ও পুষ্পের মনোহর চিত্রে সুশোভিত হইয়াছে; গবাক্ষপার্শ্বগুলিও ঐরূপ চিত্রহারে পরিবেষ্টিত হইয়াছে; গৃহতল হইতে দেওয়ালের কতকটা অংশ সুন্দর তৈলচিত্রে রঞ্জিত হইয়াছে; গবাক্ষ ও দ্বারের উপরিভাগে কয়েকখানি নূতন চিত্র লম্বিত রহিয়াছে। ঐ ঘরের গৃহসজ্জারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে উহাতে এক যোড়া তক্তপোষের উপর একখানি সতরঞ্চ, আমার লেখনানুরাগের মসীচিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, নির্ব্বিবাদে অনন্তশয্যাশায়ী মহাবিষ্ণুর ন্যায় চির-শায়িত থাকিত। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে, গৃহের এক পার্শ্বে সুচারু কারুকর্ম্মবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট কাষ্ঠের একখানি প্রশস্ত আসন, পালিশে বর্ণিসে ও শুভ্র শয্যায় দীপ্তি পাইতেছিল; গৃহের অপর পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র সেক্রেটেরিয়ট টেবিল ও চারিখানি চেয়ার ছিল। ঐ চেয়ারের মধ্যে আজ একখানিতে বসিয়া, ঐ টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া, তোমাদের জন্য আমার জীবনকাহিনী লিখিতেছি। সেই চাকরের ঘরটি আর চাকরের ঘর নাই; তাহার জন্য উঠানের পূর্ব্বদিকে নূতন গৃহে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরাতন ঘরটি পার্শ্বস্থ বৈঠকখানা ঘরের ন্যায় পরিস্কৃত ও রঞ্জিত হইয়া, এবং নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া একটি সুন্দর শয়নকক্ষে পরিণত হইয়াছে।

আমার পৈতৃক গৃহ আরও অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু নীরস ইষ্টক ও কাষ্ঠের সেই সকল উন্নতির বৃত্তান্ত লিখিয়া, আমার এ মিষ্ট প্রেমকাহিনী নষ্ট করিব না।

বাটীর এই প্রকার উন্নতি কিরূপে ঘটিল তাহা আমি সহজে ঠিক করিতে পারিলাম না। মাতা তাঁহার অর্থহীন অবস্থায় এই সকল মূল্যবান উন্নতির ব্যয় কিরূপে বহন করিলেন, অসহায় অবস্থায় কিরূপে উন্নতির উপকরণ সকল সংগ্রহ করিলেন, তাঁহার হইয়া কার্য্যকারকগণের কার্য্যের কে পরিদর্শন করিল? প্রাচীনা তিনি, এই সকল আধুনিক উন্নতির বুদ্ধি কোথায় পাইলেন?

গৃহ প্রত্যাগমনের প্রথম আনন্দ প্রশমিত হইলে, চারি বৎসর পরে মাতৃসন্দর্শনের প্রথম উচ্ছ্বাসানল, মাতার ও আমার অজস্র অশ্রুজলে নির্ব্বাপিত হইলে, আমি বাটীর প্রত্যেক স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কোথায় টাকা পেলে; বাড়ীর এই সকল পরিবর্ত্তন কি করে' করলে?"

মা বলিলেন—"এ সকল আমি কিছুই করি নি; বৌমা করেছেন।"

মার উত্তর শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। কে এই বৌমা? নিশ্চয়, নিশ্চয় কালীঘাটের সেই সর্ব্বনাশী! কে তাহাকে আসিতে বলিল? কি বেহায়া! বিনা আহ্বানে সে কিরূপে শ্বশুরালয়ে আসিল? আমার পৈত্রিক বাটীর আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী; সে আসিয়া, কোন্ সাহসে আমার বিনা অনুমতিতে তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিল? আমি আজই তাহাকে

গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিব। অপরাজিতা এ গৃহের দ্বন্দ্বহীনা অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এখানে অন্য কাহারও স্থান নাই। আমি রাগান্বিত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—“কে এই বৌমা? কে তাকে এখানে আসতে বল্লে?”

মা বলিলেন—“কেউই তাকে আসতে বলে নি; সে আপনি এসেছে। এসে এই চার বৎসরকাল আমার সেবা করেছে। সে না এলে আমি বাঁচতাম না। তুমি চলে’ যাওয়ার পর, আমি পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে কেঁদে বেড়ালাম, রাস্তার লোককে ডেকে তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম; কেউই তোমার কোনও সংবাদ দিতে পারলে না। শেষে পাঁচজনের পরামর্শে, তোমার শ্বশুর মশায়কে টেলিগ্রাফ করলাম। তিনি এসে বৌমাকে আমার কাছে রেখে গেলেন। বৌমা যখন এলেন, তখন আমি দুশ্চিন্তায় ও অনাহারে শয্যাশায়িনী হয়েছি। আমাকে ওঠালেন, রেঁধে খাবার দিলেন; মা দুর্গার মত যেন দশ হাত বের করে, আমার শুশ্রূষা করলেন; কত রকম সান্ত্বনায় আমার জীবন রক্ষা করলেন।”

সর্ব্বনাশ! বধূ কেবল মাত্র আমার পৈত্রিক বাটীর উন্নতি-বিধায়িনী নহে; সে আমার অসহায়া দুঃখিনী মাতার জীবন-রক্ষাকারিণী; ইহার করাল হস্ত হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিব? ইহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া কিরূপে অপরাজিতাকে মাতৃ-সেবায় নিযুক্ত করিব? পুলিশের দুর্ভেদ্য জাল ছিন্ন করিয়া, বাটীতে আসিয়া এ আবার কি অভিনব বিপদের সম্মুখীন হইলাম!

তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে, মাতার উপরিউক্ত বাক্য

শ্রবণের পর, আমার পক্ষে বধূর প্রতি রাগান্বিত থাকা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িল। মাতার দুঃখকাহিনী শুনিয়া, আমার চক্ষে যে জলধারা প্রবাহিত হইল, তাহাতে আমার সমস্ত ক্রোধাগ্নি ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে নিবিয়া গেল। তথাপি তোমরা পাঁচজনে যেন মনে করিও না যে, আমি ক্রমে অপরাজিতার প্রতি অবিশ্বাসী হইলাম। আমি মনে মনে বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, একদিকে কেবল মাত্র শুষ্ক কৃতজ্ঞতা ; অন্যদিকে রসভরা, বুকভরা অনুরাগের উচ্ছ্বাস, ক্ষীরোদ সাগরের তরঙ্গের ন্যায়, আমার হৃদয়-পঞ্জর সুধাপ্লাবিত করিতেছিল ! একদিকে কর্ত্তব্যের একটুখানি শাসন, অন্যদিকে প্রেমের প্রবল আকর্ষণ, বিপুল চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় আমার মন-কম্পাসের কাঁটাকে অপরাজিতার দিকে টানিয়া রাখিয়াছিল।

মা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"কত জন্ম তপস্যা করে' এমন পুত্রবধূ লাভ করেছি, তা বলতে পারি না। রান্নায় মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। এমন মিষ্টি রান্না তুমি কখনও খাওনি ; আমার জন্যে মা আমার যে সকল নিরামিষ তরকারি রেঁধে দেন, তা আমি অমৃত মনে করে খাই।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। ভাবিলাম, মা যদি কখনও অপরাজিতার রান্না আমসীর অম্বল খান, তাহা হইলে, আর কখনও আর কাহারও রান্নার সুখ্যাতি করিবেন না ;—সেরূপ দেবভোগ্য সামগ্রী স্বয়ং নল রাজাও রন্ধন করিতে পারেন নাই।

মা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"মা আমার লক্ষ্মী ; তাঁর

হাতে পড়ে, আমাদের সেই শেওলাপড়া বাড়ী, চেয়ে দেখ, যেন লক্ষ্মীর সিংহাসন হয়েছে! তুমি শুনেছিলে যে তোমার দিদি-শাশুড়ীর হাতে অনেক টাকা ছিল; তা ছাড়া কালীঘাটে তাঁর যে বাড়ী ছিল, তা বিক্রী করেও দশ বার হাজার টাকা হয়েছিল; এই সমস্ত টাকাই তিনি মৃত্যুকালে বৌমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই টাকার সুদ থেকে বৌমা বাড়ী ঘর দ্বারের এই উন্নতি করে-ছেন। আসল টাকা সমস্ত এখনও তাঁর কাছে মজুদ আছে; বলেছেন যে তা সমস্ত তোমাকে দেবেন।”

হায়! আমার প্রাচীনা অনভিজ্ঞা মাতা! তিনি ত জানিতেন না যে, অন্য সমস্ত আদালতে ঘুস দেওয়ার প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত থাকিলেও, প্রেমের আদালতে ঘুস চলে না। ইহা ছাড়া, আমার অপরাজিতাও যে সম-ঐশ্বর্য্যশালিনী! সুতরাং আমার পূর্ব্বোল্লিখিত মন-কম্পাসের কাঁটা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, পূর্ব্ববৎ অপরাজিতা-মুখীই হইয়া রহিল।

আমি বাল্যকালে কুমার নবকৃষ্ণ দত্তের বৈঠকখানায় বসিয়া বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল পড়িয়াছিলাম। ভ্রমরের দানপত্র পড়িয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা আমার মনে ছিল। আমি মাকে বলিলাম—“স্ত্রী টাকা দান করবে, আমি তা গ্রহণ করব,—আমার সঙ্গে এমন সম্বন্ধ নয়। সে তার টাকা নিয়ে তার বাপের বাড়ীতে থাকুক। আমি অন্য বিয়ে করব।”

আমার প্রস্তাবটা কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইল। শুনিয়া মা

বলিলেন—"সে কি কথা? তুমি তার টাকা না নাও তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তুমি অন্য বিয়ে করবে কেন?"

আমি। সে সব ঠিক হয়েছে, আমি আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে কিংবা কাল সকালে কাশী যাব। সেখানে বিয়ে করে, তাকে এখানে নিয়ে আসব।

মা। তা, তুমি কুলীনের ছেলে, একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে করতে পার। কিন্তু এ বৌকে ত্যাগ করতে পারবে না। এমন গুণের বৌ আমি কোথাও পাব না। যেমন গুণ, তেমনই রূপ। তেমন ঘর আলোকরা রূপ কেউ কখন দেখে নি,—যেন গড়ানো প্রতিমা খানি!

আমি। কিন্তু তাকে তুমি দেখ নি ত!

মা। তা, তোমার যদি তাকে পছন্দ হয়ে থাকে, তুমি দু' চার দিন পরে কাশী গিয়ে তাকে বিয়ে করে এনো; আমি তাকে বরণ করে ঘরে নেব। কিন্তু এ বৌমা এই বাড়ীতেই থাকবেন; বাপের বাড়ী যাবেন না। তাঁকে তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না। আর, কাশী যাবার আগে, তুমি নিজমুখে সকল কথা বৌমাকে বোলো।

আমি। না না, আমি তাকে সে কথা বলতে পারব না। আমি তার সঙ্গে দেখাও করব না। সে একটা গোলমাল বাধাবে।"

মা। তোমার কোন ভয় নেই। আমি তাকে এই চার-বৎসরে বিলক্ষণ চিনেছি। সে সে রকম মেয়ে নয়;—সে তোমার

নতুন বিয়ে নিষেধ করবে না। সে আপনার সুখ খোঁজে না। আমি জানি, তোমার সুখেই তার সুখ। নতুন বিয়েতে তোমাকে সুখী দেখলে সে নিশ্চয়ই সুখী হবে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তোমার আনন্দবিধানই তার জীবনের একমাত্র ব্রত। তুমি আসবে জেনে, তোমার জন্যেই সে তোমার বাড়ী ঘর মেরামৎ করিয়ে, সাজিয়েছে গুছিয়েছে। তোমার প্রীতির জন্যেই সে দিনরাত তোমার মার সেবা করেছে; ছেলেমানুষ, বাপ মাকে ছেড়ে একলা আমার কাছে পড়ে আছে। তুমি তার সঙ্গে দেখা করে' সকল কথা বল্লে, সে আহ্লাদ করে' তোমার অন্য বিয়ের যোগাড় করবে। হয়ত, নিজেই নতুন বৌয়ের জন্যে গহনা কাপড় কিনবে; নিজেই বরণ করে' তাকে ঘরে তুলবে।

এই অদ্ভুত বধূর কথা শুনিয়া, আমার মন-কম্পাসের কাঁটা একবারমাত্র আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই অপরাজিতামুখী হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। আমি মনকে দৃঢ় করিয়া বলিলাম—"ভাল, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই কাশী যাব। তোমার অমত না হলে, আমি কালই সকালের গাড়ীতে রওনা হব।"

মা বলিলেন—"কতদিন পরে তুমি বাড়ী এসেছ, আবার কাল তুমি কি করে' বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাবে? তুমি কিছুদিন বাড়ীতে থেকে, পরে কাশী যেও। এদিকে আমরা বিয়ের একটা শুভদিন স্থির করব। আর নতুন বৌকে দেবার জন্যে কিছু অলঙ্কার তৈরী

করাব। আর, এই ক'দিন তুমি এখানকার সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর। তাদের মধ্যে কে কে তোমার সঙ্গে বরযাত্রী যাবে তাও ঠিক করে ফেল। বিয়ের যে দিনস্থির হবে, তা আগে কন্যাপক্ষকে লিখে জানিও, তা না হলে তাঁরা প্রস্তুত থাকবেন কি করে' ?"

আমি বুঝিলাম, মার কথা যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং কাশী যাইবার পূর্ব্বে কিছুদিন বাটীতে থাকিতে স্বীকৃত হইলাম। বলিলাম —"বেশ, কয়েক দিন পরেই যাব। কাল তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে' তার বাবাকে আর খুড়োকে চিঠি লিখব। আমি তাঁদের কাছে একটা অপরাধ করেছি, সেই জন্যে বিয়ের আগে সকল সত্য কথা বলে' তাঁদের ক্ষমাভিক্ষা করতে হবে।"

মা জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এমন কি অপরাধ করেছ ?"

আমি বলিলাম—"আমি তাঁদিকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলেছিলাম যে আমি কুলীন নই। তার জন্যে তাঁরা আমার সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃত হলে, আমি তাঁদের অনুমতি না নিয়ে তাঁদের মেয়েকে কাশীতে এনে বিয়ে করবার উদ্যোগ করেছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি এমন একটা অপরাধ করলেও, তাঁদের যত্নেই আমি পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি।"

মা বলিলেন—"তুমি যে তাঁদের মেয়েকেই বিয়ে করবে, তা আমি জানতাম না। আমি মনে করেছিলাম, হরিদ্বারে তাঁদের সঙ্গে তোমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মেছিল—সেই বন্ধুত্বের অনুরোধে, তাঁরা তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যে এত যত্ন করেছেন।

পাশের বাড়ীর যদুগোপালকে তোমার মনে আছে? সে তোমাকে বড় ভালবাসে। সে এখন বুড়ো হয়েছে; কিন্তু সেই বুড়ো হাড় নিয়ে তোমার মকর্দ্দমার সময় সে রোজ জেলখানায় যেত, আদালতে যেত; আর আমাকে সকল সংবাদ এনে দিত?"

আমি। সে কি করে' জানলে যে আমি আসামী হয়ে দেশে এসেছি?

মা। কাশীর একটি ভদ্রলোক আমার কাছে এসে তোমার সংবাদ দিয়েছিলেন; আর তুমি এতদিন কোথায় কি ভাবে ছিলে, আর কি করে' ভুলক্রমে পলাতক রাজদ্রোহী বলে ধরা পড়েছ, সমস্তই বলেছিলেন। যদুগোপাল আমার কাছে এই সকল শুনে জেলখানায় যেত। তারই মুখে শুনেছি যে হরিদ্বারের বন্ধুরা তোমার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁদিকে চিঠি লিখে, আমার কৃতজ্ঞতা জানিও। বোলো যে আমি জন্মান্তরেও তাঁদের এ ঋণ পরিশোধ করতে পারব না।

আমি। আমি তাঁদের মেয়েকেই বিয়ে করব, এখন বোধ হয় তোমার অমত হবে না?

মা। তুমি বিয়ে করবে, তাতে আমার কখনই অমত হবে না। আমার কেবলমাত্র অনুরোধ যে, বিয়ের আগে তুমি সকল কথা বৌমাকে বোলো।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অবগুণ্ঠনবতী।

সেই দিন অপরাহ্ণকালে মাতার আদরমাখা অপূর্ব্ব জলযোগের পর, আমি আমার সুসজ্জিত শয্যাকক্ষে বসিয়া ছিলাম। বাহিরে ঘনকৃষ্ণ মেঘে, ক্ষণে ক্ষণে, নিকষ-পাষাণাঙ্কিত কাঞ্চনরেখার ন্যায় বিদ্যুৎশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছিল; তাহার গর্জ্জনে গৃহমধ্যস্থিত উজ্জ্বল পিত্তল-নির্ম্মিত ফুলদানগুলি, হাস্‌নুহানার মুক্তাসদৃশ মুকুলগুচ্ছের সহিত, স্বর্ণমুক্তাময় ময়ূরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিপয়ের উপর নাচিয়া উঠিতেছিল। তাহার সৌরভে বিভোর হইয়া, জানালা খুলিয়া আমি আকাশপথে মেঘমালার গমনাগমন নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। আর?—আর ভাবিতেছিলাম অপরাজিতার কথা—আমার আদরময়ী অপরাজিতার কথা;. দুইদিন পরে যে আমার সুখদুঃখময় জীবনপথের চিরসঙ্গিনী হইবে, তাহার কথা। বর্ষার শৈত্যে নহে, তাহার মধুময় স্মৃতিতে, আমার পাঞ্জাবী-পরা অঙ্গ, মৃদুপবনান্দোলিত সরোবর-সলিলের ন্যায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে কি আমার মুক্তির সংবাদ পাইয়াছে? তাহার আত্মীয়গণ আমার উদ্ধার সাধনের জন্য যখন এত করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় আমার মুক্তির সংবাদ তাহাকে তারযোগে জানাইয়াছেন। আমিও তাহাকে তারে সংবাদ দিব—আজই দিব। শুনিয়া সে কতই আহ্লাদিতা হইবে! আনন্দে তাহার অনুরাগভরা গণ্ড দুইটি, কমলার উৎসঙ্গ-

শায়ী রক্তকমলের মত অবর্ণনীয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে। আমার মুক্তির আনন্দে, তাহার কটাক্ষপূর্ণ চক্ষু দুইটি অর্দ্ধস্ফুট পদ্মকোরকের ন্যায় স্তিমিত হইয়া আসিবে। সে আহ্লাদপূর্ণ আনন আমার মানস-নয়নের অগ্রভাগে যেন শারদীয়া প্রতিমার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

সহসা গৃহমধ্যে মানবপদক্ষেপের মৃদু শব্দ এবং তাহার সহিত যুবতীজনের করকঙ্কণ-নিক্বণের মৃদুগুঞ্জন শ্রুত হইল। সেই শব্দে আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, আমার মানস-প্রতিকৃতি বাহিরের বারিসিক্ত বায়ুতে বিলীন হইয়া গেল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, গৃহমধ্যে এক অবগুণ্ঠনবতীর শুভাগমন ঘটিয়াছে। সে তাম্বুল-করঙ্ক হস্তে লইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার অলক্তকরঞ্জিত কোমল পদপল্লব, বায়ুবিচ্যুত কুসুমপল্লবের ন্যায় গৃহতলে পতিত হইতেছিল। মেঘান্তরিতা বিদ্যুন্মালার ন্যায় তাহার দেহলাবণ্য, তাহার শুভ্র বস্ত্রমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল। দেখিয়া বুঝিলাম, এই আমার পরিত্যক্তা পরিণীতা পত্নী!—কিন্তু এত রূপ সে কোথায় পাইল? এ প্রবল রূপপ্রবাহে কিরূপে আমি আমার তৃণবৎ মনকে স্থির রাখিব? অপরাজিতামুখী আমার সেই মনকম্পাসের কাঁটা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া উঠিল। অবগুণ্ঠনমধ্যে তাহার মুখশ্রী অবলোকন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলাম না; দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবরণে তাহা সম্পূর্ণ আবৃত রহিল।

সে মুখাবরণ অপসারিত না করিয়া, কহিল—"মা তোমার জন্যে

এই পাণ পাঠিয়ে দিয়েছেন ; খাও।” এই বলিয়া সে তাম্বুল-পাত্রের আবরণ উন্মোচিত করিয়া, তাহা আমার সম্মুখে ধরিল।

আমি তাম্বুলপাত্র দেখিলাম না। দেখিলাম সদ্যঃছিন্ন গোলাপ-দল-গঠিত কোমল করপল্লব ; দেখিলাম সে করপল্লবে, মোহিনীর হস্তস্থিত সুধাপাত্রের ন্যায়, এক রত্নপাত্র রহিয়াছে—তাহা সুধায় পূর্ণ। তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলাম যে অপরাজিতার ন্যায় আমার পরিণীতাও কণ্ঠস্বর সুধাপূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু আমি আমার মনকে অত্যন্ত শাসিত করিয়া মনে মনে বলিলাম, অপরা-জিতার প্রেমের কাছে এই সুধা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ; এ সুধার বিন্দু-সকল অপরাজিতার উজ্জ্বল প্রেমচন্দ্রের নিকট যেন ক্ষুদ্র তারকা। অবগুণ্ঠিতার মুখের সন্ধান না পাইয়া আমার দৃষ্টি, দেবপদে নিবেদিত পদ্মের ন্যায়, তাহার রক্ত পাদপদ্মে পতিত হইয়াছিল ; আমি এক্ষণে মনকে শাসিত করিয়া, তাহা সবেগে তুলিয়া লইলাম, এবং বাদলার হাওয়ায় বিলয়প্রাপ্ত অপরাজিতার স্বপ্ন-মূর্ত্তির সন্ধানে সেই দৃষ্টি গবাক্ষের বাহিরে নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু আর অপরাজিতার মূর্ত্তির সন্ধান পাইলাম না। গৃহস্থিতার পদ-প্রান্তের পদ্মকান্তি, জলৌকার ন্যায় আমার দৃষ্টিতে দৃঢ়-সংবদ্ধ রহিল।

অবাধ্য দৃষ্টিকে বাহিরের মেঘমালার দিকে ফিরাইয়া, কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য পরুষতা পূরিয়া আমি বলিলাম—“আমি পাণ খাইনে। খাব না।”

অটলভাবে দাঁড়াইয়া, সে পূর্ব্ববৎ সুধাপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি কখন পাণ খাও নি?"

আমি বলিলাম—"আগে কখন কখন খেতাম; কিন্তু হরিদ্বারে যাওয়ার পর থেকে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করেছি।"

সে। তার পর আর একদিনও খাও নি?

আমি। হাঁ, একদিন খেয়েছিলাম;—কোনও লোকের বিশেষ অনুরোধে একদিন মাত্র খেয়েছিলাম।

তোমাদের মনে আছে, লাক্‌সারে অপরাজিতার প্রস্তুত অন্নাহারের পর তাহার অনুরোধে আমি পাণ খাইয়াছিলাম; এবং তাহার পর গাড়ীতেও কয়েকটা পাণ খাইয়াছিলাম। আমি সে কথা গোপন করিলাম না।

আমার উত্তর শুনিয়া বধূ বলিল—"যদি কখনও কারও অনুরোধে পাণ খেয়ে থাক, তা হলে, আজ আমার অনুরোধে তোমার মার দেওয়া পাণ খাবে না কেন? তোমার কাছে অন্য লোকের দেওয়া জিনিষের চেয়ে, তোমার মার দেওয়া জিনিষের কি আদর কম? আর অন্য লোকের অনুরোধের চেয়ে আমার অনুরোধের কি জোর কম? আমি তোমার বিবাহিতা পত্নী—আমি অনুরোধ করছি, পাণ খাও।"

আমি। আজ থাক; আজ আমার খেতে ইচ্ছা নেই।

সে। ইচ্ছা না থাকলেও, আমার অনুরোধে খাবে। আমি যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী—তুমি আমার কথা না শুনলে, আমার মনে যে দুঃখ হবে!

আমি। আমি তোমাকে বিবাহ করেছি বটে, কিন্তু তোমাকে আমার যথার্থ স্ত্রী বলতে পারি নে।

সে। এ কেমন কথা হল? আপন বিবাহিতা স্ত্রীকে স্ত্রী বলবে না ত কাকে বলবে? অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে স্ত্রী বলা ত সুবিধাজনক নয়।—তার আত্মীয় স্বজন যে তাতে বাধা দেবে!

আমার বধূ কি তবে সন্ধান পাইয়াছে যে অপরাজিতা অন্যের পরিণীতা? তাহার বাক্যের প্রণালী দেখিয়া, তদ্বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হইল। আমি বলিলাম—"যার অনুরোধে আমি একদিন পাণ খেয়েছিলাম, সেই আমার যথার্থ স্ত্রী; তাকে আমি বিয়ে করব।"

সে। বিয়ে করবে,—ভবিষ্যৎ কালে! এখনও সে বিয়ে হয় নি; তবুও সেই তোমার যথার্থ স্ত্রী হল! আর আমি?—আমাকে তুমি চৌদ্দ বছর বিয়ে করেছ; আমি তোমার ঘরসংসার করেছি, তোমার আগমন প্রত্যাশায় চার বছর ধরে পথ চেয়ে বসে আছি;—আমি তোমার যথার্থ স্ত্রী নই? তোমার এ কথায় যুক্তি কোথায়?

আমি। আমি তোমাকে—ঠিক বলতে গেলে—কখনই বিয়ে করি নি।

সে। এ ত সত্য কথা নয়। আমি তখন পাঁচ বৎসরের শিশু, তবু আমার বেশ স্মরণ আছে যে তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এসে, আমার এই হাত গ্রহণ করেছিলে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে আমার পাণিগ্রহণ করেছিলে।

এই বলিয়া সে তাহার শঙ্খবলয়ভূষিত বাম হস্তখানি আমার দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। সে হস্তের সুন্দর শোভা দেখিয়া, পদ্মমধুলোলুপ মধুকরের ন্যায় আমার মনটা বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মদন শাসনকালে মহাদেব যেরূপ জ্বালাময় কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রক্ত কটাক্ষে আমি মনকে শাসিত করিয়া বলিলাম—"সে বিয়ে বিয়েই নয়। তা আমি আপন ইচ্ছায় করি নি। তা আমি বাপ মার অনুরোধে করেছিলাম।"

সে। ইচ্ছায় কর, অনিচ্ছায় কর, অনুরোধে কর, তুমি যে কার্য্য করেছ তোমাকেই তার ফল ভোগ করতে হবে। কারও অনুরোধে যদি তুমি আগুনে হাত দাও, তবে অনুরোধকারীর হাত পুড়বে, না তোমার হাত পুড়বে? তুমি অনিচ্ছায় খাল কেটে যে কুমীর এনেছ, তার অত্যাচার তোমাকেই সহ্য করতে হবে। গর্ত্ত খুঁড়ে অজগর বার করেছ, এখন বিষের ভয় করলে চলবে কেন? যখন আমাকে বিয়ে করে ফেলেছ, এবং আমি যখন মরে যাই নি, তখন আমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতেই হবে।

আমি। আমি তোমাকে কখনও গ্রহণ করি নি, এখনও করব না।

সে। সেই শিশুকালে সেই বিয়ের দিনে, তুমি একবার এ হাত ধরেছিলে; আমার শিশুহৃদয়ে তখনই তুমি ভালবাসার বীজ পুঁতে দিয়েছিলে। ক্রমে তা অঙ্কুরিত হয়েছে, পত্রপুষ্পে শোভা-ধারণ করেছে। এখন তুমি কি করে বলবে যে এ গাছ তোমার নয়, তুমি ওর ফল গ্রহণ করবে না। কোন উপায়

নেই ;—বিয়ে করে, তুমি আপনাকে আমার সঙ্গে বিষম জড়িয়ে ফেলেছ। আজ আমার অনুরোধে একটা পাণ না খেয়ে, তুমি এ বাঁধন ছিঁড়তে পারবে না। দু দিন পরে আর একজনকে বিয়ে করলেও, শক্ত বাঁধন থেকে মুক্তি পাবে না।

আমিও মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম যে, এই পরিণীতা বধূর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ করা সহজ হইবে না। কারাগারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কালে, আমি স্বপ্নেও বুঝিতে পারি নাই যে, কারাগারের বাহিরে এক মহাবন্ধন আমার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কালীঘাটের সেই সামান্যা বালিকা যে কালক্রমে ইন্দ্রজিতের নাগপাশের শক্তি ধারণ করিবে, তাহা স্বয়ং অন্তর্যামীও গণনা করিয়া বলিতে পারিতেন না। তথাপি আমার মনে আশা ছিল যে, অপরাজিতার দুর্জ্জয় প্রেম, রাঘবচূড়ামণির শরাসন প্রক্ষিপ্ত অব্যর্থ নারাচের ন্যায়, একদিন এক মুহূর্ত্তে, বধূর এই নাগপাশ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে। আপাততঃ বধূকে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব করিলাম, "এ সম্বন্ধে আজ আমি তোমার সঙ্গে আর আলোচনা করব না। কাল দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর এই ঘরে এসে, আমি সকল কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলব। তখন তুমি বুঝতে পারবে যে, তোমাকে বাপ মার অনুরোধে বিয়ে করলেও, তুমি প্রকৃতপক্ষে কখনই আমার স্ত্রীর স্থান অধিকার করতে পার নি। আমার অন্তরের মধ্যে সে স্থান খালি ছিল, আমার মনোনীতা অন্য এক মোহিনী তা অধিকার করেছে ; সেই আমার স্ত্রী হবে। এখন তুমি অন্য কাযে যাও।"

সে দৃঢ়স্বরে বলিল—"আমার অন্য কায নেই। তুমিই আমার একমাত্র কায। আর, তুমি আমার দেওয়া পাণ না খেলে, আমি এক পাও নড়ব না।"

আমি সেই অবগুণ্ঠিতার মর্ম্মরমূর্ত্তিবৎ অটল দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম যে, তাহার পক্ষে তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করা, কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে; অতএব পরাভব স্বীকার ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। অগত্যা, তাহার করস্থ করঙ্ক হইতে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া, তাহা চর্ব্বণ করিতে করিতে আমি বলিলাম—"এইবার তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। এইবার তুমি অন্য কাযে যাও।"

সে বলিল—"বহুকাল পরে আমি আমার স্বামীর দর্শনলাভ করেছি। আমার প্রথম অনুরোধটি প্রতিপালিত হয়েছে এখন আমি তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে অন্য কাযে যাব।"

এই বলিয়া, সে একটি টিপয়ের উপর তাহার হস্তস্থিত ডিবাটি রাখিয়া, প্রণতা হইয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে, মরাল-নিন্দিত পাদক্ষেপে নিঃশব্দে চলিয়া গেল। গবাক্ষের বাহিরে, নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় মেঘমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, না জানি, এই অবগুণ্ঠনবতী বধূর মুখশ্রী কিরূপ! সহসা মেঘমালার মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইয়া গেল; একটা বিদ্যুৎ বুঝি স্বর্গের রূপজ্যোতি উদ্গীরণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মুখ লুকাইল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার চাকুরী লাভ।

পরদিন প্রভাতে নির্ম্মল নীল আকাশে সূর্য্য উঠিয়া বর্ষাস্নাতা ধরণীকে পরম পুলকিতা করিলেন। কলিকাতার বাটী সকল রৌদ্রময় উত্তরীয় পরিয়া, চীনাম্বর পরিহিত ব্রাহ্মণের ন্যায়, যেন সারি বাঁধিয়া উৎসবে ভোজ খাইতে বসিয়া গিয়াছে;—কর্দ্দমাক্ত পথে মানবগণের যাতায়াতে, সেই উৎসব-ভোজেরই চপ্ চপ্ সপ্ সপ্ শব্দ উত্থিত হইতেছিল। সেই রৌদ্র-উৎসবে আমি বহির্ব্বাটীর কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, সকালের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে যাইয়া কাহার কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব।

মা বলিলেন, "উমেশ বাবুর সঙ্গে তোমার একবার দেখা করা উচিত। তুমি হরিদ্বারে গেলে, উনি নিত্য আমার খবর নিতেন। ওঁরই কথা শুনে, আফিসের বড় সাহেব আমার ভরণপোষণ জন্য মাসিক পনের টাকা মাসহারা বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। এই সকলের জন্যে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর, বড় সাহেবের সঙ্গেও দেখা করতে পারলে ভাল হয়। তিনি বরাবর তোমার খোঁজ নিয়েছেন।"

আমি। আমার মকর্দ্দমার সময় তিনি আদালতে গিয়ে আমার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন।

মা। তিনি বড় ভাল লোক। এ ছাড়া, তিনি তোমার বাপের

পুরানো মনিব। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার কৃতজ্ঞতা জানান উচিত।

আমি। তা হলে, আমি এখনই বেরুই।

এই বলিয়া, আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম।

ক্যামাক ষ্ট্রীটে বড় সাহেবের বাড়ী। বেলা প্রায় আটটার সময়, আমি বড় সাহেবের বাটীতে পৌছিয়া আমার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলাম। বড় সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি আমার করমর্দ্দন করিয়া, অ মাকে নিকটবর্ত্তী আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন, এবং একটা জটিল মকর্দ্দমা হইতে মুক্তিলাভ করায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আমি বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহ করে, আমাকে রক্ষা করবার জন্য ঐ মকর্দ্দমায় সাক্ষী দিয়ে আমাকে ও আমার মাতা-ঠাকুরাণীকে চিরঋণী করেছেন। আর আমি নিতান্ত পাষণ্ডের মত যখন আমার মাতাঠাকুরাণীকে অসহায় অবস্থায় ফেলে সুদূর বিদেশে লুকিয়েছিলাম, তখন আপনি তাঁর ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে যে সদাশয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্যে কি বলব, তা আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না।"

সাহেব বলিলেন, "থাক্ থাক্। তোমার বাবা আমাদের অতি বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্মচারী ছিলেন একথা আমরা কখনও ভুলতে পারব না। তুমি আমার কাছে এসে, ভালই করেছ। না এলে আমি আসবার জন্যে তোমাকে চিঠি লিখতাম।"

আমি। কেন, আমাকে কি আপনার কোনও প্রয়োজন আছে?

সাহেব। হাঁ। আমি তোমার সঙ্গে একটা কাযের কথা কইব। তোমার মনে আছে, তুমি গৃহত্যাগের পূর্ব্বে, আমাদের আফিসে কোন কর্ম্ম পাবার প্রত্যাশায় আমার কাছে এসেছিলে। কিন্তু তখন আফিসে কোন কর্ম্ম খালি ছিল না, সে জন্যে আমি তোমাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করতে পারি নি। কিন্তু তার জন্যে আমি সত্যই দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি শুনেছিলাম যে, কোন একটা কর্ম্ম পেলে তুমি বিদেশে যেতে না। কর্ম্ম না পেয়েই মনের দুঃখে বিরাগী হয়েছিলে।

আমি। না না, আমার গৃহত্যাগের তা কারণ নয়। বাল্যকাল হতে আমার বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ কোন প্রকার মন্ত্রানুষ্ঠানদ্বারা, অলৌকিক শক্তি লাভ করে', যোগী হতে পারে। তখন মানুষ ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানতে পারে, সামান্য ধূলিমুষ্টির দ্বারা কঠিন রোগীকে নিরাময় করতে পারে, সামান্য ধাতুকে সুবর্ণে পরিণত করে' অক্লেশে অশেষ ধনে ধনী হতে পারে। আমি এই সকল শক্তি লাভ করবার জন্যে, গুরুর অনুসন্ধানে হরিদ্বারে গিয়েছিলাম।

সাহেব। তুমি কি ঐ সকল অলৌকিক শক্তি লাভ করেছ?

আমি। না। যা অলৌকিক, তাহা চিরকালই অলৌকিক থাকবে, তা লোকে কখনও লাভ করতে পারবে না। কিন্তু হরিদ্বারে গিয়ে, আমি অতি উৎকৃষ্ট গুরুর সন্ধান পেয়েছিলাম।

সাহেব। আমি শুনেছি যে তুমি ঐ গুরুর কাছে থেকে, চার বছরে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছ, এবং সবল ও সুশিক্ষিত হয়েছ। এখন আমি জিজ্ঞাসা করছি যে, তুমি আমাদের আফিসে কায করতে প্রস্তুত কি না।

আমি। কোনও পদ কি খালি আছে?

সাহেব। এখন খালি নাই বটে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে খালি হবে। উমেশ বাবুকে আমরা আমাদের ছত্রপুরের আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করে পাঠাব। এখানে তাঁর পদ খালি হবে। আমাদের আফিসে এমন একটি লোক নেই যে তাঁর পদ পূর্ণ করতে পারে। আমি ইচ্ছা করি যে তুমি ঐ কায কর। তোমার বাপের কাযে তোমাকে নিযুক্ত দেখলে সকলেই সুখী হবে।

আমি। আমি কি ঐ কায করতে পারব?

সাহেব। উমেশ বাবু এখনও এখানে একমাস থাকবেন। তাঁর কাছে এসে, এই একমাসে তুমি কাযটা শিখে নিও। কায শক্ত নয়;—তুমি বুদ্ধিমান, অল্প দিনে অনায়াসে শিখতে পারবে। আমি শুনেছি, উর্দ্দু ও হিন্দি ভাষাতে তোমার অভিজ্ঞতা আছে; তা আমাদের বিশেষ কাযে লাগবে। পশ্চিমদেশীয় লোকদের সঙ্গে আমাদের সর্ব্বদা কারবার করতে হয়; তাদের ভাষা জানা একজন লোক অফিসে থাকা দরকার। বিশেষতঃ তুমি আমাদের কাছে বিলক্ষণ পরিচিত। আমরা একজন পরিচিত ও বিশ্বস্ত লোককেই ঐ পদে নিযুক্ত রাখতে চাই। তুমি আপাততঃ মাসিক

হু'শ টাকা বেতনে নিযুক্ত হবে ; পরে ক্রমে ক্রমে দশ বৎসরে, তোমার পিতার মত তিনশত টাকা পাবে।

সাহেবের এই অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহে আমি কত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, তাহা, তোমরা চাকুরীলোলুপ বাঙ্গালী, তোমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছ। বাটী ফিরিয়াই আপন জীবিকার্জ্জনের এমন সুযোগ কাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে ? আমার ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিহীন অর্ব্বাচীনকে, কে দুইশত টাকা বেতনের চাকুরী প্রদান করিত ? আমি সাহেবকে বারবার আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, দর্জ্জিপাড়ায় উমেশ বাবুর বাটীতে আসিলাম।

বেলা তখন প্রায় দশটা। উমেশ বাবু আহারাদি করিয়া, চাপকান চোগা পরিয়া, অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কাযেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা হইল না।

কথা হইল, উমেশবাবুর বৃদ্ধা মাতার সহিত। তাঁহাকে আমরা 'দর্জ্জিপাড়ার ঠানদি' বলিতাম। অন্যান্য কথার পর তিনি বলিলেন, "ধন্যি মেয়ে ! কত তপস্যা করে তুমি এমন বৌ পেয়েছ। এই চারবছর সে তোমার মাকে কি যত্নেই রেখেছে ! যেন হাতের তেলোয় রেখে, দিনরাত তাঁর সেবা করেছে। একা মেয়ে, ঘরদোর যেন পূজোর বাসনের মত ঝক্‌ঝকে করে রেখেছে। আবার তোমার মাকে নিয়ে, আপনার পয়সায় গয়া, কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থভ্রমণ করিয়ে এনেছে।"

আমি। মা হরিদ্বারে গিয়েছিলেন ?

ঠানদি। এই ত দশ বার দিন হল ফিরে এসেছেন।

আমি। এতদিন কি আমাদের বাড়ী চাবি বন্ধ ছিল।

ঠানদি। না, চাবি বন্ধ থাকবে কেন? একজন এটর্ণি আছেন; তাঁর সঙ্গে, তোমাদের কি একটা সুবাদ আছে; শুনেছি, তিনিই নাকি এই চারমাস ধরে, বাড়ীতে মিস্ত্রি লাগিয়ে, একেবারে 'ওলট পালট করে' নূতন বাড়ী করে ফেলেছেন।

আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ এটর্ণি কে? আমি ত এরূপ আত্মীয় এটর্ণির কোন সংবাদই জানিতাম না। এ এটর্ণি আমার পিতৃকুল বা মাতৃকুলের আত্মীয়? আমি একে একে সকলের নাম মনে করিলাম। কৈ, পিতৃমাতৃকুলে কাহাকেও ত এটর্ণি দেখিলাম না। তবে বুঝি এই এটর্ণি, আমার বধূরই কোন আত্মীয় হইবে। বাল্যকালে আমি শ্বশুরকুলের কোন সংবাদ লই নাই; লইলে হয়ত এই এটর্ণির সন্ধান পাইতাম। ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে পড়িয়া গেল যে, অপরাজিতার এক জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতপুত্রও এটর্ণি; ইহা ব্যারিষ্টার এডওয়ার্ড সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাল।

আশ্চর্য্য! বধূ ও অপরাজিতা, উভয়েরই এটর্ণি আত্মীয় আছে; উভয়েই তীর্থযাত্রা করিয়া, হরিদ্বারে গিয়াছে; আর, মাতার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, উভয়েই মৃতা আত্মীয়ার অর্থে অর্থশালিনী হইয়াছে! হে ভগবান্, তোমার কৃপায় উভয়ে যদি একই কামিনী হইত, তাহা হইলে, কি মহা সমস্যার কি সহজ সামাধানই হইয়া যাইত!

আর একটু আশান্বিত হইবার প্রত্যাশায়, আমি ঠান্‌দিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি বলতে পারেন, মা কতদিন হরিদ্বারে ছিলেন?"

ঠান্‌দির উত্তরে, আমার উদ্দীপ্ত আশা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "কত দিন আবার? তীর্থস্থানে মানুষ আর কতদিন বাস করে? জোর তিনরাত্রি বাস করেছিলেন।"

আমার নির্ব্বাপিত আশায় ফুৎকার দিয়া আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, "আপনি বলতে পারেন, তীর্থযাত্রা কালে তাঁদের সঙ্গে পুরুষ অবিভাবক কে ছিল?"

ঠান্‌দি আমার হৃদয়ের আশা পুনঃ প্রজ্জলিত করিয়া কহিলেন, "শুনেছি নাত-বৌয়ের বাবাই ছুটী নিয়ে দেশে এসে এঁদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অপরাজিতার পিতাও, তাহাদিগের তীর্থযাত্রায় তাহাদিগের পুরুষ অভিভাবক ছিলেন। তাঁহার সহিত অপরাজিতা ব্যতীত, আরও দুইটি স্ত্রীলোক ছিলেন। ঐ দুইটি স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন বিধবার শুভ্রবসন পরিতেন; আমি তাঁহার মুখ কখনও দেখি নাই; কিন্তু তিনি নিশ্চয় আমায় মা। মূর্খ আমি, কেন এতদিন তাহা বুঝিতে পারি নাই? আর, অপর সধবা স্ত্রীলোকটি কে? আমি তাঁহারও মুখদর্শন করি নাই; কিন্তু আমার প্রফুল্ল মন বলিয়া দিল যে, তিনি আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী। তিনি অপরাজিতার মাতা, বধূরও মাতা। অতএব, অপরাজিতা ও বধূ একই ব্যক্তি। তবে অপরাজিতা হরিদ্বারে তিন মাস রহিল, আর বধূ তিন দিন

মাত্র রহিল কেন? বোধ হয়, ঠান্‌দি ঠিক সংবাদ অবগত নহেন। আরও একটা কথা আছে। আমার শ্বশুরের নাম ভবনাথ মুখোপাধ্যায়। অপরাজিতার পিতার নাম অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়। জনেই 'নাথ' ও দুইজনই 'মুখোপাধ্যায়'ও বটেন; তথাপি 'ভব' ও 'অনাথ' এই দুই শব্দে, প্রকাণ্ড একটা পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। আমি যদি বাল্যকালে শ্বশুরকে দেখিয়া লইতাম, তাহা হইলে ভব ও অনাথের কতটা পার্থক্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু তোমরা ত জান, আমি শ্বশুরকে দেখিবার সুযোগ আপন বুদ্ধির দোষে হারাইয়াছিলাম।

ঠিক সংবাদ জানিয়া, রহস্যের জাল ছিন্ন করিবার জন্য, আকুল আবেগে আমি বাটীর দিকে ছুটিলাম। কিন্তু অল্পদূর অগ্রসর হইবামাত্র, তাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইলাম।

হরিঘোষের ষ্ট্রটের ধারে, একটি বড় বাটীর ফটকে, কি জানি কেন, বিঠুর বাবাজী হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "সুশীল বাবু, আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ভিতরে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইলাম।—বাবাজী কিরূপে জানিলেন যে ঠিক সেই সময়, আমি সেই রাস্তা দিয়া বাড়ী ফিরিব? কিন্তু আমি যত আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, তদপেক্ষা বেশী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম। এ কাহার বাটীতে বাবাজী আমাকে লইয়া যাইতেছেন? এই সময়, তিনি আমার সঙ্গে কি কথা কহিবেন?

গৃহের একটী সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তিনি আমাকে একটি আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন, এবং নিজে অন্য একটি আসনে উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইলে তিনি বলিলেন, "আজ সকালে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আপনাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে আপনি কারও কারও সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সহরের দক্ষিণ দিকে গিয়েছেন। অনুমান করলাম যে, আপনার বাড়ী ফিরতে বেলা এগারটা বাজবে; এবং সম্ভবতঃ আপনি এই পথেই বাড়ী ফিরবেন। এই অনুমান করে, আমি আপনার অপেক্ষায়, এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার একটি বিশেষ কায আছে, তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। কিন্তু কাযের কথা কইতে বিলম্ব হবে। তৎপূর্ব্বে আপনি এখানে স্নান ও আহার করে নিন। এ বাড়ী আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের; তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্ণি। ইনি অপরাজিতার আত্মীয় বলে, আপনারও আত্মীয় হবেন। কাযেই এঁর বাড়ীতে আহার করতে আপনার কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। তিনি নিজে বাড়ীতে নেই;—বিশেষ কার্য্য ছিল বলে গিয়েছেন। বাড়ীতে থাকলে তিনিই আপনার অভ্যর্থনা করতেন। তাঁর অভাবে—আমি তাঁর খুল্লতাত এবং আপনার পরিচিত—আমার অভ্যর্থনা বোধ হয় আপনার অপ্রীতিকর হবে না।"—এই বলিয়া, তিনি স্নেহপূর্ণ লোচনে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

গুরু, শিষ্যের অভ্যর্থনা করিতেছেন! দেবতা, পূজকের

পূজা করিতেছেন! তাঁহার এই আদরে আমি মুগ্ধ হইয়া বলিলাম, "এখানে স্নানাহার করতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু বাড়ীতে মা চিন্তিত হইবেন। তিনি ত জানেন না, তিনি আমার জন্যে আহার প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছেন।"

বাবাজী বললেন, "না, তিনি আপনার জন্যে আহার প্রস্তুত করবেন না। সকালে আমি যখন আপনাদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁকে নিষেধ করে এসেছি যে আজ আপনি এখানেই আহার করবেন।"

এটর্ণি বাবুর বাটীতে অন্তঃপুরের এক কক্ষে আহার করিতে বসিয়া, আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম, আমার ভোজনপাত্রের পার্শ্বে, অপরাজিতা তালবৃন্ত হস্তে সহাস্যমুখে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার স্নানস্নিগ্ধ ললাটে, শ্বেতপদ্মে মধুকরপংক্তির ন্যায়, অলকগুচ্ছ পতিত হইয়াছে। তাহার সরল অধরে হাসি, শিশিরসিক্ত গোলাপদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। আমাকে আহারে বিরত ও বিস্ময়ান্বিত দেখিয়া সে বলিল, "বসে রইলে কেন? খাও।"

"খাব কি! আমি তোমাকে এখানে দেখে অবাক হয়েছি।"

"আমি আজ সকালে এখানে এসেছি। এ আমার জ্যেঠতুতো ভাইয়ের বাড়ী। আমি কাশী থেকে বাবার সঙ্গে এখানে এসেছি। তুমি যে কুলীন, বাবা তা এখন শুনেছেন। কাযেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে এখন আর তাঁর আপত্তি নেই। এখানে থেকেই তিনি আমার বিয়ে দেবেন।"

আমার বধূকে গতকল্য হইতে আমি আমাদের বাড়ীতে দেখিতেছি, আর এখন সে নিশ্চয় বাটীতে আছে ; আর অপরাজিতা আজ সকালে আসিয়াছে, আর এখন সে এখানে রহিয়াছে ; কাযেই ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী, একই সময়ে পৃথক স্থানে অবস্থিত দুই ব্যক্তি এক হইতে পারে না ; এবং গত কল্য হইতে যে কলিকাতায় রহিয়াছে, সে আজ কলিকাতায় সমাগত হইতে পারে না। অতএব অপরাজিতাই আমার গৃহস্থিতা পরিণীতা বধূ হইবে বলিয়া আমি আমার হৃদয়ে যে সুখকর আশা পোষণ করিয়া বাটী ফিরিতেছিলাম, তাহা যাদুপ্রদীপের প্রভাবশূন্য আলাদিনের অট্টালিকার ন্যায়, অর্দ্ধপথে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আমি অপরাজিতাকে বলিলাম, "এখানে বিয়ে না হয়ে কাশীতে বিয়ে হলেই ভাল হত। এখানে আমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমার বিনা অনুমতিতেই, আমাদের বাড়ীতে এসে বাস করছে। তা ছাড়া, সে শুশ্রূষাদির দ্বারা আমার মাকে এমন বশীভূত করে ফেলেছে যে, তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও শক্ত হয়ে পড়েছে।"

অপরাজিতা কহিল, "থাকুক সে বাড়ীতে, তাতে কিছু ক্ষতি নেই ; রাঁধবে বাড়বে, কাযকর্ম্ম করবে। তুমি তাকে না ভালবাসলেই হল,—কেমন ?"

সে যে আমার মনের মধ্যে একটা আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ না করিয়া আমি বলিলাম, "না না, এ হৃদয়ে সে কখনও স্থান পাবে না। আমার হৃদয় সরোবরে একমাত্র অপরাজিতা পদ্ম ফুটে থাকবে।"

আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া অপরাজিতা স্মিতমুখে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিল।

আহারাদি শেষ করিয়া, আমি বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপবেশন করিলে বাবাজী বলিলেন, "আমি এডওয়ার্ডস্ সাহেবের মুখে শুনেছি যে, তিনি আপনাকে আমার কতকটা পরিচয় দিয়েছেন। অপরাজিতার সঙ্গে বিবাহের পর আমার সমুদয় পরিচয় আপনি ক্রমে অবগত হবেন। তার বিস্তৃত বর্ণনায় আমি এখন সময়ক্ষেপ করব না। আপনি জানেন যে আমার প্রকৃত নাম তারানাথ মুখোপাধ্যায়। আমি গৈরিক বসন পরিধান করি, এজন্য লোকে আমাকে বাবাজী বলে। আমি কিছুদিন মধ্য-ভারতে বিঠুর নামক স্থানে অবস্থিতি করেছিলাম, এজন্য লোকে আমাকে বিঠুরের বাবাজী বলত ; কালক্রমে সেটা বিঠুর বাবাজী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রকমে আমি তারানাথ, বিঠুর বাবাজী হয়েছি। জ্ঞানোন্নতির জন্যে আমি হরিদ্বারে প্রায় দ্বাদশ বৎসর-কাল বাস করেছি। এর মধ্যে চারবৎসর কাল আমি আপনার সঙ্গে একত্র বাস করেছি। দীর্ঘকাল এই একত্র বাসের ফলে, আপনি আমার প্রিয় হয়েছেন। আমিও বোধ হয় আপনার প্রিয় হয়েছি। সম্প্রতি আমি স্থির করেছি যে, হিমালয়ে গিয়ে কোন মহাত্মার শরণাপন্ন হব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন মহাত্মার শরণাপন্ন হবেন ?"

তিনি বলিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে বলেছি যে, অনাদিব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প ; তিনি সুখদুঃখপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের

সৃষ্টিকর্তা নন। কিন্তু তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের, এবং সৃষ্টিকর্তারও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

"আমার মন বুঝেছে যে, এই বাঞ্ছনীয়কে লাভ করাই মানবের একমাত্র বাঞ্ছনীয় পরিণতি। মানব এই অভিলাষ কিরূপে লাভ করল, তা বলতে পারি না; কিন্তু এই অভিলাষই যে মানবকে আস্তিক করে রেখেছে, সেটা নিশ্চিত।

"আমার সংস্কার জন্মেছে যে, এই বাঞ্ছিতকে লাভ করতে হলে, শরীর ও মনকে একান্ত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক।—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ নীরোগ থাকবে; এবং মনে কোনও প্রকার গ্লানির ছায়া পড়বে না।

"শরীর ও মনের এইরূপ পরমানন্দ কিরূপে ঘটতে পারে, তা বোঝবার জন্য তত্ত্বদর্শী মহাত্মাদের শরণাপন্ন হতে হয়; তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁদের কার্য্যকলাপের দ্বারা আপন জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। আমি জেনেছি, হিমালয়ের গহন অরণ্য মধ্যে এইরকম কয়েকজন মহাত্মা অবস্থিতি করছেন। আমি অনুসন্ধান করে তাঁদের শরণাপন্ন হব; এবং শরীর ও মনের পরমানন্দ লাভ করবার চেষ্টা করব। শরীর ও মনকে দর্পণের মত নির্ম্মল করতে পারলে, তাতে আপনা হতেই চিরবাঞ্ছিতের ছায়া প্রতিবিম্বিত হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কবে হরিদ্বার ত্যাগ করবেন?"

বাবাজী বলিলেন, "একপক্ষের মধ্যেই আমি হরিদ্বার ত্যাগ

করব। আমি হরিদ্বার ত্যাগ করলে, আমাদের সহপাঠী মহাত্মা কেবলরাম স্বামী, আশ্রমের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করবেন।"

"আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে,আমি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিলাম। ঐ অর্থ আমি কেবলরাম স্বামীর হাতে অর্পণ করতে চাইলে, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, ঐ অর্থ তাঁর কাছে থাকলে, তিনি লোভের বশবর্ত্তী হয়ে, পতিত হতে পারেন। এজন্য তিনি তা গ্রহণ করবেন না; কঠোর ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আশ্রম-ব্যয় নির্ব্বাহ করবেন।

"তিনি ঐ অর্থগ্রহণ না করায়, আমি কিছু বিব্রত হয়েছি। সেই পরম বাঞ্ছনীয়ের অনুসন্ধান জন্য, একটি পয়সারও আবশ্যক হয় না; এজন্য ঐ অর্থ আমার নিকট নিতান্ত নিরর্থক হয়ে পড়েছে।

"আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ঐ টাকা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি বল্লেন যে, তাঁর পুত্রকন্যা নেই, ঐ অর্থ নিয়ে তিনি কি করবেন? ষাট টাকা বেতনের তিনি যে চাকরী করেন, তাই তিনি তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে খরচ করতে পারেন না, তিনি আর অর্থ নিয়ে কি করবেন? তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন যে, অপরাজিতাই তাঁর একমাত্র স্নেহের সামগ্রী, অতএব ঐ অর্থ তাকেই দেওয়া হোক। অপরাজিতার পিতা এবং আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র বল্লেন যে, অপরাজিতার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ঐ অর্থ, অপরাজিতার সঙ্গে, আপনার হাতে ন্যস্ত করাই শ্রেয়ঃ। আমি ভাবলাম, আপনি

আমার প্রিয়, এবং আমার প্রিয়তমা ভ্রাতুষ্কন্যার স্বামী, আমার অর্থ আপনারই প্রাপ্য হওয়া উচিত। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস যে, আপনার মত গৃহস্থের হাতে এই অর্থের সদ্ব্যবহার হবে।

"এই সকল বিবেচনা করে, আমি এক দানপত্র লিখে, আমার সমুদয় অর্থ অপনাকে প্রদান করতে ইচ্ছা করেছি। দানপত্র লেখা হয়েছে; আপনি এটা পড়ে' দেখুন। না না, আপনি 'না' বল্লে চলবে না। আপনি কুলীন; কিন্তু বিবাহে যৌতুক গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলে, কেউ আপনাকে কুলীনই বলবে না।"

বাবাজীকে নিরস্ত হইবার জন্য আমি বারবার মিনতি করিয়া বলিলাম, "কেন অনিশ্চিতের অনুসন্ধানে, নানাপ্রকার দুঃখ সহ্য করে পর্ব্বতে ও অরণ্যে ঘুরে বেড়াবেন?"

বাবাজীর মুখে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকটিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "না না সুশীলবাবু, তিনি অনিশ্চিত নন। আমার মন বুঝতে পেরেছে যে তিনি ধ্রুব হতেও ধ্রুবতর। জগৎ বা বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড অনিশ্চিত হতে পারে; কিন্তু তিনি নিতান্ত—নিতান্ত নিশ্চিত!"

আমি বলিলাম, "তিনি নিশ্চিত হলেও অজ্ঞেয়।"

বাবাজী বলিলেন, "সাধারণের কাছে তিনি অজ্ঞেয় বটেন; কিন্তু চিত্তকে নির্ম্মল করতে পারলে, তিনি স্বপ্রকাশ হয়ে পড়েন!"

আমি বলিলাম, "কিন্তু গৃহে থেকে কি চিত্তকে নির্ম্মল করতে পরা যায় না?"

বাবাজী বলিলেন, "তার জন্য শিক্ষার আবশ্যক। এই শিক্ষালাভের জন্যই আমি হিমালয়ে যাব স্থির করেছি।"

আমি। লোকালয়ে কি সে রকম শিক্ষক পাওয়া যায় না?"

বাবাজী। লোকালয়ে সে রকম শিক্ষক থাকতে পারেন; কিন্তু আমি তাঁর সন্ধান জানি না। কাযেই অরণ্যে যে মহাত্মাগণের সংবাদ পেয়েছি, তাঁদের দর্শনলাভ জন্য, আমাকে পর্ব্বতে ও অরণ্যে ঘুরতে হবে। আপনি মনে করবেন না যে পর্ব্বত ও অরণ্যে ভ্রমণ করে আমি দুঃখ পাব। তা দুঃখজনক নয়। পর্ব্বত ও অরণ্যচারী জীবগণ কত মহা আনন্দে তাদের স্বাধীন বন্য-জীবন যাপন করে, তা কি আপনি বুঝতে পারেন না?

বাবাজীকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে পরাঙ্মুখ করা আমার সাধ্যের অতীত। সুতরাং বাবাজীর দান আমি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

কিন্তু, তোমরা আমার মত ভাগ্যবান পুরুষ দেখিয়াছ কি? তোমরা কি কেহ একদিনে, এই আমার মত দুইশত টাকা বেতনের চাকুরী ও নগদ একলক্ষ টাকা, লাভ করিতে পার? এখন অপরাজিতাকে লাভ করিতে পারিলেই, আমার সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার অপরাজিতা-লাভ।

বড় সাহেবের নিকট চাকুরী, অপরাজিতার নিকট বিবাহের শুভ সংবাদ, এবং বাবাজীর নিকট প্রভূত অর্থ লাভ করিয়া, দিবাবসান কালে আমি হৃষ্টমনে আমাদের শ্যামবাজারের বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম। হঠাৎ আমার প্রফুল্ল মনে একটা সন্দেহের ছায়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, অপরাজিতা ও আমার পরিণীতা যে একই ব্যক্তি, এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ এখনও আছে। সকালে বাটী পরিত্যাগের সময়, আমি যে বধূকে আমাদের বটীতে দেখিয়া গিয়াছিলাম, আমার প্রস্থানের পর সে তাহার আত্মীয় এটর্ণির বাটীতে আসিয়া, অবগুণ্ঠন খুলিয়া অক্লেশে অপরাজিতার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে।—এই মায়াবিনীরা সব পারে!

আমার সন্দেহের নিরাকরণ জন্য, আমি বাটীতে প্রবেশ করিয়াই, বধূর অন্বেষণে চারিদিকে ত্বরিত দৃষ্টি সঞ্চালন করিলাম। দেখিলাম, পূর্ব্ববৎ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া, সে মাতা-ঠাকুরাণীর সহিত গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাকে বাটীতে দেখিয়াও আমার সন্দেহ বিদূরিত হইল না। মধ্যাহ্নে আহার কালে আমি অপরাজিতাকে এটর্ণি বাবুর বাটীতে দেখিয়া-

ছিলাম; তাহার পর, বহির্বাটীতে বাবাজীর সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলাম,—তাহাকে আর দেখি নাই। ইহা অসম্ভব নয় যে, সে ইত্যবসরে বাটীতে ফিরিয়া, ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া বধূ হইয়াছে।

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিলাম; ইচ্ছা, মুখাবরণ ভেদ করিয়া তাহার মুখটি দেখিয়া লই; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সহসা তাহার বসনের রক্তবর্ণ প্রান্তে আমার দৃষ্টি আবদ্ধ হইল;—মনে পড়িল, অপরাজিতা এটর্ণি বাবুর বাটীতে একখানি কালো ফিতাপাড় শাড়ী পরিয়া ছিল। কিন্তু বাটীতে ফিরিয়া বসন পরিবর্ত্তন করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অপরাজিতার অলকান্তরিত কর্ণে, নীল-মণির ক্ষুদ্র কর্ণভূষণ দেখিয়াছিলাম; বধূর কর্ণভূষণ কিরূপ তাহা দেখিতে পাইলাম না। কাল অপরাহ্নে বধূর হস্তে শঙ্খ-বলয় দেখিয়াছিলাম; আজ মধ্যাহ্নে অপরাজিতার প্রকোষ্ঠে সুবর্ণ অলঙ্কার দেখিয়াছি। আমার দুস্তর সন্দেহ-সাগর ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, অপার হইয়া দাঁড়াইল।

আমি দ্বিতলে আপন কক্ষে যাইয়া, একটি উন্মুক্ত বাতায়নের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, কক্ষ-সজ্জা সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। একটি ফুলদানিতে কয়েকটি নূতন গোলাপ, কয়েকটি পল্লবগুচ্ছের মধ্যে সজ্জিত ছিল। গবাক্ষ-পথে, এই পুষ্পের উপর, স্বর্গের স্বর্ণবৃষ্টির মত, কতকটা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই রৌদ্রে দুইটা প্রজাপতি, উড্ডীয়মান বিচিত্র পুষ্পের ন্যায়, অনবরত উড়িয়া বেড়াইতেছিল;—আমার চঞ্চল মনের মত, তাহারা স্থির

করিতে পারিতেছিল না, কোন পুষ্পে উপবেশন করিবে। গৃহ-ভিত্তিতে, নল ও দময়ন্তী-ঘটিত কয়েকখানা পৌরাণিক চিত্র ঝুলিতেছিল।—দেবতাগণকে উপেক্ষা করিয়া, দময়ন্তী নলের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিতেছেন; শনির পরামর্শে, নল অর্দ্ধবসনা দময়ন্তীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন; নিদ্রাভঙ্গে দময়ন্তী বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন;—এইরূপ কতকগুলি চিত্র দেখিয়া, আমি কতকটা সময় অতিবাহিত করিলাম।

তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, যে গতকল্য আমাকে ত্যাগ করিয়া একপদ নড়িতে চাহে নাই, সে আজ, আমি একাকী আপন কক্ষে রহিয়াছি, ইহা জানিয়াও কেন আমার নিকট আসিতে এত বিলম্ব করিতেছে? সে আসিলে, তাহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, এতক্ষণ আমার সন্দেহ দূর করিতে পারিতাম। অথবা, তাহাকে সকল কথা বলিয়া, অপরাজিতার সহিত শুভ-বিবাহের উদ্যোগ করিতাম। কিন্তু সে সহজে আসিল না। প্রায় পনের মিনিট পরে, একটা স্থালীতে অতি উপাদেয় জলযোগের আয়োজন করিয়া, ধীরে ধীরে দেখা দিল।

এখনও অবগুণ্ঠনের অভেদ্য আবরণে তাহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ আবৃত ছিল। আমার ইচ্ছা হইল যে তাহাকে ধরিয়া, তাহার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখি, সে কে। কিন্তু যে পত্নীকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না; অধিকন্তু, আমার মনে হইল যে তাহাকে স্পর্শ করিলে, আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণপ্রণয়চন্দ্র কলঙ্কলিপ্ত হইবে,—আমি অপরাজিতার

নিকট অপরাধী হইবু। অতএব আমি তাহার মুখাবরণ উন্মোচন করিতে পারিলাম না। সে নিকটে আসিলে, শুভ্র ঘেরাটোপে ঘেরা মর্ম্মরপুত্তলির মত তাহার অবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি মাকে নিয়ে হরিদ্বারে গিয়েছিলে?"

বধূ সে প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করিয়া, একখানি টিপয়ের উপর তাহার হস্তস্থিত স্থালী স্থাপন করিয়া বলিল, "দাঁড়াও, আমি আগে তোমার জন্যে জল ও পাণ নিয়ে আসি, তার পর তোমার কথার উত্তর দেব। ততক্ষণ তুমি সুবোধের মত জলযোগে মনোযোগ দাও।"—এই বলিয়া সে ত্বরিতপদে চলিয়া গেল।

আমি অগত্যা অন্যমনে আহার করিতে লাগিলাম; এবং পুষ্পের উপর প্রজাপতির চঞ্চল লীলা ও নলদময়ন্তীর দুঃখময় চিত্র সকল লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

সে প্রত্যাগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছ? প্রজাপতি? দেখ, দেখ; ওরা তোমার নতুন বিয়ের শুভ-সংবাদ এনেছে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার সময়, আমাদের কালীঘাটের বাড়ীতে দিনকতক এইরকম প্রজাপতি উড়েছিল।"

আমি বলিলাম, "না, আমি কেবলমাত্র প্রজাপতির খেলা দেখছি না; আমি নলদময়ন্তীর সুন্দর ছবিগুলিও দেখছি।"

সে বলিল, "দেখ; ও গুলিও তোমার দেখবার জিনিষ; তুমিও নলরাজার মত আমাকে ত্যাগ করে হরিদ্বারে লুকিয়ে ছিলে।"

আমি। কিন্তু আমি ত তোমাকে অরণ্যে ত্যাগ করে পালাই

নি। আর তুমিও দময়ন্তীর মত, দেবতাদের ছেড়ে, আমাকে বরণ কর নি।

বধূ। কিন্তু জেনো, এই স্বামিশূন্য গৃহ, আমার পক্ষে অরণ্য অপেক্ষা ভয়ানক হয়েছিল। আর, এই পৃথিবীর জীবন্ত দেবতা স্বরূপ পিতামাতাকে ছেড়ে, যখন এই আনন্দহীন গৃহে এসে, তোমার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করেছিলাম, তখন কি আমি তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য রূপে বরণ করি নি?

বধূর বাক্যে, আমার হৃদয়তন্ত্রী মহাশব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। ঐ বাক্য শুনিয়া, অপরাজিতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ আমার মনটা, দ্বীপবাসিনী কিন্নরীগণের অপূর্ব্ব সঙ্গীতে উত্তেজিত, কিন্তু পোত-বৃক্ষে দৃঢ়বদ্ধ ওডিসিয়সের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায়, মহা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। দ্বীপকিন্নরীগণের গীতের ন্যায় সুমধুর সেই বাক্যের কি উত্তর দিব, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, আমি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত পাত্রস্থিত খাদ্যসামগ্রী গুলি উদরস্থ করিতে লাগিলাম।

সুধাপ্রবাহের ন্যায় তাহার বাক্য-প্রবাহ আবার প্রবাহিত হইল। স্রোতোগত তৃণের ন্যায়, আমার হৃদয় কে জানে কোথায় ভাসিয়া গেল! সে বলিল, "তুমি ত জান না যে, সন্ন্যাসী যেমন মোক্ষলালসায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, আমিও তেমনই তোমাকে পাবার লালসায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। কত দেশে, কত তীর্থে কত সমুদ্রতীরে তোমার সন্ধান করেছি। অবশেষে হরিদ্বারে তোমার সন্ধান পেয়েছিলাম।"

আমি অন্তরাবেগে কাঁপিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,

"তবে সত্যই তুমি হরিদ্বারে গিয়েছিলে? সত্য বল, কে তুমি?"

সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না। আপন মনে বলিতে লাগিল, "সেখানে লোকমুখে শুনলাম যে, তুমি অপরাজিতা নাম্নী এক পাপীয়সী পরস্ত্রীর সঙ্গে পালিয়েছ। আমরা তোমার পিছনে ছুটলাম। কাশীতে এসে, তোমার অপরাজিতার সন্ধান পেলাম; কিন্তু তার নাক কাণ কেটে দিলাম না। তার মুখে শুনলাম যে তুমি কলিকাতায় এসেছ। আমরাও কলিকাতায় এলাম। এসে, প্রাণপণ শক্তিতে, পুলিশের হাত থেকে তোমার উদ্ধারসাধন করলাম। উদ্ধার পেয়ে বাড়ী ফিরে, তুমি তাকে কিরূপে পুরস্কৃত করলে? বল্লে যে আমি তোমার যথার্থ স্ত্রী নই!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে তুমিই আমার মকর্দ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করেছ?"

সে বলিল, "তুমি কি মনে করেছিলে যে এ কার্য্য আমার দ্বারা হতে পারে না?"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার কথা একেবারে মনে করি নি। আমি মনে করতাম যে, তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে চিরদিন থাকবে; আর আমি অপরাজিতাকে বিয়ে করে, সংসার ধর্ম্ম পালন করব।"

সে বলিল, "আহা, তোমার কি চমৎকার সুবিচার! আমার বেলায়, তুমি সংসার বন্ধন ছিন্ন করে পলায়ন করেছিলে; আর অপরাজিতার বেলা, তুমি তাকে নিয়ে সংসারধর্ম্ম পালন